বাইজী।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [বৈশাখ।

PRINTED BY M. N. DEY, AT THE
Bani Press,
No. 63, *Nimtola Ghat Street, Calcutta.*
1908.

বাইজী

প্রথম পরিচ্ছেদ
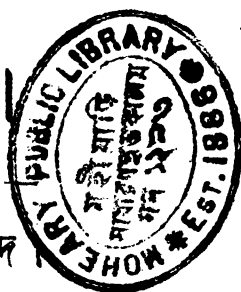
ফাল্গুন মাস। বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। সূর্য্যের প্রখর কিরণজাল সেই ভয়ানক কুজ্ঝটিকা ভেদ করিতে পারে নাই। এত অন্ধকার যে, কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

আমি অফিস-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন কনষ্টেবল আমার নিকট দৌড়িয়া আসিল; বলিল, "বড় সাহেব আসিতেছেন।"

আমি তখনই ঘর হইতে বাহির হইলাম। সাহেব গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমার নিকটে আসিলেন। আমি অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, "মেছুয়াবাজারে মালতীবাইয়ের প্রিয় ভৃত্য সুন্দরলাল খুন হইয়াছে। তাহার মৃতদেহ খিদিরপুরের পোলের নিকট পাওয়া গিয়াছে। আমার গাড়ীতে বাইজীর লোক আছে, তুমি তাহাকে লইয়া সত্বর সেই স্থানে যাও, এবং সাধ্যমত অনুসন্ধান করিয়া হত্যাকারীকে ধৃত করিবার চেষ্টা কর।" এই বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন।

বাইজীর সেই লোককে লইয়া আমি খিদিরপুরে পোলের নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, কয়েকজন পুলিস-কর্ম্মচারী ও কতকগুলি লোক সেই মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া কনষ্টেবলগণ জনতা সরাইয়া দিল। আমি সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম; দেখিলাম, যুবকের বয়স প্রায় বাইশ বৎসর; তাহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ; তাহার হস্তদ্বয় আজানুলম্বিত, বক্ষ উন্নত, চক্ষু আয়ত, মুখশ্রী অতি সুন্দর। ভৃত্যের কার্য্য করিলেও তাহাকে ভদ্রসন্তান বলিয়া বোধ হইল। তাহার পরিধানে একখানি নরুণপেড়ে দেশী ধুতি, গায়ে একটা লংক্লথের পাঞ্জাবী জামা, মস্তকে একটা সাদা ফুল কাটা কাপড়ের টুপী, জামার ভিতরে গোলাপী রংয়ের গেঞ্জি, পায়ে একজোড়া বার্ণিস করা পম্প-সু। তাহার পার্শ্বেই একখানা বাইসিকেল পড়িয়া ছিল। তাহার বাম বক্ষে একটা ছিদ্র, সেই ছিদ্র দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া, সেই স্থান প্লাবিত করিয়া ছিল। তাহার সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় শীতল; দেখিয়া বোধ হইল, অনেক পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে!

ভৃত্যের মৃতদেহ ও তাহার বাইসিকেল বিশেষরূপে পরীক্ষার পর আমি সে স্থানটী ভাল করিয়া অনুসন্ধান করতঃ বাইজীর লোককে সঙ্গে লইয়া বাইজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

মেছুয়াবাজারের মালতীবাই একজন প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী ও গায়িকা। কলিকাতার প্রায় সকল বড় লোকই মালতীবাইএর নাম শুনিয়াছেন।

বাইজীর বাড়ী দ্বিতল ও প্রকাণ্ড। দ্বিতলের বারান্দায় চিক ফেলা। দরজায় একজন দরোয়ান ছিল। আমাকে বাইজীর সেই

লোকের সঙ্গে উপস্থিত দেখিয়া, সে অতি সমাদরে আমাকে বাইজীর নিকট লইয়া গেল।

বাইজীর নাম শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত এপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। বাইজীকে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই।

বাইজীর বয়স প্রায় আঠার বৎসর, কিন্তু সহসা দেখিলে আরও কম বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাকে দেখিতে রক্তিমাভ গৌরবর্ণ, তাঁহার মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব সাধারণ রমণীগণের অপেক্ষা অনেক সুন্দর।

বাইজীর আদব কায়দা আরও চমৎকার। ভদ্র ও বড় ঘরের সন্তানদিগের সহিত বসবাস করিয়া, বাইজীর চাল-চলন, কথাবার্ত্তা সকলই সুন্দর। দূর হইতে আমাকে দেখিয়া বাইজী বিমর্যভাবে আমার নিকট আসিয়া এক সুদীর্ঘ সেলাম করিলেন এবং যত্ন সহকারে আমাকে এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন।

সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। বাইজীও আমার নিকট আর একখানি চেয়ার আনাইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তিনি ভৃত্যের অকালমৃত্যুতে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার চক্ষু ও গণ্ডস্থল দেখিয়া বোধ হইল, তিনি সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বাইজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভৃত্যটি আপনার নিকট কতদিন চাকরী করিতেছে?"

অতি বিমর্যভাবে বাইজী উত্তর করিলেন, "প্রায় ছয় বৎসর সুন্দরলাল আমার নিকট চাকরী করিতেছে।"

যদিও আমি সাহেবের মুখে ঐ নাম শুনিয়াছিলাম, তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুন্দরলাল কে?"

বা। আমার ভৃত্য, যে গত রাত্রে খুন হইয়াছে।

আ। কাল কখন সে এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল?

বা। বৈকালে—বেলা তখন বোধ হয় চারিটা বাজিয়া গিয়াছিল।

আ। কোথায় গিয়াছিল?

বা। গার্ডেনরিচে আমার একখানা বাগান আছে। সম্প্রতি সেখানে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী বসন্তবাইজী বাস করিতেছেন। সুন্দরলাল তাঁহারই নিকট আমার এক পত্র লইয়া গিয়াছিল।

আ। গত রাত্রেই কি সুন্দরলালের ফিরিবার কথা ছিল?

বা। হাঁ। পত্রখানি বসন্তের হতে দিয়াই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে [illegible] করিয়াছিলাম।

আ। সুন্দরলালের কোন শত্রু আছে আপনি জানেন?

বা। সে কথা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

আ। কাল কত রাত্রে সুন্দরলালের এখানে পঁহুছিবার কথা

বা। অনুমান রাত্রি নয়টা।

আ। যখন সে আসিল না, তখন আপনি তাহার কোন [illegible] করেন?

বা। [illegible] তখন লওয়া হয় নাই।

আ। কেন?

বা। [illegible]র একজন ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, গত রাত্রে [illegible]াসা হইয়াছিল। চারিদিক ভয়ানক অন্ধকার।

সুন্দরলালের সন্ধানে লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে, সেই ভৃত্য বলিল, হয় ত সেই কুয়াসার জন্যই সুন্দরলালের আসিতে বিলম্ব হইতেছে। বিশেষতঃ সে বাইসিকেল করিয়া গিয়াছিল, ভ্রম বশতঃ তাহার লণ্ঠনটী লইয়া যায় নাই। তাই ভাবিলাম, সুন্দরলাল হয় ত বাড়ী ফিরিতে পারিবে না।

আ। আজ প্রাতে লোক পাঠাইয়াছিলেন?

বা। হাঁ, ভোর পাঁচটার সময় আমার দরোয়ানকে বাগানে পাঠাইয়াছিলাম। শুনিলাম, সুন্দরলাল গত রাত্রেই বাগান হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

আ। তখন রাত্রি কত?

বা। প্রায় এগারটা।

আ। সে কি একাই সেখান হইতে বাহির হইয়াছিল?

বাইজী ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন; পরে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, একাই বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কিছু পরেই বিনয়বাবু সেই বাগান হইতে বহির্গত হন।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিনয়বাবু কে?"

বাইজী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তিনি আমার ভগ্নীর বন্ধু। আমার ভগ্নী গার্ডেনরিচের বাগান-বাড়ীতে বাস করিতেছেন শুনিয়া, তিনি পরশ্ব রাত্রে সেখানে গিয়াছিলেন। বিনয়বাবু একজন নামজাদা লোক; তাঁহার বাড়ীর কেহ কখনও চাকরি করেন নাই। কলিকাতায় তাঁহার যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি আছে। তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি অগাধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাইজী যেভাবে বিনয়বাবুর পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার কেমন সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সহিত কি বিনয়বাবুর আলাপ নাই ?"

ঈষৎ হাসিয়া বাইজী উত্তর করিলেন, "আলাপ আছে বই কি। তবে আমার ভগ্নী বসন্তের সহিত তাঁহার যেমন সদ্ভাব, আমার সহিত তেমন নাই।"

আ। আপনার ভগ্নী কোথায় থাকেন ?

বা। এই বাড়ীতে।

আ। তাহা হইলে বিনয়বাবুও এখানে আসিয়া থাকেন ?

বা। হাঁ, আসেন বই কি ? আজ প্রাতেও তিনি এখানে আসিয়াছিলেন।

আমি তাঁহার কথায় চমৎকৃত হইলাম, ভাবিলাম, বাইজীর উদ্দেশ্য কি ? বিনয়বাবুর উপরই কি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে ? সুন্দরলাল বাগান হইতে বাহির হইবার কিছু পরে বিনয়বাবুও বাগান হইতে বহির্গত হন। সুন্দরলাল বাইসিকেল করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিল, তাহার কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া বিনয়বাবু যে সুন্দরলালকে পথে দেখিয়াছিল, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে যদি বিনয়বাবুও বাইসিকেল করিয়া ফিরিয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় ত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বাইজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"বিনয়বাবু এখানে আজ প্রাতে আসিয়াছিলেন কেন? তিনি কি সুন্দরলালের কোন সংবাদ জানেন? পথে কি উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

আবার বাইজী আমার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসি আমার বড় ভাল লাগিল না। আমি উত্তরের অপেক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিনি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিনয়বাবু সুন্দরলালের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, সুন্দরলাল তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, এই অভিযোগ করিবার জন্যই আজ প্রাতে তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনাআপনি বলিলাম, "তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন, জানিতে পারিলে আমার সন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে পারে।"

পরে বাইজীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাহার উপর আপনার সন্দেহ হয়?"

বাইজী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কেমন করিয়া বলিব? তবে বিনয়বাবু নিজে আমাকে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাই বলিতে পারি। তাঁহার কথা শুনিয়া আপনিই বিচার করিবেন। তাঁহার কথায় কাহারও উপর সন্দেহ হয় কি না, আপনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন।"

আমি আন্তরিক আনন্দিত হইলাম; বলিলাম, "তবে বলুন, বিনয়বাবু কি অভিযোগ করিতে আসিয়াছিলেন?"

বাইজী ঈষৎ হাসিয়া আবার আমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন; বলিলেন, "রাত্রি দশটার পর তিনি আমার উদ্যান হইতে

বাহির হন। সুন্দরলাল বাগানে গিয়াছিল কি না, এ সংবাদ তিনি রাখিতেন না। তিনিও বাইসিকেল করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে খিদিরপুরের পোলের নিকট একজন লোককে বাইসিকেলে চড়িয়া যাইতে দেখিলেন। তাহার গাড়ীতে আলোক না থাকায় বিনয়বাবুর বাইসিকেলের সহিত তাহার বাইসিকেলের ধাক্কা লাগে। তিনি জানিতেন না যে, আমার প্রিয়তম ভৃত্য বাগানে গিয়াছিল এবং সেই রাত্রে বাইসিকেল করিয়া বাড়ীতে ফিরিতেছিল। একে তখন ভয়ানক কুয়াসা, তাহার উপর সুন্দরলালের গাড়ীতে আলো ছিল না, সুতরাং বিনয়বাবু প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। সেও বিনয় বাবুকে চিনিতে পারে নাই। অপর কোন লোক মনে করিয়া সে বিনয়বাবুকে উপহাস করিয়াছিল। বিনয়বাবু সে কথায় রাগান্বিত হন। কথায় কথায় কলহ উপস্থিত হয়। তখন উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারে। জানি না, উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ ছিল কি না। কিন্তু আমার ভৃত্যের কথায় রাগান্বিত হইয়া বিনয়বাবু সুন্দরলালকে প্রথমে প্রহার করেন। সুন্দরলালও ছাড়িবার পাত্র ছিল না, সেও বিনয়বাবুর সম্মান রক্ষা না করিয়া তাঁহাকে প্রহার করে। বিনয়বাবু বলিলেন, সেই প্রহারে তিনি এতদূর অপমানিত হন যে, তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন।"

এই বলিয়া বাইজী আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া, তিনি পুনরায় বলিলেন, "বিনয় বাবু আমাকে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, আপনাকে তাহাই বলিলাম। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য আপনিই বিবেচনা করুন?"

বাইজীর শেষ কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বিনয়বাবুকে কোন কথা বলিয়াছিলেন ?"

বা। তিনি আসিবার ঠিক পূর্ব্বেই আমি সুন্দরলালের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলাম। সুন্দরলাল আমার প্রিয় ভৃত্য, সমস্ত কার্য্যই সে করিত। বলিতে কি, অন্য লোকে আমার কার্য্য করিলে সেও রাগান্বিত হইত, আমারও তাহা মনোমত হইত না। বিনয়বাবুর মুখে বিবাদের কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকেই কতকগুলি তিরস্কার করিয়াছি, এবং তিনিই আমার ভৃত্যোকে হত্যা করিয়াছেন এ কথাও বলিয়াছি।

আ। বিনয়বাবু কি উত্তর করিলেন ?

বা। তিনিও আমায় যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিলেন। উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বচসা হইল, শেষে বিনয়বাবু অপমানিত, লজ্জিত ও তিরস্কৃত হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

আ। বিনয়বাবুর বাড়ী কোথায় ?

বা। ঠিক জানি না—বোধ হয় বাগবাজারে।

আ। তাঁহার অভিভাবক কেহ বর্ত্তমান আছেন ?

বা। শুনিয়াছি, তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা, তাঁহার পিতা বহুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন।

আ। আপনি কাহার নিকট হইতে আপনার ভৃত্যের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন ?

বা। যে দরোয়ানকে তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাগানে পাঠাইয়াছিলাম, সেই বাগান হইতে ফিরিয়া আসিবার কালীন তাহার মৃতদেহ দেখিতে পায় ও সেই আসিয়া আমাকে সংবাদ প্রদান করে।

আ। তাহার পর আপনি কি করিলেন ?

বা। আমি একজন লোক মারফত এই সংবাদ আপনাদের সাহেবের নিকট প্রেরণ করি।

আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমি বিনয়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম এবং তদুদ্দেশে গাড়ীতে উঠিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা দশটার পর আমি বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বাড়ীখানি প্রকাণ্ড ও ত্রিতল। বাড়ীতে লোকজন অনেক। দেখিলেই বড় লোকের বাড়ী বলিয়া বোধ হয়।

আমাকে দ্বারে দেখিয়া একজন দরোয়ান আমার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি বিনয়বাবুর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

দরোয়ান বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে এক-জন সম্ভ্রান্ত যুবককে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আগমন করিল।

তিনি শশব্যস্তে আমার নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান ?"

আ। বিনয়কৃষ্ণবাবু। আপনারই নাম কি বিনয়বাবু ?

বি। আজ্ঞে হাঁ, আমারই নাম বিনয়কৃষ্ণ।

আ। বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি পুলিস-কর্ম্মচারী, আমি আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

বি। আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আ। মেছুয়াবাজারের মালতী বাইয়ের সহিত আপনার কি সদ্ভাব আছে ?

বি। আজ্ঞে আলাপ ছিল বটে, সম্প্রতি বিবাদ হইয়াছে। এখন আমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু।

আ। কি জন্য বিবাদ, আমাকে আদ্যোপান্ত বলুন ? বাইজীর সন্দেহ—

বাধা দিয়া বিনয়কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "আমি যে তাহার প্রেমের চাকরকে হত্যা করিয়াছি, বাইজী আমার মুখের উপরই সে কথা বলিয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, সে মৌখিক ভয় দেখাইতেছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি, কেবল মৌখিক নয়, আমার উপর সন্দেহ করিয়া পুলিসে পর্য্যন্ত সংবাদ দিয়াছে। ভাল, আপনি অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, আমি দোষী কি না ? দোষী হই, উপযুক্ত দণ্ড লইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, "যখন বাইজী আপনাকে সন্দেহ করিয়াছেন এবং আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন, তখন আমাকে দেখিতে হইবে যে, আপনি দোষী কি না ? দোষী হইলে আপনার কোনরূপে অব্যাহতি নাই।"

অতি বিনীতভাবে বিনয়কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা ভাবিতেছেন, বাইজীর মুখে যাহা শুনিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। আপনারা অনেক খুনী আসামী দেখিয়াছেন, দোষী দেখিলেই আপনারা চিনিতে পারেন ; সত্য করিয়া, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলুন দেখি, আপনি আমাকে দেখিয়া বাস্তবিকই কি হত্যা-কারী বলিয়া মনে করেন ? যদি তাহাই হয়, তবে চলুন, আমি

এখনই আপনার সহিত যাইতেছি। কিন্তু যদি আমার মুখে সকল কথা শোনেন এবং বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আপনার ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে।”

আমি বলিলাম, “বলুন—আপনার কি বক্তব্য বলুন। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে। প্রথমতঃ বাইজীর সহিত আপনার কত দিনের আলাপ?”

বি। প্রায় দুই বৎসর।

আ। আর তাঁহার ভগ্নী বসন্ত বাইজীর সহিত?

বি। প্রায় একমাস।

আ। এইবার আপনি আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার বলুন?

বি। গতকল্য প্রাতে সুন্দরলাল আমাকে একখানি পত্র আনিয়া দেয়। পত্র পাঠ করিয়া বুঝিলাম, মালতী গার্ডেনরিচের বাগানে গিয়াছে এবং আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

আ। আপনি কি জানিতেন না যে, বসন্তবাই সম্প্রতি সেই বাগানে বাস করিতেছেন?

বি। না—তাহা হইলে আমি পূর্ব্বেই ঐ কথা সুন্দরলালকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম। বাইজীর পত্র পাইয়া আমি আন্তরিক পুলকিত হইলাম।

আ। কেন? আপনার আনন্দের কারণ কি?

বি। কোন সামান্য কারণে বাইজী আমার উপর রাগ করিয়াছিল,—আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না। দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া লইত।

আ। কি কারণে আপনাদের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল?

বিনয়কৃষ্ণ লজ্জিত হইলেন। লজ্জায় তাঁহার মুখ রক্তিমাভ ধারণ করিল দেখিয়া আমি বলিলাম, "ইহাতে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি আপনি বাস্তবিকই নিরপরাধী হন, তাহা হইলে সমস্ত কথা আমার জানা চাই। সকল কথা না জানিলে আমি আপ-নাকে রক্ষা করিতে পারিব না।"

বিনয়কৃষ্ণ মুখ অবনত করিয়া উত্তর করিলেন, "পিতার মৃত্যুর পর আমার চরিত্রদোষ ঘটে। আমি কলিকাতার অনেক বাইজীর সহিত আলাপ করিলাম এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের বাড়ী গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতাম। অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতাম বলিয়া সকল স্থানেই আমার যথেষ্ট আদর ছিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। এই সময় মালতী বাই কলিকাতায় আগমন করে এবং মেছুয়াবাজারের একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। একদিন মালতীকে অপর একজন বাইজী নিমন্ত্রণ করিল। আমি প্রত্যহই সেখানে যাইতাম; সুতরাং আমিও নিমন্ত্রিত হইলাম। শুনিয়াছিলাম, মালতী একজন বিখ্যাত গায়িকা। তাহার গান শুনিবার জন্যই তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমি সকলের অগ্রে সেখানে উপস্থিত হই। মালতী তাহার কিছু পরেই আগমন করে। অন্যান্য নিমন্ত্রিত লোক সকল তখন উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং তখন গান আরম্ভ হইল না। মালতী আমারই নিকট বসিয়া ছিল। তাহার রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি অনেক বাইজীকে দেখিয়াছিলাম, কলিকাতার প্রায় সকল বাইজীর সহিতই আমার সদ্ভাব ছিল; কিন্তু মালতীর মত অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণী পূর্ব্বে আমার নয়নগোচর হয়

নাই। আগেই বলিয়াছি, আমার তথন চরিত্রদোষ জন্মিয়াছিল, সুতরাং মালতীর রূপ দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। কথায় কথায় আলাপ হইল। মালতী আমাকে পরদিন তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল। সেই অবধি আমাদের সদ্ভাব হইল। আমি মালতীর রূপে মজিলাম, মালতীও আমাকে যথেষ্ট ভালবাসিতে লাগিল।"

এই বলিয়া বিনয়কৃষ্ণ একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আমাকে ঈষৎ হাসিতে দেখিয়া, স্বয়ং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার বিশ্বাস হইতেছে না? কিন্তু বাস্তবিকই মালতী আমাকে বড় ভালবাসিত। আমি প্রত্যহই মালতীর বাড়ীতে যাইতে লাগিলাম; যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিলাম। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে তাহার ভগ্নী বসন্ত বাই কলিকাতায় আসিল। বসন্ত মালতীর ছোট ভগ্নী, শুনিয়াছি সহোদরা, কিন্তু মালতী অপেক্ষাও রূপবতী। যতকাল বসন্ত আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, ততকাল আমি মালতীকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী মনে করিতাম, কিন্তু যেদিন বসন্তকে দেখিলাম, সেইদিন হইতেই তাহার রূপের জ্যোতিতে পতঙ্গবৎ পুড়িয়া মরিলাম। কিসে বসন্তের সহিত সদ্ভাব হইবে, কি করিয়া তাহার ঘরে যাইব, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মালতী আমায় যথেষ্ট ভালবাসিত, সে আমার মনোভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারিল; কিন্তু মুখে কোন কথা না বলিয়া, আমার সর্ব্বনাশের উপায় অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিল। আমি কিন্তু তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিলাম না। সে যখন হাসি হাসি মুখে আমাকে বসন্তের নিকট লইয়া গিয়া তাহার সহিত আলাপ

করাইয়া দিল, তখন আমি তাহার মুখে মধু, হৃদয়ে গরল বুঝিতে পারিলাম না।”

বিনয়কৃষ্ণকে বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বসন্ত এতদিন কোথায় ছিল? যখন মালতীর সহিত আপনার বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তখন আপনি কি কখনও তাহার মুখে বসন্তের কথা শোনেন নাই?”

বিনয়কৃষ্ণ লজ্জার হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আজ্ঞে না, মালতী একদিনের জন্যও বসন্তের নাম করে নাই। শুনিয়াছি, বসন্ত লক্ষ্ণৌ সহরে গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিল। শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ায় সে অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল।”

আমি বলিলাম, “বসন্তকে অনুগ্রহ করায় মালতী নিশ্চয়ই ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল?”

বি। নিশ্চয়ই। সেই হিংসারই ফলে আমায় আজ বন্দী হইতে হইয়াছে। মালতী দেখিল যে, আমি আর তাহার বাড়ীতে যাই না, যদি বা যাইতাম, বসন্তের সহিতই কথাবার্ত্তা কহিতাম।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বসন্ত কি মালতীরই বাড়ীতে বাস করিত?

বি। হাঁ। মালতীর বাড়ীতে একজন ভাড়াটীয়া ছিল, সে উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহার ঘরখানি খালি ছিল। বসন্ত সেই ঘরে বাস করিতে লাগিল।

আ। বাড়ীখানি কি মালতীর নিজের সম্পত্তি?

বি। হাঁ। আমিই মালতীর দেনা শোধ করি।

বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “দেনা? মালতীর দেনা কি জন্য?”

বিনয়বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাড়ী কিনিয়া মালতী দেনদার হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় ছয় হাজার টাকা দেনা ছিল। কিন্তু আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় সেই সমস্ত দেনা পরিশোধ হইয়া গিয়াছে।"

আ। আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, মালতী আপনার উপর রাগ করিয়াছেন ?

বি। বসন্তের সহিত আলাপ হইবার পর, আমি আর প্রত্যহ মালতীর বাড়ী যাইতাম না। বোধ হয় মালতী আমার মনের কথা বুঝিতে পারিল. সে কৌশলে বসন্তকে গার্ডেনরিচের বাগানে পাঠাইয়া দিল এবং প্রত্যহই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিল, আমিও প্রত্যহ বাধ্য হইয়া তথায় যাইতে লাগিলাম। বসন্তের কথা পাড়িলে হয় সে হাসিয়া অন্য কথা পাড়িত, না হয় একটা কোন উত্তর দিত। আমি ভাবিলাম, সে লক্ষ্ণৌসহরে ফিরিয়া গিয়াছে। আর বসন্তের কথা তুলিতাম না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। পরশ্ব প্রাতে আমি মুখপ্রক্ষালন করিতেছি, এমন সময় মালতীর এক ভৃত্য আসিয়া একখানি পত্র দিল। পত্রখানি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলাম, বুঝিলাম, মালতী সে রাত্রে গার্ডেনরিচের বাগানে আমোদ আহ্লাদ করিবে, বৈকালে আমাকে সেইখানে যাইতে হইবে। পত্রের কথামত আমি বৈকালে বাগানে গেলাম। কিন্তু মালতীবাই সেখানে ছিল না ; দেখিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী বসন্ত। আমাকে দেখিয়া বসন্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমিও তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সেখানে সে কেমন করিয়া আসিল জিজ্ঞাসা করিলাম। বসন্ত বলিল, সে অনেক দিন হইতে বাগানে বাস করিতেছে। আমি

তখন তাহাকে সেই পত্রখানি দেখাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি উহা পাঠাইয়াছ কি না? বসন্ত হাসিয়া বলিল, আমি ত লেখা পড়া জানি না। আমি ভাবিয়াছিলাম, বসন্তই কৌশলে আমাকে পত্র পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পত্রখানি তবে কে পাঠাইল? মালতীবাইএর নাম দিয়া, তাহার মত স্বাক্ষর করিয়া আমার সহিত আমার মনের মানুষ বসন্তের কে মিলন করাইয়া দিল? এমন সুহৃদ কে? অনেক- ক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারি- লাম না।

সে দিন আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত হইল। পরদিন—গত কল্য সমস্ত দিবস সেখানে থাকিয়া, রাত্রি এগারটার সময় বাগান হইতে বাহির হইলাম।

আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত রাত্রে কেন? কল্য রাত্রিও সেখানে বাস করিলেন না কেন?"

বি। বিশেষ কার্য্যের জন্য আমায় বাড়ীতে আসিতে হইয়া- ছিল। বসন্ত কোনরূপেই ছাড়িয়া দিতে চাহিল না। অনেক বাদানুবাদের পর, অনেক হাসি-কান্নার পর কিছু রাত্রি সেখানে থাকিবার পর তবে সে আমায় ছাড়িয়া দেয়। সেই জন্যই রাত্রি এগারটার পর বাগান হইতে বাহির হইয়াছিলাম। পথে আসিতে আসিতে সুন্দরলালের সহিত দেখা হইল। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, সুন্দরলালের বাগানে যাইবার কথা কিম্বা তাহার বাগান হইতে প্রত্যাগমনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার বাইসিকেলে আলোক ছিল না। সুতরাং অন্ধকারে আমি তাহার বাইসিকেলের উপর গিয়া পড়িলাম,

তাহাতে সে আমাকে অপমানিত করিল। আমার ক্রোধ হইল, আমি তাহাকে তিরস্কার করিলাম। সে আমাকে চিনিতে পারিল। আমার নাম ধরিয়া নানা প্রকার বিদ্রূপ করিল। পরশ্ব যে পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিল। আমি মালতীবাইএর স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া, তাহার নিমন্ত্রণ লইয়া হঠাৎ বসন্তের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, সে কথাও বলিতে ছাড়িল না। সে এ সকল কথা কোথা হইতে জানিতে পারিল, বুঝিলাম না। কিন্তু তাহার কথায় ও বিদ্রূপবাণে আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে সজোরে চপেটাঘাত করিলাম, সে ঘুরিয়া পড়িল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া উঠিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমি পরাস্ত হইলাম। সে আমাকে প্রহার করিল, এবং সত্বর বাইসিকেলে আরোহণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। আমিও লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলাম। আজ প্রাতে বাইজীর নিকট গিয়া তাহার ভৃত্যের পূর্ব্ব রাত্রের ব্যবহারের কথা বলিলাম। সুন্দর লাল যেরূপে আমায় অপমানিত করিয়াছিল, অবশেষে যেরূপ তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিল, সমস্ত কথাই বলিলাম, আমার কথাও বলিলাম। আমিই যে তাহাকে প্রথমে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, তাহাও বলিতে ভুলিলাম না। সুন্দরলাল বাইজীর প্রিয়তম ভৃত্য। শুনিয়াছি, এক সময়ে বাইজীর উপর তাহার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যে দিন হইতে বাইজীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাইজী আমাকেই সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। জানি না, কেন সে আজ প্রাতে আমার সহিত এরূপ নীচ ব্যবহার করিল।

এই বলিয়া বাইজী যে যে কথা বলিয়াছিল, বিনয়কৃষ্ণও সেই সেই কথা বলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনয়কৃষ্ণের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভাবিলাম, রহস্য ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। বাইজীর মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বিনয়বাবুকেই হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বিনয়বাবুর কথা শুনিয়া আমার সে ধারণা ভুল বলিয়া বিশ্বাস হইল। বিনয়কৃষ্ণ যে সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহা আমার বেশ ধারণা হইল। কিন্তু কি করিব, যিনি সুন্দরলালের অভিভাবক, তিনিই যখন বিনয়বাবুর উপর সন্দেহ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। আমি সেই কথা বিনয়বাবুকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে আমি যে তাঁহাকে নিরপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, ইহাতেই তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

ভাবিলাম, সুন্দরলাল কেমন করিয়া সেই জাল পত্রের কথা অবগত হইল? যদি সে পত্র সত্য সত্যই বাইজী লিখিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাইজী গার্ডেনরিচের বাগানে থাকিতেন। যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয়ে বাইজী নিজ কনিষ্ঠা

ভগিনীকে গোপনে বাগানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং তাঁহাদের মিলন করিয়া দিবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বাইজী নিশ্চয়ই সে পত্রের বিষয় জানিতেন না। তবে কে সেই পত্র লিখিল? বসন্তবাই বিনয়বাবুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী। সেই তাঁহাকে পত্র লিখিতে পারে। কিন্তু শুনিলাম, সে আদৌ লেখাপড়া জানে না। যদি জানিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্বে পত্র লিখিতে পারিত। প্রায় দুই মাস কাল সেই নির্জ্জনে বাস করিয়া, এতদিন পরে তাহার পত্র লিখিবার কারণ কি? বিশেষতঃ, বসন্ত যখন বিনয়বাবুকে সেই বাগানে দেখিতে পাইয়াছিল, তখন সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। যদি বাস্তবিকই সে পত্র লিখিত, তাহা হইলে সে পূর্ব্বেই বিনয়কৃষ্ণকে সেখানে আসিয়া দেখা করিতে পত্র লিখিতে পারিত। বসন্ত নিশ্চয়ই সে পত্র লিখে নাই। তবে কে লিখিল? সুন্দরলাল সেই পত্রের কথা কোথা হইতে জানিতে পারিল? তবে কি সেই সে পত্র লিখিয়াছে? তাহার স্বার্থ কি? এরূপ পত্র সে লিখে কেন? যখন বিনয়বাবুকে বাইজী ভালবাসিতেন এবং যে দিন হইতে বিনয়বাবুর সহিত বাইজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে সুন্দরলাল পূর্ব্বের মত বাইজীর আর প্রিয়পাত্র ছিল না, তখন সেই বা কেন বিনয়বাবুর এই উপকার করিবে? পত্র না লিখিয়া মুখেই বা সে কথা বলিল না কেন? পত্র লিখিয়া উভয়ের মিলন করিয়া দেওয়ায় তাহার স্বার্থ কি?

এইরূপ কিছুক্ষণ চিন্তার পর ভাবিলাম, সুন্দরলালই সেই পত্র লিখিয়াছে। তাহারই স্বার্থ আছে দেখিতেছি। কারণ বিনয়কৃষ্ণকে বাইজীর বাড়ী হইতে দূর করিতে পারিলে, সেই বাইজীর

প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। পূর্ব্বের মত বাইজীর উপর প্রাধান্য করিতে পারিবে। যতকাল বিনয়কৃষ্ণ বাইজীর বাড়ীতে যাতায়াত করিবেন, ততকাল সে কিছুই করিতে পারিবে না, এই স্থির করিয়া বিনয়কৃষ্ণকে বাগানে পাঠাইয়া দিবার জন্যই ঐ পত্রখানি লিখিয়াছিল।

এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে পর, বিনয়বাবু বলিলেন, "চলুন, আমায় কোথায় লইয়া যাইবেন; আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি আপনার সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমি উহার কিছুই জানি না।"

আমি আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। পরে বিনয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি যে পত্র পাইয়া গার্ডেনরিচের বাগানে গিয়াছিলেন, সে কথা বাইজী জানে কি ?"

বি। না। সে কথা বলিতে সাহস করি নাই।

আ। তবে আপনি হঠাৎ বাগানে গিয়াছিলেন কেন, এ কথা কি তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই ?

বি। করিয়াছিল। কিন্তু আমার নিকট প্রকৃত উত্তর পায় নাই। আমি বলিয়াছিলাম, কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে গার্ডেনরিচে গিয়া বসন্তকে সেই বাগানে দেখিতে পাই। বসন্ত আমায় দেখিয়া তাহার নিকট যাইতে অনুরোধ করে। আমি তাহার কথামত সেই বাগানে গিয়াছিলাম।

আ। আপনার কথা শুনিয়া বাইজী বিশ্বাস করিয়াছিল কি ?

বি। বোধ হয়, না। সে আমার কথা শুনিবা মাত্র অট্ট-

হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, বিনয়বাবু, আজকাল এত সত্য-বাদী হইলেন কেমন করিয়া? আমি সে কথা গ্রাহ্য করিলাম না; হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম।

আ। আমার বোধ হয়, বাইজী আপনার সেই পত্রের কথা জ্ঞাত আছেন।

বি। আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে। কিন্তু সেই বা জানিল কিরূপে?

আ। আমার বোধ হয় সুন্দরলালই সে কথা বলিয়াছে।

বি। সুন্দরলাল সে কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিল?

আ। সুন্দরলাল স্বয়ংই সে পত্র লিখিয়াছে। বাইজীর স্বাক্ষর তাহার বেশ জানা ছিল। সেই জন্য তাহার উপর আমার সন্দেহ হইতেছে। কিন্তু এখন এ সন্দেহ নিষ্পত্তি করিবার উপায় নাই। কেন না, সুন্দরলাল আর এ জগতে নাই।

বি। পত্রের কথা ছাড়িয়া দিন—এখন সুন্দরলালকে হত্যা করিল কে? আর কি উদ্দেশ্যেই বা সে এ কাজ করিল?

আমি সহসা কোন উত্তর করিলাম না! আমি একজনের উপর সন্দেহ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যতক্ষণ না ভাল করিয়া জানিতে পারি, ততক্ষণ সে কথা প্রকাশ করিতে পারিব না। বিনয়কৃষ্ণ আমার উত্তর না পাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয় রহিলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি উত্তর করিলাম, "কে যে সুন্দর-লালকে খুন করিয়াছে এবং কেনই বা সে এই ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। আপাততঃ আমি একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। সুন্দরলাল

আপনাকে অপমানিত ও প্রহার করিয়া পলায়ন করিলে পর, আপনি আর তাহার কোন সংবাদ রাখিয়াছিলেন?"

বিনয়কৃষ্ণ আমার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন; পরে বলিলেন, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে প্রস্থান করিলে পর আমিও বাইসিকেলে চড়িয়া বাড়ীর দিকে আসিয়াছিলাম, বাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে দেখিলাম, একখানি বাইসিকেল পুনরায় পোলের দিকে দৌড়িতেছে। কে যে তাহার উপর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু সে বাইসিকেলেও আলোক ছিল না। আমার সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, সুন্দরলালই ফিরিয়া আসিতেছে। এই ভাবিয়া স্বয়ং গাড়ী হইতে নামিলাম ও বাতিটী নিভাইয়া বৃক্ষতলে বাইসিকেল রাখিয়া অতি ধীরে ধীরে পোলের ধারে গেলাম।"

বিনয়বাবুকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সকল কথা আপনি পূর্ব্বে আমার নিকট বলেন নাই কেন?"

লজ্জার হাসি হাসিয়া বিনয়বাবু উত্তর করিলেন, "যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতেই আপনারা আমার উপর সন্দেহ করিয়াছেন; যদি এ সকল বলিতাম, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? এখন আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি সত্য সত্যই নির্দ্দোষী—সেই জন্যই আপনার নিকট এ সকল কথা বলিতে সাহস করিয়াছি।"

আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পোলের ধারে গিয়া কি দেখিলেন?"

বি। দেখিলাম, বাইসিকেলখানি ভূমির উপর ফেলিয়া আরোহী কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। আমার চপেটাঘাতে সুন্দরলাল যেখানে পড়িয়া গিয়াছিল, সেই লোকটী ঠিক সেই-স্থানেই কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,

কুয়াসার জন্য চারিদিকে অন্ধকার ছিল। সুতরাং সে মধ্যে মধ্যে আলোক জ্বালিতে ছিল। আমি কিছু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমে তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ভাল করিয়া না দেখিয়াও সেখান হইতে নড়িতে ইচ্ছা হইল না। আমি অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইলাম; এবং একটি গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম। ঠিক এই সময় সেই ব্যক্তি একটী দিয়াশালাই জ্বালিল, সেই আলোকে আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। দেখিলাম, সুন্দরলাল। ভাবিলাম, সুন্দরলাল আবার ফিরিয়া আসিল কেন? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সুন্দরলাল সেই স্থান হইতে কি যেন তুলিয়া লইল। আমার তখন বোধ হইল, পড়িয়া যাওয়ায় সুন্দরলাল সেখানে কোন বস্তু ফেলিয়া গিয়াছিল। সেই বস্তুর অন্বেষণের জন্যই সে সেখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। যখন দেখিলাম, সুন্দরলাল আবার বাইসিকেলে আরোহণ করিল, তখন আমিও আর অপেক্ষা করিলাম না। বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সহসা এই সময় একটি বন্দুকের শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। শব্দের গতি লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি পূর্ব্বে এই অশ্বারোহীকে দেখিতে পান নাই?"

বি। আজ্ঞে না। কোথা হইতে কখন যে সে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আ। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আপনি কি সেই দিকে গিয়াছিলেন?

বি। আজ্ঞে না। অশ্বারোহীকে দ্রুতবেগে যাইতে দেখিয়া

ভাবিলাম, অন্ধকারে যাইতেছেন বলিয়া ঐরূপ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছেন।

আ। কতবার বন্দুকের শব্দ শুনিয়াছিলেন ?

বি। তিন চারিবার।

আ। পথে কি তখন কোন লোক ছিল না ? একজন কনষ্টেবলও কি সেখানে উপস্থিত ছিল না ?

বি। আজ্ঞে না। অশ্বারোহী চলিয়া যাইলে আমিও সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

আ। আপনি ভাল করিয়া দেখিয়াছিলেন ? অশ্বারোহীকে কি চিনিতে পারেন নাই ? সত্য কথা না বলিলে আপনাকে রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইবে। সমস্ত কথা খুলিয়া বলুন। আমি শীঘ্রই প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া আপনাকে মুক্ত করিব।

বিনয়বাবু অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, আমি আর কোন কথা গোপন করি নাই। আমি অশ্বারোহীকে চিনিতে পারি নাই। বিশেষতঃ তাহার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত ছিল।"

বিনয়কৃষ্ণের কথা সত্য বলিয়া আমার ধারণা হইল। আমি তখনই একখানি গাড়ী আনিতে বলিলাম। গাড়ী আনীত হইলে, বিনয়বাবুকে লইয়া, তাহাতে আরোহণ করিলাম। গাড়ী থানাভি-মুখে ছুটিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যখন থানায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা প্রায় দুইটা। বিনয়কৃষ্ণকে হাজতে রাখিয়া আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। ভাবিলাম, সেই রাত্রে অশ্বে আরোহণ করিয়া কে সুন্দরলালকে খুন করিল? কেনই বা সে এমন ভয়ানক কার্য্য করিল? বিনয়-কৃষ্ণের মুখে যে সমস্ত কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বোধ হইল, সুন্দরলালের কোন গুপ্ত শত্রু ছিল। বোধ হয়, সুন্দরলালকে হত্যা করিবার জন্য সে ঐ পোলের নিকট গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। কে সেই লোক? সুন্দরলালের শত্রু কে? বাইজী সুন্দর-লালকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি হয় ত বলিতে পারেন, সুন্দরলালের শত্রু কে? কিন্তু তাঁহাকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, যখন তিনি বিনয়কৃষ্ণকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, তখন অপর কোন লোক সুন্দরলালের শত্রু হইলেও তিনি বলিবেন না। রহস্য ক্রমেই ভয়ানক হইয়া উঠিল। সেই অশ্বারোহী কে? কি উপায়ে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়?

এইরূপ চিন্তা করিয়া আর একবার বাইজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলাম। বিনয়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছি, এই সংবাদ দিবার অভিপ্রায়ে আমি মেছুয়াবাজারে বাইজীর বাড়ীতে গমন করিলাম।

বাইজী তখন বেশ-ভূষা করিতেছিলেন, সুতরাং তখনই দেখা

হইল না। একজন চাকর আমাকে অতি সমাদরে উপরের বৈঠকখানায় লইয়া গেল। আমি সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা অতীত হইল, বাইজী তখনও আসিলেন না। বেশ-ভূষাই যাহাদের একমাত্র উপজীবিকার উপায়, বেশভূষার পরিপাট্যে যাহারা মুনির মনও বিচলিত করেন, বেশভূষা করিতে তাহাদের যে যথেষ্ট সময় লাগিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমি যে ঘরে বসিয়াছিলাম, হঠাৎ সেখানে একজন রমণী প্রবেশ করিল। কি জন্য যে সে সেখানে আসিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রায় সকল দ্রব্যেই এক একবার হাত দিল। সে যে বিশেষ কোন কার্য্যে আসিয়াছিল, তাহা বোধ হইল না।

ঘরে প্রবেশ করিয়া সে এক-একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং চারিচক্ষু মিলিত হইবা মাত্র হাসিয়া মুখ অবনত করিতে লাগিল। আমি তাহার উদ্দেশ্য ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তবে সে যে আমার সহিত কথা কহিতে অভিলাষী, তাহা স্পষ্টই জানিতে পারিলাম।

রমণীর বয়স প্রায় বাইশ বৎসর। তাহাকে দেখিতেও মন্দ নহে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে দাসী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু নিকটে আসিলে বুঝিলাম, সে দাসী নহে—হয় ত বাইজীর সঙ্গিনী।

রমণীর কথা কহিবার বাসনা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাইজীর এখানে আসিতে আর কত বিলম্ব হইবে?"

আমার কথায় রমণী যেন বিশেষ পুলকিত হইল। একগাল

হাসিয়া বলিল, "এই ত সবে চুল বাঁধিতেছেন। তাহার পর গাত্র মার্জ্জনা করিবেন, পরে বেশভূষা করিবেন, তবে আসিবেন। এখনও প্রায় ঘণ্টা খানেক বিলম্ব হইবে।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়া গিয়াছে, আরও এক ঘণ্টা পরে বাইজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া, আন্তরিক বিরক্ত হইলাম। কিন্তু কি করিব? উপায় নাই। যে কার্য্যের জন্য সেখানে গিয়াছিলাম, তাহা শেষ না করিয়া ফিরিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, রমণীর সহিত কথাবার্ত্তায় সময়াতিবাহিত করিব। এই ভাবিয়া যেমন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিব, অমনই তাহাকে ঘরের একটী জানালার দিকে যাইতে দেখিলাম।

বাইজীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় যে গৃহে বসিয়াছিলাম, এটি সে গৃহ নহে। ঘরটী পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহ হইতে অনেক বড়, আরও উত্তমরূপে সজ্জিত। ঘরখানি দৈর্ঘে প্রায় ষোলহাত, প্রস্থেও বার হাতের কম নহে। ঘরের মেজের উপর ঢালা বিছানা। বিছানার চারিদিকে স্প্রিংয়ের কোচ ও চেয়ার সাজানো। দেওয়ালে কতকগুলি ভাল ভাল ছবি—অধিকাংশই নগ্ন। একটী দেওয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আয়না—ফ্রেমগুলি সোণালী কাজ করা। আয়নার উপরিভাগে একটা হাতীর দাতের ব্র্যাকেট; তাহার উপর এক অতি সুন্দর ঘড়ী। ঘরের মধ্যে তিনটী বেলোয়ারী ঝাঁড়। ভিতরের ছাদে তিনখানি টানা পাখা দোদুল্যমান। ঘরের আটটী জানালা ও দুইটি দরজা। জানালাগুলি বন্ধ ছিল বলিয়া গৃহে বেশী আলোক ছিল না।

রমণী জানালার নিকট গিয়া জানালা খুলিল। ঘরের অন্ধকার অনেকটা দূর হইল। কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্ব্বেই সেই

রমণী জানালা হইতে "নাজির" "নাজির" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

যেদিকে চাহিয়া রমণী চীৎকার করিতেছিল, সেই দিক হইতে উত্তর আসিল, "নাজির এখানে নাই।"

উত্তর পাইয়া রমণী জানালা বন্ধ করিতেছিল, আমি নিষেধ করিলাম; বলিলাম, "যদি বাধা না থাকে, তাহা হইলে জানালাটী খোলাই থাকুক; ঘরে বেশ আলোক আসিতেছে।"

আমার কথায় হাসিয়া রমণী উত্তর করিল, "কেন, যতক্ষণ আপনি আছেন, ততক্ষণ আর অন্য আলোকের প্রয়োজন কি? আপনার রূপেই ত ঘর আলো হইয়াছে।"

আমি দেখিলাম, রমণী বড় মুখরা। কথার উত্তর না দিলে সে সন্তুষ্ট হইবে না। বলিলাম, "যতক্ষণ আমি একা ছিলাম, ততক্ষণ ঘরটী অন্ধকারময় ছিল, তুমি আসিবামাত্র আলোকিত হইয়াছে। তুমি চলিয়া যাইতেছ বলিয়াই আমি জানালা খুলিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছিলাম। যদি তুমি এখানে থাক, তাহা হইলে কেবল জানালা কেন, দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেও ঘরটী আলোকিত থাকিবে। ভাল কথা, নাজির কে? তুমি এই কতক্ষণ যাহাকে ডাকিতেছিলে সে কে?"

রমণী আমার কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ভাবিল, শিকার বুঝি জালে পড়িল। আমার নিকট কিছু অগ্রসর হইয়া, হাসিতে হাসিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "নাজির বাই-জীর প্রধান কোচমান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাইজীর আস্তাবল কি ঐদিকে?"

র। হাঁ—এই জানালা দিয়া দেখা যায়।

আ। আস্তাবলের দরজা কোন্ দিকে ?

র। এই বাড়ীর পশ্চাতে।

আ। বাইজীর প্রধান কোচমানের নাম নাজির ? সর্ব্বশুদ্ধ বাইজীর ক'জন কোচমান আছে ?

র। তিনজন।

আ। আর সহিস ?

র। সাতজন।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বাইজীর সাতজন সহিস! তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার সাতটী ঘোড়া আছে। সচরাচর লোকে, যতগুলি ঘোড়া, ততগুলি সহিস রাখিয়া থাকে। যখন সাতজন সহিস আছে, তখন তাঁহার সাতটী ঘোড়াও আছে। রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাইজীর গাড়ী ক'খানা ?"

র। দুইখানি।

আ। দুইখানি গাড়ীতে সাতটী ঘোড়া ?

রমণী হাসিল, কোন উত্তর করিল না। আমার সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, বাইজী এতগুলি ঘোড়া লইয়া কি করেন ?

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাইজীর সহিত তোমার সম্বন্ধ কি ?"

র। বিশেষ কিছুই নয়—তবে তিনি আমায় বড় ভালবাসেন।

আ। কতদিন বাইজীর কাছে রহিয়াছ ?

র। প্রায় তিন বৎসর।

এই বলিয়া রমণী সেখান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল; বলিল, "বাইজীর কথা শুনিতে পাইতেছি, বোধ হয় তিনি এই দিকেই আসিতেছেন।"

রমণী প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরেই বাইজী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়াছি। একা বসিয়া থাকিতে আপনার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই।"

আমি মিষ্ট কথায় উত্তর করিলাম, "আমার কোন কষ্ট হয় নাই।" তাহার পর বলিলাম, "বিনয়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি এখন হাজতে, কথাবার্ত্তায় বোধ হয়, তিনিই হত্যাকারী। কিন্তু যতক্ষণ না ইহা প্রমাণ করিতে পারিব, ততক্ষণ তাহাকে শাস্তি দিতে পারিব না। কি করিয়া প্রমাণ করিব, তাহার উপায় বলিতে পারেন ?"

বাইজী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "সে কি! আপনারা পুলিসের লোক ; আপনাদিগকে আমি কি উপায় বলিয়া দিব ? আমি সামান্যা রমণীমাত্র।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রমণী সামান্যা নহে। আমাদের দেশের রাণীও একজন রমণী ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তোষামোদ করিলে ভগবানও সন্তুষ্ট হন, মানুষ কোন্ ছার! আমার তোষামোদপূর্ণ কথায় বাইজী আন্তরিক আহ্লাদিত হইলেন ; বলিলেন, "যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন বিনয়বাবুকে সমস্তই স্বীকার করিতে হইবে। পথে তাঁহার সহিত সুন্দর-

লালের সাক্ষাৎ হইল, উভয়ের ভয়ানক বচসা হইল, বিনয়বাবু আমার ভৃত্যকে ভয়ানক প্রহার করিলেন, সুন্দরলালও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও প্রহার করিল। তাহার পর কি বিনয়বাবু আমার ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিলেন? তিনি কি তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, অপমানের প্রতিশোধ না তুলিয়া, বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন? এ কথা কি সম্ভবপর হইতে পারে? নিশ্চয়ই না; তিনি আমার ভৃত্যহস্তে লাঞ্ছিত হইয়া, তাহাকে খুন করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে এ সকল কথা বলিবেন, তাহা হইলে তিনি সমস্তই স্বীকার করিবেন!"

আমি বাইজীর কথায় সায় দিলাম; বলিলাম, "আমারও সেইরূপ ধারণা। লোকটাকে বাহ্যিক দেখিলে বড় শিষ্ট শান্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার অন্তর সরল নহে। তিনি আমার সমক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার একবর্ণও সত্য নহে।"

আমার কথায় বাইজী বড়ই সন্তুষ্টা হইলেন। নানাপ্রকারে আমার সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি তখন অন্য কথা তুলিলাম, তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির কথা কহিলাম, তাঁহার ভাড়াটীয়া বাড়ী কয়খানি জিজ্ঞাসা করিলাম। এইরূপ কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার গাড়ী ক'খানি?"

গাড়ীর কথা শুনিয়া বাইজীর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইল। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য; বাইজী তখনই আত্মসংবরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার গাড়ী-ঘোড়ার বড় সখ। গাড়ী দুই-খানা আছে বটে কিন্তু তাহাতেও আমার তৃপ্তি হয় না। সুবিধামত ভাল গাড়ী পাইলে আমি আরও দুই একখানি কিনি।"

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "গাড়ীত দুখানা, ঘোড়া কটা?"

বা। সাতটা ঘোড়া আছে।

আ। কেন? এতগুলি ঘোড়া কেন?

বাইজী গম্ভীর হইলেন—কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "ভাল ঘোড়া পাইলে আরও কিনি।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাতটী ঘোড়ার মধ্যে কি একটীও ভাল নাই? ঘোড়াগুলি একবার দেখিতে পাই না? আমার একটু ঘোড়ার সক আছে।"

কিছুক্ষণ পরে বাইজী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিলেন, "যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, দেখুন না। আমার অস্তাবলে গিয়া নাজিরকে বলুন, সে আপনাকে ঘোড়াগুলি দেখাইবে।"

আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না। তথনই বাইজীর নিকট বিদায় লইয়া, তাঁহার আস্তাবলে গমন করিলাম।

বাইজীর বাড়ীখানি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আস্তাবলটীও সেই প্রকার। দেখিলেই বোধ হয়, যেন কোন ইংরাজের আস্তা-বল। সেখানে যাইবামাত্র পূর্ব্বকথিত রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে সেখানে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; বলিলাম, "তুমি এখানে?"

রমণী হাসিল; বলিল, "বাইজীর সহিত যখন আপনার কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া সে সমস্তই শুনিয়াছি। যখন আপনি ঘোড়াগুলি দেখিবার জন্য বাইজীর অনুমতি লইলেন, তখন আমিও গোপনে আস্তাবলে আসিয়াছি।"

রমণীর কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমিত ঘোড়া দেখিতে আসিয়াছি, তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছ?"

র। আপনি কি দেখেন, আমি তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।

রমণীর কথা শুনিয়া আমি আমার পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া রমণীর হস্তে দিলাম; বলিলাম, "এই লও, তোমার পারিশ্রমিক। যদি কার্য্যসিদ্ধ হয়, তবে আরও কিছু দিব।"

রমণী নোটখানি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু কি জন্য যে তাহাকে পুরস্কার দিলাম, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "এক্ষতণ তোমার সহিত কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমার নাম জানিতে পারিলাম না।"

রমণী হাসিয়া উত্তর করিল, "আমার নাম শঙ্করী। আমি বাইজীর প্রধানা দাসী।"

আমি আন্তরিক আনন্দিত হইলাম। ভাবিলাম, এই রমণীর দ্বারাই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোচমান ও সহিসগুলির মধ্যে বাইজীর প্রিয়পাত্র কে?"

রমণী আমার কথা ভাল বুঝিতে পারিল না; বলিল, "সকলেই বাইজীর প্রিয়পাত্র, বাইজী সকলকেই ভালবাসেন।"

আ। তবুও সকলের অপেক্ষা কাহাকে ভালবাসেন?

র। আমেদ আলিকে।

আ। কোথায় সে?

র। দেশে গিয়াছে, নাজিরই এখন তাহার কাজ করিতেছে।

আ। নাজিরকে বাইজী কেমন ভালবাসেন?

র। দেখিতে পারেন না। আমেদের লোক বলিয়া সে এখনও চাকরি করিতেছে। অন্য লোক হইলে এতদিন সে দূরীভূত হইত।

আ। তবে তুমি যাও—আমি নাজিরের সহিত দুই একটা কথা কহিব। কেহ দেখিলে সন্দেহ করিতে পারে।

রমণী ঈষৎ হাসিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। আমি তখন নাজিরকে ডাকিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই নাজির আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও তিন চারিজন লোক সেখানে আসিল দেখিয়া, আমি তখন তাহাকে কোন কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। দুই একটা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কৌশলে তাহাকে গোপনে দেখা করিবার কথা বলিলাম। সে সম্মত হইয়া অপর সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। আমিও আস্তাবল হইতে বাহির হইলাম। নিকটেই একটী মুদীর দোকান। দোকানদারের সহিত পূর্ব্ব হইতে আমার আলাপ ছিল; আমি সেই দোকানে গিয়া একটী গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রহিলাম। নাজির জানিত, আমি সেইখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিব।

কিছুক্ষণ পরেই নাজির সেখানে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে প্রথমে অন্যান্য অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিলাম, "বাইজীর ঘোড়া কয়টীর মধ্যে সকলগুলি তো গাড়ী টানিবার উপযুক্ত নহে। উহার মধ্যে দুইটী ঘোড়া বোধ হয় একেবারেই গাড়ী টানিতে অক্ষম। উহারা চড়িবার ঘোড়া। বাইজীর কোন লোক কি ঘোড়ায় চড়িয়া থাকে?"

নাজির সহসা কোন উত্তর করিল না। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া, আমি পকেট হইতে একখানি নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। বলিলাম, "আমি পুলিসের লোক। কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তোমায় গোটা কতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিতে ইচ্ছা করি। তুমি সকল কথার যথাযথ উত্তর দাও, যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে, আরও দশ টাকা পুরস্কার দিব।”

আমার কথায় নাজির গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, “সকল কথা বলিলে যদি আমার চাকরি যায়?”

আ। চাকরির অভাব কি? আমি তোমায় চাকরি করিয়া দিব।

নাজির সন্তুষ্ট হইল। বলিল, “বাইজী স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া থাকেন।”

আমি নাজিরের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “প্রমাণ করিতে পারিবে?”

না। কেন পারিব না? কে না জানে যে, বাইজী কোন কোন দিন ঘোড়ায় চড়িয়া মাঠে বেড়াইয়া থাকেন। মেমেদের মত পোষাক পরিয়া সেই সাদা ঘোড়ার উপর চড়িয়া তিনি মধ্যে মধ্যে মাঠে গিয়া থাকেন।

আ। কাল রাত্রে বাইজী ঘোড়ায় চড়িয়াছিল?

না। আজ্ঞে হাঁ,—কিন্তু—

আ। কিন্তু কি?

না। কিন্তু তাঁহার বেশ তখন মেমসাহেবের মত ছিল না।

আ। তিনি পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়িয়াছিলেন, কেমন?

নাজির স্তম্ভিত হইল। বলিল, “আপনি এ কথা জানিলেন কিরূপে?”

আ। যেমন করিয়াই জানি না, কথাটা সত্য কি না?

না। আজ্ঞে হাঁ।

আ। কত রাত্রে ?

না। রাত্রি দশটার পর।

আ। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর নাই ? তিনি আর কোন দিন বোধ হয় রাত্রি দশটার পর ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হন নাই ?

না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বাইজীর নিয়মবিরুদ্ধ। তাঁহার আদেশ পালন করিতেই হইবে। বিশেষতঃ আমার উপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমার চাকরি যাইবার সম্ভাবনা, সেজন্য আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি না।

আ। তিনি কখন ফিরিয়া আইসেন ?

না। রাত্রি একটার কিছু পূর্ব্বে।

আ। তখন তুমি জাগিয়া ছিলে ?

না। না থাকিলে আর রক্ষা আছে।

আ। তিনি কি রঙ্গের পোষাক পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন ?

না। কাল কাপড়ের পোষাক।

আ। এ কথা আদালতে বলিতে পারিবে ?

না। নিশ্চয়ই পারিব। এতক্ষণ আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি যদি আমার একটা চাকরি যোগাড় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি, সমস্তই বলিব।

আমি আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শঙ্করী নামে একটী রমণী বাইজীর প্রধানা দাসী। সে কি এ বিষয়ের কিছুই জানে না ?"

না। বোধ হয় জানে। কেন না, সেই বাইজীকে পোষাক

পরাইয়া দেয়, পোষাক খুলিয়া দেয়; কাপড়চোপড় গুছাইয়া রাখে। তাহাকে হাত করিতে পারিলে আপনি শীঘ্রই কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবেন।

আ। সুন্দরলালের সহিত মালতী বাইজীর কেমন সদ্ভাব ছিল?

না। বিনয়বাবুই বলুন বা অপর কোন বাবুই বলুন, তাঁহাদের সহিত বাইজীর কেবল পয়সার সম্বন্ধ। মুখে দেখাইতেন, বিনয় বাবুকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসেন, কিন্তু আসল প্রণয়ী ছিল সুন্দরলাল। সুন্দরলাল চাকর হইলেও বাইজীর হৃদয়ের মাণিক ছিল। যে দিবস হইতে বাইজীর ভগ্নী বসন্ত বাই এখানে আসিয়াছেন, সেইদিন হইতেই সুন্দরলাল আর মালতীর নহে, তাঁহার ভগ্নীর। বাইজীর ভয়ে প্রকাশ্যভাবে সুন্দরলাল বসন্তের ঘরে যাইত না, গোপনে অধিক রাত্রে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইত। মালতী বুঝিতে পারিয়া বসন্তকে তাঁহার গার্ডেনরিচের বাগানে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু এমন দিবস ছিল না, যে দিন সুন্দরলাল সেই বাগানে না গিয়াছে। সুন্দরলাল বাইসিকেলে করিয়া বাগানে যাইত, এবং চক্ষের নিমিষে তথা হইতে ফিরিয়া আসিত। গোপনে এই কার্য্য হইলেও বাইজী সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নাজিরের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, সুন্দরলালকে হত্যা করিয়াছে কে,—এবং তাহার হত্যা হইবারই বা কারণ কি? এই অবস্থা বুঝিতে পারিবার পরই উপযুক্ত পুলিস-কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া আমি বাইজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পুলিস নীচে রাখিয়া আমি উপরে উঠিলাম, দেখিলাম, বাইজী তখন পাঁচজন ভদ্রলোকের নিকট বসিয়া নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছেন, আমাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। আমার ইঙ্গিত পাইবামাত্র বাইজী ধৃত হইলেন; ও তাঁহার ঘর খানাতল্লাসি করিয়া একটি কাল রঙ্গের পুরুষের পোষাক ও একটি পাঁচনলা পিস্তল পাওয়া গেল। যে সকল ভদ্রলোক সেখানে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন, বেগতিক দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পলায়ন করিলেন।

বাইজীকে বলিলাম, "একজন নিরীহ ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, তাহা এখন প্রকাশ পাইয়াছে। তুমিই সুন্দরলালকে হত্যা করিয়াছ।"

বাইজী তখনও স্বীকার করিলেন না। বলিলেন, "আপনি অন্যায় করিয়া গ্রেপ্তার করিতেছেন, কিন্তু প্রমাণ করিতে না পারিলে আপনার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?"

আমি উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর করিলাম, "সকল দিক না ভাবিয়া কি আমরা কোন কার্য্য করিতে পারি? যে পোষাক

পরিয়া সুন্দরলালকে খুন করিয়াছিলে, যে পিস্তলের সাহায্যে রমণী হইয়া নরহত্যা করিয়াছ, তাহা এখন তোমার ঘর হইতেই বাহির হইল।

আমার কথায় বাইজী স্তম্ভিত হইলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরলাল আমার প্রিয় ভৃত্য। আমি তাহাকে হত্যা করিব কেন? বিচারক এ কথা বিশ্বাস করিবেন কেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ নাই। সুন্দরলাল তোমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিল। তুমি তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছিলে। কিন্তু পরিশেষে সে তোমাকে বঞ্চনা করিয়া তোমার ভগ্নীর হৃদয় অধিকার করিল। এদিকে বিনয় বাবুও তোমাকে ছাড়িয়া তোমার ভগ্নীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তুমি জানিতে, বিনয়বাবু তোমার ভগ্নী বসন্তকেই অধিক ভালবাসেন। সেই জন্য এবং সুন্দরলাল হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য তুমি বসন্তকে আপনার বাড়ী হইতে কৌশলে বাগানে পাঠাইয়াছিলে। বিনয় তাহার ঠিকানা জানিত না সুতরাং একবারে দুইটী পক্ষী মারিবার নিমিত্ত তুমি বিনয়কৃষ্ণকে সেই বাগানে পাঠাইয়াছিলে ও সুন্দরলালকেও সেইস্থনে পাঠাইয়া আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া লইলে। দুজনের উপরই তোমার ক্রোধ হইয়াছিল। প্রথম সুন্দর-লালের উপর। দ্বিতীয় বিনয়কৃষ্ণের উপর। তুমি সুন্দরলালকে রাত্রে এক পত্র দিয়া বাগানে বসন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলে। বলিয়া দিলে, সে যেন সেই রাত্রেই ফিরিয়া আইসে। সৌভাগ্য-ক্রমে কাল রাত্রে ভয়ানক কুয়াসা পড়িয়াছিল। তুমি পুরুষ-বেশে পিস্তল লইয়া অশ্ব আরোহণ করতঃ খিদিরপুরের পোলের

নিকট গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলে। সেইরূপ সুবিধাও হইয়াছিল। বিনয়বাবুর সহিত সুন্দরলালের বিবাদ ও শেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইল। অপদস্থ হইয়া বিনয়কৃষ্ণ বাড়ীতে পলায়ন করেন, আর তোমার ভৃত্যও বাড়ীর দিকে আসিতে থাকে। তুমি সেই সুযোগে সুন্দরলালের সম্মুখে উপস্থিত হও এবং কোন কথা না বলিয়া তাহাকে হত্যা কর। কেমন, এ কথা সত্য কি না?"

সমস্ত কথা শুনিয়া বাইজী স্তম্ভিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনি মানুষ না দেবতা? আমি ভাবিয়াছিলাম, এ সকল কথা কেহ জানিতে পারিবে না। কিন্তু আপনার কথায় ও কার্য্যে আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে।"

বাইজীর কথায় আমি হাসিয়া উঠিলাম এবং বিলম্ব না করিয়া তখনই তাঁহাকে লইয়া থানায় প্রত্যাগমন করিলাম।

থানায় গিয়া মালতি সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত স্বীকার করিলেন। আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, দেখিলাম, সেই অনুমান বর্ণে বর্ণে মিলিল।

বিনয়কৃষ্ণ সেই রাত্রেই অব্যাহতি পাইলেন।

বাইজী যে সকল কথা আমাদের নিকট স্বীকার করিল, তাহার পোষকতা করিবার নিমিত্ত যতদূর সম্ভব প্রমাণ পাওয়া গেল, কিন্তু তাহার নিজের কথা বাদ দিলে সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া হত্যাকারীর দণ্ড ইংরাজ আইনে হয় না। বিচারকালে ব্যবহার-জীবিগণের পরামর্শ অনুযায়ী সে তাহার সমস্ত দোষ অস্বীকার করিল, ও বিচারে অব্যাহতি পাইল। কিন্তু ঐ মকদ্দমায় তাহার যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ও অর্থ ছিল সমস্তই ব্যয় হইয়া গেল।

তিনিও পরিশেষে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় বসন্তকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

রাস্তায় খুন।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [জ্যৈষ্ঠ

রাস্তায় খুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল। আকাশ প্রায় সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে অল্প ও মধ্যে মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া এই কলিকাতা সহরের রাস্তা সকলকে একেবারে কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিয়াছে। আপন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে সহজে কাহারও ইচ্ছা হয় না। তবে যাহারা পরাধীন, পরঅন্নে প্রতিপালিত, তাহাদিগের এই দুর্য্যোগে বাহির হইতে হয়। যাহারা পরের আদেশানুবর্ত্তী, নিজের ইচ্ছাধীনে যাহাদিগের চলিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, তাহাদিগকেই এই দুর্য্যোগে বাহির হইতে হয়। যাহাদিগের বাহির না হইলে কোনরূপে উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাহাদিগকেই এই দুর্য্যোগে বাহির হইতে হয়। আর বাহির হইতে হয় আমাদিগকে—পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। অন্ধকারে মেদিনীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অবিশ্রান্তভাবে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, কলিকাতা সহরের একটী প্রধান রাজবর্ত্মের উপর এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছে, ও সেই সঙ্গে আদেশ পাইলাম, যেন শীঘ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, উহার অনুসন্ধানে লিপ্ত হই।

টিপি টিপি বৃষ্টিই হউক বা অশনিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারেই বৃষ্টি হউক, এই আদেশ পাইয়া আমাদিগের ক্ষণকালের নিমিত্তও স্থির থাকিবার উপায় নাই, সুতরাং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনাস্থলে চলিলাম।

গাড়ী শীঘ্রই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম ও মনে মনে বিশেষরূপ লজ্জিত হইলাম। কারণ দেখিলাম, আমি আমার যে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে এই হত্যার অনুসন্ধানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তিনি ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আমার পূর্ব্বেই সেইস্থানে উপস্থিত।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র যে ভয়ানক দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, সেই ভয়ানক দৃশ্য, সেই লোমহর্ষকর, সেই হৃদয়ভেদকারী দৃশ্য সহজে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কলিকাতা সহরের সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্মের ফুটের উপর রক্তাক্ত বসনে ভূষিতা, অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা সুরূপা গৌরবর্ণা রমণীর মৃতদেহ, পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে কয়জন দেখিয়াছেন, বলুন দেখি?

টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্য দিয়া অসংখ্য লোক সেই ফুটের উপর দিয়া যাতায়াত করায় উহা অতিশয় কর্দ্দমময় হইয়া পড়িয়াছে। সেই কর্দ্দমের উপর উত্তমরূপ বেশ-ভূষায় ভূষিতা সেই অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী চিরশয্যায় শায়িতা। এদেশীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ যেরূপ ভাবে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ পরিচ্ছদে সমাবৃত ছিলেন না। ভদ্রঘরের ব্রাহ্মযুবতীগণ কোন ক্রিয়াকলাপে নিমন্ত্রণ বা উপাসনা উপলক্ষে যেরূপ ভাবে পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া থাকেন, ইনিও সেইরূপ পরিচ্ছদে শোভিতা ছিলেন। তাঁহার সেই পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে

এক ভয়ানক ক্ষতচিহ্ন, ঐ ক্ষতস্থান দেখিয়া অনুমান হয়, কোন এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়াছে এবং তথা হইতে এরূপ ভাবে রুধিরধারা বহির্গত হইয়াছে যে, তাঁহার সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত হওয়া দূরে থাকুক, সে ফুটের উপরিস্থিত কর্দ্দম পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে ও রক্তধারা প্রবাহিত হইয়া ফুটের নিম্ন পর্য্যন্ত আসিয়া প্রস্তরের উপরিস্থ জলস্রোতের সহিত মিশিয়াছে।

অন্ধকারের মধ্যে টিপি টিপি বৃষ্টি হইলেও ঐ রাস্তা দিয়া লোক চলাচলের কিছুমাত্র বিরাম ছিল না। যে স্থানে ঐ যুবতীর মৃতদেহ পতিত ছিল, তাহার সন্নিকটেই একটী প্রজ্জলিত গ্যাসালোক। যে সমস্ত লোক ঐ রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিতে-ছিল, ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের প্রত্যেকেরই গতি রোধ হইয়া যাইতেছিল। ঐ হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাহাদিগের সকলকেই সেই স্থানে আকৃষ্ট করিতেছিল, সুতরাং ঐ রাস্তায় ক্রমে লোকের জনতা এত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সহজে ঐ রাস্তা দিয়া কাহারও যাতায়াতের উপায় ছিল না। গাড়ী-ঘোড়া চলা দূরে থাকুক, মনুষ্যের গমনাগমন পর্য্যন্তও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐ মৃতদেহ ঐরূপভাবে ঐ স্থানে রাখা আর যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা মৃতদেহ-পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হইল।

মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইবার প্রায় একঘণ্টা পর পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার পূর্ব্বের ন্যায় ভিড় রহিল। পরিশেষে সকলে নৈরাশ্যমনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমরা যে সকল কর্ম্মচারী

এই ভয়ানক হত্যা-রহস্যের উৎঘাটনে নিযুক্ত ছিলাম, সকলে সেই স্থান হইতে যে স্থানে ঐ যুবতী বাস করিতেন, সেই স্থানে গমন করিলাম। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন, সেই গৃহ সেই স্থান হইতে দূরবর্ত্তী নহে, বোধ হয় ৫০ হস্তের অধিক হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে স্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, ঠিক তাহার সম্মুখে একটী গলি আছে, ঐ গলি নিতান্ত অপরিসর, উহার ভিতর গাড়ী প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ গলির অধিবাসীবর্গকে কোন স্থানে গমন করিতে হইলে, ঐ গলির মোড় পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে স্থানে ঐ মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই স্থান পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া তবে গাড়ী বা ট্রামওয়ে আরোহণ করিতে হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান উপলক্ষে আমরা যে বাড়ীতে গমন করিয়াছিলাম, সেই বাড়ীর অধিকারী একজন শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্রাহ্মযুবক। তাঁহার নাম আমি এই স্থানে প্রকাশ করিব না। ইঁহার বাড়ীতেই ঐ যুবতী এখন বাস করিতেন। তিনি ব্যতীত ঐ ব্রাহ্মযুবকের বাড়ীতে আরও কয়েকটী অনাথা ব্রাহ্ম বালিকার আবাসস্থান ছিল। কোন অনাথা বিধবা বালিকাকে তাঁহার বাড়ীতে আনিত হইলে তিনি বিশেষ যত্নে

তাহাদিগকে ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন, ও ক্রমে তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়া কোন ব্রাহ্ম যুবকের সহিত তাহাদের পরিণয়কার্য্য সমাপন করিয়া দিতেন। ইহা তাঁহার একটী কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

ঐ ব্রাহ্মযুবক নিতান্ত ভদ্রলোক, এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিবার সময় তিনি আমাদিগকে যে কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ ক্রমে অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহার নিকট হইতে যদি সমস্ত সংবাদ অবগত হইতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই ভয়ানক হত্যাকারীর দণ্ড কোনরূপেই হইত না।

সেই ব্রাহ্মযুবকের বাড়ীতে গমন করিয়া, সেই স্থানে আরও ৪।৫টী যুবতী ও বালিকাকে দেখিতে পাইলাম। উহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু-বিধবা, কোন না কোন গতিকে তাঁহারা সেই স্থানে আনীত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন, কেহ বা এখনও পর্য্যন্ত নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সকলেই সেই ব্রাহ্মযুবকের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, যে স্ত্রীলোকটী হত হইয়াছেন, তাঁহার নাম বিরাজমোহিনী। বিরাজমোহিনী ঐ বাড়ীতে মাসাবধিকাল বাস করিতেছিলেন। সেই দিবস কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাঁহাদিগের সকলের সন্ধ্যার পর ঐ স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার কথা ছিল। তাঁহারা সকলে সেই নিমন্ত্রণরক্ষার্থে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিবার মানসে যেমন ঐ গলির মোড়ে আসিলেন, অমনি বিরাজমোহিনী হত হন।

তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই কয়েকটী কথা অবগত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠা ছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আমি কহিলাম, এরূপ সংক্ষেপ উত্তরে আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবার কোনরূপ উপায় হইবে না। যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া ছিল আপনারা তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আমার নিকট বর্ণন করুন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, উহা হইতে আমি এই অনুসন্ধানের কোনরূপ সূত্র বাহির করিতে সমর্থ হইব কি না।

আমার কথা শুনিয়া তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমরা এই কয়েকটী স্ত্রীলোক এই বাড়ীতে অনেক দিবস হইতে বাস করিতেছি, ও আমরা পরস্পর পরস্পরকে আপনাপন ভগ্নীর ন্যায় দেখিয়া থাকি; আমাদিগের কয়েকজনের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই। আমরা একস্থানে শয়ন, একত্রে উপবেশন, একত্রে পানভোজন করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছিলাম। আমাদিগের মধ্যে কেহ কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে অন্যান্য সকলের পরামর্শ না লইয়া কথনই সে কার্য্য করেন না। কাহার মনের ভিতর কোন কথা উদিত হইলে, কেহ কোন বিষয় জানিতে পারিলে, তাহা আমাদিগের সকলের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বলিতে কি, আমরা এই কয়েকটীতে মিলিত হইয়া—একই মন ও একই প্রাণ হইয়া কাল যাপন করিতেছিলাম। প্রায় একমাস হইল, বিরাজ মোহিনীকে এখানে আনা হয়, তাহাকে যদিও আমাদিগের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সে আমাদিগের সহিত

বিশেষভাবে মিশিত না, সে তাহার মনের কথা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিত না। আমরা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার যথাযথ উত্তরও দিত না, সে যেন সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত থাকিত। তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, কোন প্রবল চিন্তা তাহার মনের মধ্যে সতত প্রবাহিত হইতেছে; অথচ কোন কথা খুলিয়া বলিত না। আমাদিগের সহিত একত্রে খাইতে হয় বলিয়া খাইত, বসিতে হয় বলিয়া বসিত, কিন্তু সে সর্ব্বদা নির্জ্জনই ভাল বাসিত। একান্তে থাকিতে পাইলে সহজে আমাদিগের নিকট আসিত না। কেন যে সে ঐরূপভাবে থাকিত, কেন যে সে সর্ব্বদাই চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিত, তাহা আমরা তাহাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু তাহার সন্তোষজনক উত্তর কখনও পাই নাই। তাহার মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এইরূপ অবস্থায় সে প্রায় একমাস কাল আমাদিগের সহিত বাস করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমরা যাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেছি, যিনি আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে আমাদিগের নিমন্ত্রণ হয়। আজ সন্ধ্যার পর

আমাদিগের সেই নিমন্ত্রণে যাইবার কথা ছিল। বিরাজমোহিনীকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিরাজমোহিনী কিন্তু আমাদিগের সহিত ঐ নিমন্ত্রণে যাইতে অসম্মত হয়, কেন যে অসম্মত হয়, তাহা জানি না, কিন্তু পরিশেষে আমাদিগের সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগের সহিত গমন করিতে সম্মত হয়। নিমন্ত্রণে যাইবার নিমিত্ত আমরা সকলে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া সময়মত প্রস্তুত হইলাম। বিরাজমোহিনীও তাহার বস্ত্রাদি পরিধান করিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, গাড়ী আসিয়াছে। যাঁহার বাড়ীতে আমাদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গাড়ী গলির মোড়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গাড়ীতে আরোহণ করিবার মানসে আমরা সকলে একত্রে বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম, সেই সময় আমাদিগের সহিত পুরুষ-মানুষ কেহই ছিল না, আমরা এই কয়েকটী স্ত্রীলোক একত্রে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম, ও ঐ গলির মধ্য দিয়া বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম; বিরাজমোহিনীও আমাদিগের মধ্যে গমন করিতে লাগিল। গলির মোড়ে উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম, সম্মুখে গাড়ীখানি আমাদিগের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। আরও দেখিলাম, সেই স্থানে দেওয়ালের সন্নিকটে একটা লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহাকে দেখিয়া ভাবিলাম, ঐ ব্যক্তি ফুটের উপর দিয়া গমন করিতেছিল, আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া পাছে

আমাদিগের রাস্তা অবরোধ হয়, এই নিমিত্ত ভদ্রতা করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে। সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, আমাদিগের মধ্যে কেহ গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, কেহ গাড়ীর সন্নিকটে আসিল; বিরাজমোহিনী ঠিক ফুটের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল; কেহ বা তাহার পশ্চাতে রহিল। সেই সময় যে ব্যক্তি প্রাচীরের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, সে দ্রুতগতি বিরাজমোহিনীর সন্নিকটে আসিয়াই, তাহার বক্ষস্থলে একখানি সুদীর্ঘ শানিত অস্ত্র সবলে প্রবেশ করাইয়া দিল। বিরাজমোহিনী "মা গো" বলিয়া সেই স্থানে পতিত হইল, ও সেই ব্যক্তি ঐ ছুরিকাখানি তাহার বক্ষ হইতে উন্মোচিত করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা এত ভীত হইয়াছিলাম যে, সেই সময় আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনন্তর আমরা সেই স্থান হইতে দ্রুতগতি প্রস্থান করিয়া, যে গলি দিয়া আমরা বাহিরে আসিয়াছিলাম, সেই গলির ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমাদিগের মনে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তি যে কেবল বিরাজমোহিনীকেই হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, তাহা নহে, আমাদিগকেও বিরাজমোহিনীর অনুগমন করাইবে; তাই আমরা দ্রুতগতি সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম, ও চীৎকার করিয়াছিলাম। আমাদিগের চীৎকার শুনিয়া নিকটস্থ বাড়ীর প্রায় সমস্ত লোকই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আমরা যাঁহার বাড়ীতে বাস করি, তিনিও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আমরা আমাদিগের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল

তাহা আমরা দেখি নাই, তবে শুনিয়াছিলাম, যখন সকলে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হন, তখন বিরাজমোহিনীর জীবনবায়ু শেষ হইয়া গিয়াছে।"

তাঁহার নিকট হইতে এই সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমি তাঁহাকে আরও কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্র। যে ব্যক্তি ফুটের উপর প্রাচীরের সন্নিকট দাঁড়াইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই কি বিরাজমোহিনীকে হত্যা করিয়াছে?

উ। হাঁ।

প্র। ইহাতে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই?

উ। কিছুমাত্র না।

প্র। সে কোন্‌দিকে পলাইয়া গেল?

উ। যে ফুটের উপর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই ফুটের উপর দিয়াই দক্ষিণদিকে দৌড়িয়া গেল।

প্র। আপনি কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে দেখিয়াছেন?

উ। প্রায় ২০।২৫ হাত হইবে।

প্র। তাহার পর সে কোন্‌দিকে গেল, তাহা বলিতে পারেন না?

উ। না।

প্র। তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন?

উ। ঠিক্ বলিতে পারি না, বোধ হয় চিনিলেও চিনিতে পারিব।

প্র। তাহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছেন?

উ। দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হয়।

প্র। কোথায় দেখিয়াছেন ?

উ। বোধ হয় আমাদিগের বাড়ীর পশ্চাৎভাগে তাহাকে যেন একদিবস দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

প্র। সে কত দিবসের কথা ?

উ। বোধ হয় এক সপ্তাহ হইবে।

প্র। সেই সময় আপনাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ হইয়াছিল কি ?

উ। না।

প্র। উহার বয়স কত ?

উ। অনুমান ২৫ বৎসর।

প্র। দেখিতে কেমন ?

উ। বর্ণ শ্যাম, নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব, দাড়ি নাই।

প্র। আর কিছু ?

উ। আর বিশেষ কিছু মনে পড়িতেছে না।

প্র। উহার পরিধানে কিরূপ বস্ত্রাদি ছিল ?

উ। গায় বোধ হইতেছে একটী কোট ছিল, কিন্তু ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

অপরাপর স্ত্রীলোকগণ যাঁহারা বিরাজমোহিনীর সহিত নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গমন করিতেছিলেন ও যাঁহাদিগের সম্মুখে বিরাজমোহিনী হত হন, তাঁহাদিগকেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকটী যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর অধিক কোন কথা জানিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই স্ত্রীলোকদিগের সহিত আমার কথা শেষ হইয়া গেলে, তাঁহারা আমাদিগের অনুমতি লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। যে যুবকের বাড়ীতে বিরাজমোহিনী বাস করিতেন, তখন আমি সেই যুবকের সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত হইলাম। তাঁহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিবার সময়ই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধানের অনেক সাহায্য তাঁহার দ্বারা পাইতে পারিব। তখন আমি তাঁহাকে একটী নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেলাম ও সেইস্থানে উভয়ে উপবেশন করিলে পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিরাজমোহিনী আপনার বাড়ীতে কত দিন হইতে বাস করিতেছেন ?"

যুবক। প্রায় একমাস হইবে।

আমি। বিরাজমোহিনী কে ?

যু। তাহা আমি জানি না।

আ। তবে তিনি কিরূপে আপনার বাড়ীতে আসিলেন ?

যু। পূর্ব্ববঙ্গের কোন একটী প্রধান স্থানে আমাদিগের একটী সমাজ আছে। আমার একজন বিশেষ বন্ধু ঐ স্থানে থাকেন, তিনিই ঐ সমাজের প্রধান কর্ত্তা। তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইয়া অবগত হই যে, হিন্দুঘরের একটী বিধবা বালিকা তাহার পিতমাতার তাড়নায় অস্থির হইয়া ঐ সমাজের শরণাগত হয়, ও তাহাকে তাহার পিতামাতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া

লইয়া যাইবার নিমিত্ত ঐ সমাজপতিকে পত্র লেখে। তিনি কয়েকটী ব্রাহ্মযুবককে প্রেরণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন, ও আপন সমাজে তাহাকে স্থান প্রদান করেন। সেই স্থানে কিছুদিবস রাখিয়া, পরিশেষে তাহাকে এই স্থানে পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখেন; পত্র পাইয়া আমি সেই স্থানে গমন করি ও তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়া আপন বাড়ীতেই তাহার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিই। সেই পর্য্যন্তই সে আমার বাড়ীতে আমা কর্ত্তৃকই প্রতিপালিত হইতেছিল।

আ। সে যে কাহার কন্যা ও কোথা হইতে তাহাকে প্রথমতঃ আনা হয়, তাহার কিছুই আপনি অবগত নহেন?

যু। না, তাহার কিছুই আমি জানি না, জানিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই।

আ। তিনি কি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন?

যু। সে আমাদিগের আচার-ব্যবহার সমস্তই শিক্ষা করিয়াছিল, আমাদিগের ন্যায় পানভোজন করিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে এখনও দীক্ষিত হয় নাই। সে আমাদিগের ধর্ম্মের মর্ম্মাবগত হইতে পারিয়াছিল, বোধ হয়, আর এক মাসের মধ্যেই সে তাহার নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিত।

আ। তিনি সদাসর্ব্বদা মনের আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতেন কি?

যু। না, সে কাহারও সহিত বড় মিশিত না, কোন স্থানে বসিয়া মন খুলিয়া কাহারও সহিত গল্পগুজব করিত না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত মাত্র। তাহাকে দেখিয়া

অনুমান হইত, যেন তাহার হৃদয় সদাই কোন এক ভীষণ চিন্তায় পূর্ণ, তাহার মনে সুখ ছিল না, মুখে হাসি ছিল না। তাহার মনের কথা জানিবার জন্য আমার স্ত্রী বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু ইদানিং তাহার মনের যে কি প্রবল কষ্ট তাহা আমরা কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম।

আ। কি অনুমান করিয়াছিলেন?

যু। আমার বাড়ীর ছাদে উঠিবার দরজা সদাসর্ব্বদাই খোলা থাকিত, বাড়ীর যাহার যখন ইচ্ছা হইত, তখন তিনি সেই স্থানে গমনাগমন করিতে পারিতেন, ইহাতে কাহারও কোনরূপ নিষেধ বা আপত্য ছিল না। যে সকল বালিকা আমার বাড়ীতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ু সেবন করিতে প্রায়ই ঐ ছাদে আরোহণ করিতেন। বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রীও প্রায়ই সেই সঙ্গে থাকিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর আমার স্ত্রী আমার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে একাকী ছাদের উপর উঠিয়াছিলেন, সেই স্থানে দেখিতে পান, একটুকরা প্রস্তরের সহিত বাঁধা একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি পত্রখানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করেন, ও অপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া উহা আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করেন। আমি সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হই, ও স্পষ্টই বুঝিতে পারি, কেন বিরাজমোহিনী সদাসর্ব্বদা বিষাদের সহিত দিনযাপন করিতেছিলেন।

আ। সে পত্রখানি কোথায়?

যু। বিশেষ যত্নের সহিত উহা আমি আমার বাক্সের মধ্যে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

আ। দেখুন দেখি, আপনার বাক্সে সেই পত্রখানি আছে কি না?

যু। পত্রখানি অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে আপনাকে আরও দুই-একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, ইহা হইতেও বোধ হয়, আপনার এই অনুসন্ধানের অনেক সাহায্য হইতে পারিবে।

আ। বলুন।

যু। ঐ পত্র পাইবার পর হইতে সকলকেই ছাদে উঠিতে নিষেধ করিয়া দিই ও ছাদে উঠিবার সিঁড়ির দরজা একটী তালা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখি। ঐ তালার চাবি আমার নিজের কাছেই থাকিত। যখন আমার স্ত্রীর ছাদে উঠিবার আবশ্যক হইত, তখনই কেবল তাঁহাকে ঐ চাবি প্রদান করিতাম। বালিকাগণের মধ্যে কাহারও ছাদে উঠিবার প্রয়োজন হইলে আমার স্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া পুনরায় ঐ দরজায় তালাবদ্ধ করিয়া দিতেন, ও চাবি আমার নিকট রাখিয়া যাইতেন। আজ কয়েকদিন হইল আমার স্ত্রী যখন একাকী ছাদে উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি আর একখানি পত্র তথায় দেখিতে পান, এবং তৎক্ষণাৎ উহা আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করেন। আমি ঐ পত্রখানি পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ভয়ানক বিপদ সমীপবর্ত্তী।

আ। সে চিঠিখানি কোথায়?

যু। তাহাও আমার নিকট আছে। এই বলিয়া তিনি পত্র দুইখানি তাঁহার বাক্স হইতে বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান

করিলেন। পত্র দুইখানিই বিরাজমোহিনীর উদ্দেশে বাঙ্গালায় লিখিত। আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ পত্র দুইখানি পাঠ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি প্রথম পত্রখানি অগ্রে পাঠ করিলাম, উহার লেখা এইরূপ ;—

বিরাজ!

তুমি আজকাল আমার উপর এরূপ নির্দ্দয় হইলে কেন? আমি তোমাকে যেরূপ অন্তরের সহিত ভালবাসি, তাহা তুমি উত্তমরূপে অবগত আছ; তোমার জন্য এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমি না করিয়াছি কি, তাহাও তুমি উত্তমরূপে জান। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও তুমি যে কেন আমার উপর এইরূপ নির্দ্দয় হইলে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার প্রণয়ে পড়িয়া আমার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে? তোমার নিমিত্তই আমার পূজনীয় পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, প্রিয়তমা পত্নীকে ইহ-জীবনের নিমিত্ত হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। তোমার নিমিত্ত আমি যে সকল মহাপাপ করিয়াছি, এখন বোধ হইতেছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের সময় সন্নিকটবর্ত্তী; নতুবা তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া,

তোমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে দারুণ শোক-সাগরে ভাসাইয়া, গভীর রাত্রে বাড়ী পরিত্যাগ করিবে কেন? জানি না, তুমি কাহার পরামর্শে এইরূপ কার্য্য করিয়াছ? জানি না, তুমি কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের শরণাগত হইয়াছ? জানি না, কে তোমাকে এইরূপ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছে? জানি না, তুমি স্ব-ইচ্ছায় এই কার্য্য করিয়াছ কি না? জানি না, আমার উপর তোমার যে ভালবাসা ছিল, সেই ভালবাসা অপরের উপর অর্পিত হইয়াছে কি না? বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি স্ব ইচ্ছায় এই স্থানে রহিয়াছ, কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর কেহ তোমাকে এই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? ইহা যদি আমি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমাকে এই পত্র লিখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইত না। যাহা আমি ভাল বুঝিতাম, যাহা আমার বুদ্ধিতে আসিত, তৎক্ষণাৎ আমি তাহাই করিতাম।

তুমি নিরুদ্দেশ হইবার পর জানিতে পারিয়াছিলাম, কয়েকটী যুবক তোমাকে একখানি নৌকা করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা যে কে, তাহা আমি এখনও পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। তাই তাহারা বাঁচিয়া গেল, নতুবা তাহাদিগের অদৃষ্টে যে কি হইত, তাহা বলিতে পারি না।

তোমার নিরুদ্দেশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও, যে ব্রাহ্ম সমাজে তুমি রক্ষিতা হইয়াছিলে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই, ও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করি, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। পরে তুমি সেই স্থান হইতে এই স্থানে আনীত হও। আমিও সন্ধানে সন্ধানে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই, ও অনেক কষ্টের পর তুমি যে

বাড়ীতে আছ, তাহার সন্ধান পাই, ও যাহাতে তোমাকে দেখিতে পাই, সেই মানসে তোমার বাসস্থানের অতি সন্নিকটে একটী "মেসে" বাস করিতেছি। ঐ মেসের ছাদের উপর হইতে তোমাকে, তোমাদিগের বাড়ীর ছাদের উপর আজ কয়েকদিবস হইতে দেখিতে পাইতেছি। জানি না, তুমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছ কি না। আমাকে দেখিতে পাইয়া থাক বা না থাক, আমার এই পত্র পাইবামাত্র যেরূপ উপায়ে হউক, তুমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া আসিবে। দিনমানে আসিতে পারিবে না জানি, কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে যখনই সুযোগ পাইবে, তখনই চলিয়া আসিবে। তোমাদিগের বাড়ীর গলি হইতে বাহির হইলেই, বড় রাস্তার উপর ঐ গলির মোড়ের সন্নিকটে কোন না কোন স্থানে আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি দেখিতে পাইবে। যদি মঙ্গল চাও, আমার উপদেশ মত কার্য্য করিবে। নতুবা জানিও, তোমার পৃষ্ঠপোষকগণকে ও তোমার আশ্রয়দাতাদিগকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। আজ আমি তোমাকে আর অধিক কথা বলিতে চাহি না, আমার উপদেশ মত কার্য্য না করিলে, আমি বুঝিতে পারিব যে, তুমি যে বিরাজ ছিলে, এখন আর সে বিরাজ নহ;—আমার উপর তোমার যেরূপ ভালবাসা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তুমি কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ স্থানে বাস করিতেছ, না অপর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছ? আমি জীবিত থাকিতে তুমি তোমার অপর কোন উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না। কুপথে পদার্পণ করিয়া আপনি মজিয়াছ ও আমাকে মজাইয়াছ,

কিন্তু জানিও, আমি জীবিত থাকিতে তুমি আর কাহারও প্রণয়-পাত্রী হইতে পারিবে না।

হরিশ।

প্রথম পত্রখানি পাঠ করিবার পর দ্বিতীয় পত্রখানি পাঠ করিলাম। ইহা নিতান্ত সংক্ষেপ পত্র, উহাতে লেখা ছিল :—

বিরাজ, আমি উপর্য্যুপরি প্রায় ১০খানি পত্র লিখিয়া তোমা-দিগের ছাদের উপর ফেলিয়াছি, তাহার একখানি না একখানি তোমার হস্তগত হইয়াছে। কারণ, আমার পত্র তোমার হস্তগত না হইলে, তুমি কখন তোমাদিগের ছাদে উঠা বন্ধ করিতে না। তোমাকে আমি এখন বেশ চিনিয়াছি, আমাকেও তুমি ভাল রকম চিনিবে। তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ ছিল, জানিও, এখন সেই সম্বন্ধ লোপ হইয়াছে। এখন হইতে তুমি আমাকে তোমার বিষম শত্রু বলিয়া জানিও। কেবল জানা নহে, এখন তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও। জানিও, আমার হস্তেই তোমার অস্তিত্ব জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু তোমার মহাপাপের কথা, তোমার কলঙ্কের কথা যাহারা জানিত না, বা যাহারা কখন শুনে নাই, তাহারা এখন জানিবে, ও লোকমুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। জানিও, এই আমার শেষ পত্র।

হরিশ।

পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধান সম্বন্ধে আর আমাদিগকে বিশেষ ভাবিতে হইল না। বেশ বুঝিতে পারি-লাম, কাহার দ্বারা বিরাজমোহিনী হত হইয়াছে; সে কে ও এখন কোথায় থাকে ?

এখন আমাদিগের প্রধান কার্য্য হইল, এই পত্র-লেখককে

বাহির করা। তাহাকে ধরিতে পারিলেই এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধান একরূপ শেষ হইয়া যাইবে। মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ পত্র-লেখকের অনুসন্ধানে সত্বর তথা হইতে বহির্গত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঐ বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন্ বাড়ীতে মেস্ আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি সামান্য মাত্র অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, ঐ বাড়ীর প্রায় শতগজ ব্যবধানে একটী দোতালা পাকা বাড়ীতে একটী মেস্ আছে। ঐ মেসে কয়েকটী স্কুলের বালক ও কয়েকজন অফিসের কর্ম্মচারী বাস করেন।

ঐ মেসে গিয়া দুই-একজনকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, প্রায় ১০।১৫ দিবস হইল, হরিশ নামক এক ব্যক্তি ঐ মেসে আসিয়া বাসা লইয়াছেন। তিনি সকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি রেলওয়ে অফিসে কার্য্য করেন, কিন্তু কোন্ রেলওয়ে অফিস তাহা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলেন নাই, এবং কেহ তাহা অবগত নহেন। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কোন লোক ঐ বাসায় থাকেন না, এবং তাঁহার বাসস্থান প্রভৃতির বিষয় কেহই কিছু অবগত নহেন।

আরও জানিতে পারিলাম, প্রায় ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে হরিশের অবস্থা দেখিয়া সকলে অনুমান করেন, তিনি কোন বিষাক্ত দ্রব্য পান করিয়াছেন। সেই অবস্থা দেখিয়া বাসার সকলেই অতিশয় শঙ্কিত হন, তাঁহাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া কেবল এইমাত্র অবগত হন যে, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহার মন নিতান্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য তিনি আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে অহিফেন সেবন করিয়াছেন। এই বাসায় কেম্বেল হাসপাতালের একজন ছাত্র বাস করেন, হাসপাতালের ডিউটী উপলক্ষে তিনি সেই সময় হাসপাতালে গমন করিতেছিলেন। হরিশের অবস্থা দেখিয়া, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, অপর দুই ব্যক্তির সাহায্যে একখানি গাড়ী করিয়া তখনই তাঁহাকে কেম্বেল হাসপাতালে লইয়া যান। অপর যে দুই ব্যক্তি তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইমাত্র হাসপাতাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ জানিতে পারিলাম যে, হরিশের অবস্থা ভাল নহে, বাঁচিবার আশা নিতান্তই অল্প; তবে যেরূপ যত্নের সহিত তাঁহার সেই স্থানে চিকিৎসা হইতেছে, তাহাতে কি হয় বলা যায় না।

যে বাসায় হরিশ বাস করিতেন, সেই স্থান হইতে আমরা ঐ সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। আমরা যে কি নিমিত্ত হরিশের অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা ঐ বাসার কাহাকেও না বলিলেও ক্রমে বাসার সকলেই জানিতে পারিলেন।

ঐ স্থান হইতে ঐ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, দ্রুতগতি আমরা কেম্বেল হাসপাতালে গমন করিলাম। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাসা হইতে আমরা যে সকল কথা অবগত হইয়াছিলাম,

তাহার একটীও মিথ্যা নহে। হরিশ বাস্তবিকই অহিফেন খাইয়াছেন। হাসপাতালের ৪।৫ জন ডাক্তার ও ছাত্র তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইলেও তিনি এখনও একবারে অজ্ঞান হন নাই। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আস্তে আস্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতেও সক্ষম। তাঁহার চিকিৎসাকারী ডাক্তারের অনুমতি লইয়া তাঁহারই সমক্ষে আমি তাঁহাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমাকে তাহার নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। পাঠক পাঠিকাগণের সুবিধার নিমিত্ত আমি প্রশ্ন ও উত্তরগুলি যথাযথ-রূপে নিম্নে প্রদান করিলাম।

আমি। তোমার নাম কি ?

হ। হরিশচন্দ্র দত্ত।

আ। তোমার বাসস্থান ?

হ। —জেলার অন্তর্গত ;—গ্রামে।

আ। তুমি কলিকাতার মেসে বাস কর ?

হ। হাঁ।

আ। তুমি আফিং খাইয়াছ ?

হ। হাঁ, খাইয়াছি।

আ। কেন ?

হ। আমার মনের কোন বিশেষ কষ্টের নিমিত্ত।

আ। তোমার মনে এমন কি কষ্ট হইয়াছিল, যাহাতে তুমি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ ?

হ। যখন আমাকে মরিতে হইবে, তখন পরের হাতে না মরিয়া আত্মহত্যা করাই ভাল বলিয়া আমি আফিং খাইয়াছি।

আ। তুমি এমন কি করিয়াছ যে, তোমাকে মরিতে হইবে?

হ। যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা ত আপনারা জানিতে পারিয়াছেন, জানিতে না পারিলে আপনারা এখানে আসিবেন কেন?

আ। আমরা ত জানিতে পারিয়াছি, তথাপি তোমার মুখে একবার শুনিতে চাই?

হ। কি শুনিতে চাহেন বলুন?

আ। বিরাজমোহিনীকে তো তুমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতে?

হ। বাসিতাম, রাক্ষসীর মায়ায় ভুলিয়াছিলাম।

আ। যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছ, তাহার উপর অত্যাচার কেন?

হ। বিশ্বাসঘাতিনীর উপর যদি অত্যাচার না করিব, তবে আর কাহার উপর করিব? সে আমার যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা আপনারা জানেন না; যদি আমার সমস্ত অবস্থা আপনারা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কথনই ঐরূপ কথা বলিতেন না।

আ। বিশ্বাসঘাতিনীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিয়াছ সত্য, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই, তাহা জান কি?

হ। কেন মহাশয়, সে কি তবে মরে নাই, আমার চেষ্টা কি ব্যর্থ হইয়াছে?

আ। সে এখনও জীবিতা আছে, বোধ হয় বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। সে বলিয়াছে, সে ভাল হইলে তোমার নিকটেই গমন করিবে।

হ। ওরূপ বিশ্বাসঘাতিনীকে হৃদয়ে আর কথনই স্থান দিব না,

আমার নিকট পুনরায় আগমন করিলে পদাঘাতে তাহাকে দূর করিয়া দিব। উঃ! সে কি অবিশ্বাসিনী।

আ। তাহা হইলে তাহার মৃত্যুতেই তুমি সন্তুষ্ট ?

হ। নিশ্চয়ই, তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিবার নিমিত্তই আমি ঐরূপভাবে তাহাকে আঘাত করিয়াছি।

আ। তাহার নিমিত্ত আর তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, সে ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হ। মরিয়া গিয়াছে ?

আ। হাঁ।

হ। জগতের একটী মহাপাপী কমিয়াছে, এখন আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল।

আ। তাহা হইলে তুমি আত্মহত্যা করিবার নিমিত্তই কি আফিং খাইয়াছ ?

হ। হাঁ।

আ। তুমি বিরাজমোহিনীকে কি অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলে ?

হ। ভোজালির দ্বারা।

আ। ভোজালিখানি কোথায় ?

হ। ফেলিয়া দিয়াছি।

আ। কোথায় ফেলিয়া দিয়াছ ?

হ। যে বাসায় আমি এখন বাস করি, সেই বাড়ীর প্রাঙ্গনের একপার্শ্বে একঝাড় কলাগাছ আছে, সেই কলাগাছের পার্শ্বে একটী ছাইর গাদা, সেই ছাই গাদার ভিতর আমি ভোজালিখানি নিক্ষেপ করিয়াছি।

আ। উহা কি এখন সেই স্থানে আছে?

হ। তাহা আমি জানি না, কেহ উঠাইয়া লইয়া না থাকিলে নিশ্চয়ই আছে।

আ। ঐ ভোজালিখানি তুমি কোথায় পাইলে?

হ। যে সময় আমি বিরাজমোহিনীর অনুসন্ধানার্থ তাহার পিতার বাড়ী হইতে বহির্গত হই, সেই সময় উহা বহির্ব্বাটীতে পড়িয়া আছে দেখিয়া আমি কুড়াইয়া লইয়া আসি।

আ। তবে ঐ ভোজালিখানি বিরাজমোহিনীর পিতার?

হ। হাঁ।

আ। তুমি আফিং খাইলে কেন?

হ। নিজের জীবন নষ্ট করিতে।

আ। নিজের জীবন নষ্ট করিতে তোমার ইচ্ছা হইল কেন?

হ। ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝুলিয়া, পরের হস্তে না মরিয়া, নিজহস্তে মরাই ভাল, তাই আফিং খাইয়াছি।

আ। তুমি কতদিন হইতে সংকল্প করিয়াছিলে যে, বিরাজ-মোহিনীকে হত্যা করতঃ নিজে আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিবে?

হ। বোধ হয় তিন চারিদিবস হইতে। যখন দেখিলাম, বিরাজমোহিনী আমার নিকট আসিল না বা আমার এতগুলি পত্রের একখানিরও জবাব দিল না, তখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এখন আর সে আমার নয়। সেই সময়ই ভাবিলাম, তাহাকে হত্যা করিয়া শেষে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিব।

আ। যদি ৩।৪ দিবস হইতে তোমার মনে এই সংকল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে এত দিবস পর্য্যন্ত ঐ ভোজালি বহন করিয়া বেড়াইতেছিলে কেন?

হ। যে সময় আমি ঐ ভোজালি উহার পিতার বাড়ী হইতে লইয়া আসি, সেই সময় এ ভোজালির দ্বারা যে বিরাজমোহিনীকে হত্যা করিব, এ অভিপ্রায় আমার ছিল না; আত্মরক্ষার্থে উহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম।

আ। আফিং কতদিন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলে?

হ। কল্য উহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

আ। কোথা হইতে উহা সংগ্রহ করিলে?

হ। বাসার একটু দূরে একটী দোকান আছে, ঐ দোকান হইতে আফিং কিনিয়া রাখিয়াছিলাম।

আ। কতখানি আফিং কিনিয়া রাখিয়াছিলে?

হ। এক ভরি।

আ। কোথায় রাখিয়াছিলে?

হ। আমার ঘরে একটী টিনের বাক্সের মধ্যে?

আ। কখন উহা খাইলে?

হ। বিরাজমোহিনীকে হত্যা করিয়াই আমি আমার বাসায় আসি ও উহা খাইয়া ফেলি।

আ। কতখানি খাইয়াছিলে?

হ। সমস্তই।

হরিশচন্দ্রকে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে তাহাকে কহিলাম, কিরূপে বিরাজমোহিনীর পিত্রালয়ে তোমার স্থান হয়, কিরূপে বিরাজমোহিনীর সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হও, কিরূপে বিরাজমোহিনী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত পিত্রালয় হইতে চলিয়া আসে, কিরূপে তুমি তাহার অনুগমন করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আগমন কর, ও কিরূপেই বা তাহার

নিকট পত্রাদি প্রেরণ কর, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করিয়া বল? হরিশ্চন্দ্র সমস্তই বলিলেন, আমিও তাহা লিখিয়া লইলাম।

যে ডাক্তারবাবু তাহার চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, একভরি আফিংএর অধিকাংশ তাহার পেট হইতে উঠাইয়া ফেলিতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এখন হরিশ্চন্দ্র বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন, তবে অহিফেনসেবনকারীদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। হঠাৎ তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

ডাক্তারবাবুর নিকট এই অবস্থা অবগত হইয়া হরিশ্চন্দ্রের উপর উপযুক্তরূপ পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। বুঝিলাম, এই মকর্দ্দমার একরূপ কিনারা হইল।

হাসপাতাল হইতে বহির্গত হইয়া যে বাসায় হরিশ্চন্দ্র বাস করিতেন, সেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি যে কলাঝাড়ের পার্শ্বে ছাইগাদার কথা বলিয়াছিলেন, সেই ছাইগাদার ভিতর অনুসন্ধান করায় তাঁহার কথিত মত সেই ভোজালিখানি প্রাপ্ত হইলাম।

যে দোকান হইতে হরিশ্চন্দ্র আফিং খরিদ করিয়াছিলেন, সেই দোকান অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, হরিশ্চন্দ্র যেরূপ আকৃতির লোক, সেইরূপ আকৃতির একব্যক্তি প্রকৃতই তাহার দোকান হইতে আফিং খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ দোকানদারের নিকট হইতে আরও জানিতে পারিলাম যে, সেই ব্যক্তিকে দেখিলে ঐ দোকানদার অনায়াসেই চিনিতে পারিবে।

অনুসন্ধানে এই দুইটী বিষয় অবগত হইতে পারিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, বিরাজমোহিনীকে হত্যা করা সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রকৃত ও তাহার একটী কথাও মিথ্যা নহে।

মনে করিয়াছিলাম, বিরাজমোহিনীকে হত্যা করিয়া, আপন জীবন নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে হরিশ্চন্দ্র যখন আফিং খাইয়াছে, তখন হয় তো তাহার জীবন শেষ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না; দুই একদিনের মধ্যে চিকিৎসার গুণে হরিশ্চন্দ্র ভাল হইয়া উঠিল। অহিফেন সেবনে যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমাদিগের অনুসন্ধানও সেই সঙ্গে শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা হইল না। হরিশ্চন্দ্রের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্টে ঈশ্বর যে ভোগ লিখিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হইল না, বরং সেই ভোগ প্রচুর মাত্রায় আমাদিগকে ভুগিতে হইল।

হরিশ্চন্দ্র হাসপাতাল হইতে বহির্গত হইয়া আসিবার পর যে পর্য্যন্ত তাহার বিচার শেষ না হইল, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে হাজত-গৃহে বাস করিতে হইল। হরিশ্চন্দ্র যে সকল কথা আমাদিগকে বলিয়াছিল, ও যাহা আমরা সেই সময় লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক অনুসন্ধানও আমাদিগকে করিতে হইল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই সত্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিশ্চন্দ্র দত্ত আমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছিল ও সেই সময় আমরা যাহা লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ।

—জেলার অন্তর্গত—গ্রামে আমার বাড়ী, সেই স্থানে আমার বৃদ্ধ পিতা ও মাতা এখনও বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, সামান্য কয়েক বিঘা জমীর উপসত্ব হইতে কোনরূপ কায়ক্লেশে তাঁহারা জীবনধারণ করিয়া থাকেন। সাংসারিক অবস্থা মন্দ হইলেও যখন আমার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর, সেই সময় আমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। আমার শ্বশুরের সাংসারিক অবস্থাও আমাদিগের ন্যায়, সুতরাং বিবাহের পর হইতেই আমার স্ত্রী আমাদিগের বাড়ীতে আমার পিতামাতার সহিতই বাস করিতেছেন।

আমাদিগের গ্রামে একটী পাঠশালা আছে, বাল্যকাল হইতে আমি ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করি। লেখা পড়ার দিকে আমার বিশেষ যত্ন দেখিয়া, ও আমার পিতামাতার হীন অবস্থা জানিতে পারিয়া, গুরুমহাশয় বিনা বেতনেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন, আমিও সেই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া, ঐ পাঠশালায় যতদূর সম্ভব লেখাপড়া শিক্ষা করি। পাঠশালার শিক্ষা অপেক্ষা আমার আরও অধিক শিক্ষা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমাদিগের অবস্থায় সংকুলান না হওয়ায় আমাকে সে আশা পরিত্যাগ করিতে হয় ও আমি কোন একটী বিষয়কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে থাকি।

যে জেলায় আমার বাসস্থান, সেই জেলার অন্তর্গত অথচ আমাদিগের গ্রাম হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ ব্যবধানে একখানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ গ্রামে একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল স্থাপিত করেন ও অনেক দিবস হইতে উহা সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে থাকেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে ভয়ানক দলাদলি উপস্থিত হওয়ায়, গ্রামস্থ সমস্ত ভদ্রলোক দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। ফলে ঐ গ্রামের মধ্যে ঐরূপ আর একটী স্কুল স্থাপিত হয়, ও এক স্কুলের সমস্ত ছাত্র ক্রমে দুই স্কুলে বিভক্ত হইয়া যায়। সুতরাং উভয় স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা কম হইয়া পড়ায়, উহাদের বিশেষরূপ ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। ছাত্র-সংখ্যা কম হইয়া যখন উভয় স্কুলই উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল, সেই সময় নূতন স্থাপিত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ এক বন্দোবস্ত করেন যে, অপরাপর স্থান হইতে যে সকল ছাত্র এই স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিবে, তাহাদিগের থাকিবার স্থান, খোরাক ও বেতনের ভাবনা তাহাদিগকে ভাবিতে হইবে না, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমি ঐ গ্রামে গিয়া উপস্থিত হই। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে ভর্ত্তি করিয়া লন। একজন ভদ্রলোক মাসে মাসে আমার স্কুলের বেতন প্রদান করিতে থাকেন, আর বিরাজ মোহিনীর পিতা তাঁহার বাড়ীতে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন ও তাঁহার সংসারেই আমার আহারাদি চলিতে থাকে। আমার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা নহে, অপর স্থানের যে সকল ছাত্র আসিয়া ঐ স্কুলে ভর্ত্তি

হয়, তাহাদিগেরও বেতন ও আহারের বন্দোবস্ত ঐরূপ ভাবেই করা হয়। কেহ বেতনের ভার, কেহ বা আহারাদির ভার গ্রহণ করেন। একটী বালকের বেতন দিতে, বা একটি বালকের আহার দিতে কাহারও বিশেষরূপ কষ্ট হয় না, অথচ ঐ উপায় অবলম্বন করায়, ঐ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায় ও ক্রমে ঐ স্কুলের শোচনীয় অবস্থা ভাল অবস্থায় পরিণত হয়।

বিরাজমোহিনীর পিতার বাড়ী পাকা হইলেও উহাতে বাহিরের ঘর অধিক ছিল না, সুতরাং অন্দরের মধ্যস্থিত একটী ঘরে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ হয়। আমিও তাহাদের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়ি ও সেই স্থানে বাস করিতে থাকি। এইরূপে ক্রমাগত ঐ স্থানে ৬ বৎসরকাল বাস করি।

আমি যে সময় ঐ বাড়ীতে বাস করিতে যাই, তাহার পূর্ব্বেই বিরাজমোহিনী বিধবা হইয়াছিল। তাহার পিতার তিনিই প্রথম কন্যা, উহার দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। আমি ঐ স্থানে থাকিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত লেখাপড়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম, স্কুলের ভিতর আমি একজন ভাল ছেলে বলিয়া পরিগণিত হইলাম। আমিও বিরাজমোহিনীর পিতামাতাকে আপন পিতা মাতার ন্যায় বিশেষরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহারাও আমাকে তাঁহাদিগের পুত্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল; যে সময় স্কুলের অবকাশ হইত, সেই সময় বাড়ীতে গমন করিয়া পিতামাতার চরণ দর্শন করিতাম।

বিরাজমোহিনীর পিতার বাড়ীতে বাস করিবার সময় তাঁহার পুত্র দুইটীকে বাড়ীতে পড়াইবার ভার ক্রমে আমার উপর

ন্যস্ত হয়। আমি উহাদিগকে আমার সাধ্যমত শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হই। ক্রমে বালবিধবা বিরাজমোহিনীও আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দেয়। আমি সেই সঙ্গে উহাকেও পড়াইতে আরম্ভ করি। বালকদ্বয় অপেক্ষা বিরাজমোহিনীর বুদ্ধি অতিশয় প্রখরা ছিল, সে বালকদ্বয় অপেক্ষা দিন দিন লেখাপড়ার অনেক উন্নতি করিতে লাগিল। আমারও ক্রমে তাহার উপর অধিক পরিমাণে ভালবাসা ও যত্ন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে ভালবাসা ও যত্ন তখন অন্য প্রকারের ছিল। কনিষ্ঠ ভাই-ভগ্নীর উপর যেরূপ ভালবাসা, শিষ্যের উপর গুরুর যেরূপ ভালবাসা, তাহাদের উপর আমার সেইরূপ ভালবাসা। কিন্তু সেই ভালবাসা অধিক দিন রহিল না। দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিরাজমোহিনীর যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভালবাসা রূপান্তর ধারণ করিল।

পূর্ব্বে যাহাকে কেবল শিক্ষার সময় দেখিলেই একরূপ সন্তুষ্ট হইতাম, এখন তাহাকে সদাসর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে ক্ষণকালের জন্যও নয়নের অন্তরাল হইলে মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিত। পূর্ব্বে নিজের পাঠাভ্যাস করিবার কালীন অপরের কথা মনে আসিত না, কিন্তু এখন নিজের পাঠে কোনরূপেই মন সংযোগ করিতে পারিতাম না। পুস্তকের ভিতর বলুন বা অন্তরের ভিতর বলুন, সর্ব্বদাই সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাইতাম। চক্ষুর সম্মুখে সেই মূর্ত্তি যেন সদা সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। পূর্ব্বে যাহাকে কেবল মাত্র একঘণ্টা পড়াইয়াই সন্তুষ্ট হইতাম, এখন দিবসের অধিকাংশ সময় তাহাকে পড়াইয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতাম না। কিন্তু কি যে

পড়াইতাম, তাহা নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তাহাকেও দেখিতাম, সেও যেন সদাসর্ব্বদা অন্যমনস্ক, সদাসর্ব্বদা তাহার হৃদয়ও যেন ভীষণ চিন্তায় পূর্ণ। পূর্ব্বে অর্দ্ধঘণ্টা অধ্যয়ন করিয়া সে যাহা শিখিতে পারিত, এখন সমস্ত দিন পুস্তক হস্তে বসিয়া থাকিয়াও সে কিছুমাত্র শিক্ষা করিতে পারিত না। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় অসঙ্কুচিতচিত্তে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, এখন আর সে, সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না, বোধ হইত, বিষম লজ্জা আসিয়া তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে প্রতিবন্ধক হইত। পূর্ব্বে সে যেরূপভাবে আমার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত বা আমি তাহার উপর যেরূপ অসঙ্কুচিতচিত্তে দৃষ্টিপাত করিতাম, এখন কিন্তু আর সেরূপ ভাবে উভয়ে উভয়ের নয়নের উপর নয়নপাত করিতে পারিতাম না।

এইরূপ কিছুদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতে আমাদিগের উভয়ের কপালেই আগুন লাগিল। বিরাজমোহিনী তাহার অমূল্য রত্ন হেলায় হারাইল। আমিও বৃদ্ধ পিতামাতার আশাপথ রুদ্ধ করিয়া, যুবতী স্ত্রীকে চিরদিবসের জন্য চক্ষের জলে ভাসাইয়া পাপের প্রবল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম।

ক্রমে কয়েক বৎসর কাটিল, পাপের কথা কখন গোপন থাকে না, ক্রমে এক কান দুইকান করিয়া এই ভয়ানক পাপের কথা সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, এই পাপময় বার্ত্তা রাষ্ট হইয়া পড়িল। বিরাজ মোহিনীর পিতামাতাও ক্রমে উহা জানিতে পারিলেন; প্রথম প্রথম বিরাজমোহিনীকে শাসন করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই শাসন কোনরূপ ফলদায়ক হইল না, পরিশেষে আমাকে সেই বাড়ী

হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু বিরাজমোহিনীর নিমিত্ত তাহাও করিতে পারিলেন না। কারণ বিরাজমোহিনী তাহার মাতাকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি আমি ঐ বাড়ী হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে হয় সে বাড়ী ছাড়িয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইবে, না হয় আফিং সেবন বা যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সে আত্মহত্যা করিবে।

বিরাজমোহিনীর মাতা বিরাজমোহিনীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তিনি কন্যার ভয় প্রদর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার স্বামীর সহিত কি পরামর্শ করিলেন; তখন হইতে আমাকে আর কিছু বলিতেন না। আমি পূর্ব্বের ন্যায় ঐ স্থানেই বাস করিয়া পাপের স্রোত যতদূর সম্ভব প্রবাহিত করিতে লাগিলাম। এইরকমে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি আমার মাতাপিতার বা স্ত্রীর আর কোনরূপ সংবাদই লইলাম না।

আমি জানিতাম, যদি জগতে আমার সুখ থাকে, তাহা হইলে ঐ বিরাজমেহিনী। সুতরাং আমি বিরাজমোহিনীকে আমার প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিতাম, তাহার বাক্য আমি গুরুবাক্য সম গ্রহণ করিতাম, ও মনে জানিতাম, তাহার উপর আমার মনের যেরূপ ভাব, তাহার মনের ভাবও আমার উপর সেইরূপ, আমি তাহাকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকি, সেও আমাকে সেইরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমি একদিবসের নিমিত্তও বুঝিতে পারি নাই যে, তাহার হৃদয় হলাহলে পূর্ণ; যদি আমি তাহার কিছুমাত্র আভাষ ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে আজ এ দশা

ঘটিত না, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ও যুবতী ভার্য্যা আমা কর্তৃক আজ চিরজীবনের নিমিত্ত অতল দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইত না।

একদিবস অতি প্রত্যুষে জানিতে পারিলাম যে, বিরাজমোহিনী তাহার পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহার অনুসন্ধান করিয়া কোন স্থানেই তাহাকে প্রাপ্ত হন নাই, ও কোনরূপ সন্ধানও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সংবাদ পাইবামাত্র আমার হৃদয় যে কিরূপ হইল, তাহা আপনারা অনুভব করিতে পারিবেন না। আমি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলাম, কিছুক্ষণের জন্য ভাল মন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরিশেষে আমিও বিরাজমোহিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

যে সময় বিরাজমোহিনী হঠাৎ তাহার পিত্রালয় পরিত্যাগ করে, সেই সময় ঐ গ্রাম একরূপ জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, বিরাজমোহিনীর পিতার বাড়ীর চতুর্দ্দিক জলে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল, বিনা নৌকায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিবার কোনরূপ উপায় ছিল না। সুতরাং বিরাজমোহিনীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইবার সময় আমাকেও একখানি নৌকা ভাড়া করিতে হইল। আমি ইহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বিরাজমোহিনী যে স্থানে গমন করুক না কেন, তাহাকেও নৌকা করিয়া যাইতে হইয়াছে। সুতরাং যদি কোনরূপে ঐ নৌকার অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে বিরাজমোহিনীকে নিশ্চয়ই ধরিতে সমর্থ হইব। আমি আরও বুঝিতে পারিলাম, বিরাজমোহিনী কখনই ঐরূপ অবস্থায় একা বাটী পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয় নাই, নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি তাহার সঙ্গে আছে।

মনে মনে এই সকল ভাবিয়া একখানি নৌকা করিয়া আমিও বাহির হইলাম। আসিবার সময় ঐ ভুজালিখানি বহির্ব্বাটীতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি উহা সঙ্গে লই। উহা দ্বারা যে বিরাজমোহিনীকে হত্যা করিব, ইহা কিন্তু সে সময় একবারও ভাবি নাই ; আত্মরক্ষার্থই উহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম।

অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, বিরাজমোহিনীর বাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে একখানি নৌকা সন্ধ্যা হইতে বাঁধা ছিল, উহার ভিতর চারি পাঁচজন যুবককেও কেহ কেহ দেখিয়াছে। আরও জানিতে পারিলাম, রাত্রিযোগে ঐ নৌকা সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

ঐ নৌকা যেদিকে গিয়াছিল, আমিও মাঝিদিগকে সেইদিকে আপন নৌকা চালনা করিতে কহিলাম, কিন্তু বিরাজমোহিনীর সহিত সেই নৌকা ধরিতে পারিলাম না। যখন উহা ধরিতে পারিলাম, তখন উহা আরোহীশূন্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে। উহার মাঝির নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, চারি পাঁচজন যুবক একটী যুবতীকে লইয়া একটী মন্দিরের সম্মুখে অবতরণ করে। আমি তাহাদিগকে সেই স্থান দেখাইয়া দিতে কহিলে, তাহারা সেই স্থান ও যে বাড়ীতে যুবতী প্রবেশ করে, তাহা দেখাইয়া দেয়।

আমি জানিতে পারি যে, উহা একটী ব্রাহ্মসমাজ। আমি উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিয়া বিরাজমোহিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ও একদিবস তাহাকে দেখিতে পাই ; কিন্তু সে আমাকে দেখিয়া তাহার মস্তক নত করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। সেই দিবস হইতে বুঝিতে পারি যে, বিরাজমোহিনী আর সে বিরাজমোহিনী নহে, তাহার হৃদয় এখন অন্যভাবে পূর্ণ।

ইহার দু-একদিবস পরেই আমি জানিতে পারিলাম যে, বিরাজমোহিনী কলিকাতায় গমন করিয়াছে। আমিও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর সে যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা বাহির করিলাম। আমিও সেই বাটীর সন্নিকটস্থ এক মেসে বাসা লইলাম। আমার বাসা-বাটীর ছাদ হইতে বিরাজমোহিনীকে প্রত্যহ তাহাদের বাটীর ছাদে বেড়াইতে দেখি। ঐ ছাদের উপর আমি ক্রমাগত দশ বার-খানি পত্র নিক্ষেপ করি; সে যে তাহার একখানি না একখানি পাইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন দেখিলাম, সে আমার একখানি পত্রেরও উত্তর দিল না, বা আমার উপদেশমত কার্য্য করিল না, তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সে এখন আর আমার নহে—অপরের হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে হত্যা করাই স্থির করিলাম। আরও স্থির করিলাম, তাহার অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের অস্তিত্বও লোপ করিব, এই ভাবিয়া উহাকে হত্যা করিলাম ও নিজের হত্যা-বাণ নিজ হস্তে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এখনও বুঝিতে পারিতেছি না, উহাতে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

হরিশ্চন্দ্র ক্রমে ভাল হইয়া উঠিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইল;—তাঁহার দেশে পর্য্যন্ত আমাকে গমন করিতে হইয়াছিল। সেই স্থানে গমন করিয়া জানিতে পারিলাম, হরিশ্চন্দ্র যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে। এখন তিনি খুনী মোকর্দ্দমার আসামী। নিম্ন আদালত হইতে উচ্চ আদালত পর্য্যন্ত তিনি একবাক্যে আপন দোষ স্বীকার করিলেন। তথাপি তাঁহার

বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতে হইল। এমন কি এখানে আসিয়া বিরাজমোহিনীর পিতাকে পর্য্যন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইল।

বিচারে হরিশ্চন্দ্র চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 183. দারোগার দপ্তর, ১৮৩ সংখ্যা।

হত ভৃত্য।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।]   সন ১৩১৫ সাল।   [আষাঢ়।

হৃত ভৃত্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একে শীতকাল, তাহার উপর সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কন্‌কনে শীত। কাহার সাধ্য এ দুর্য্যোগে ঘরের বাহির হয়। পথ কর্দ্দমাক্ত—কিন্তু তাহা হইলেও পথে লোকের অভাব ছিল না।

রাত্রি প্রায় দুইটা। সর্ব্বাঙ্গ গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছি। কিন্তু এ অদৃষ্টে সে সুখ থাকিবে কেন? সহসা কে আমার দেহে ধাক্কা দিল, আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দেখিলাম, সম্মুখেই আমার স্ত্রী দণ্ডায়মান। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দুইটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকি।

অসময়ে অকস্মাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ করায়, আমি গৃহিণীর উপর বিরক্ত হইলাম। মুখের ভাব দেখিয়াই, বোধ হয়, গৃহিণী আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "রামদীন এই মাত্র আমায় বলিয়া গেল, সাহেবের আরদালি বাহিরে তোমার অপেক্ষা করিতেছে। আমার অপরাধ নাই—আমার উপর বিরক্ত হইলে কি করিব?"

সাহেবের আরদালি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে শুনিয়া, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে শয্যাত্যাগ করিলাম এবং তখনই বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিলাম। সে বলিল, "শিয়ালদহের ত্রৈলোক্য চৌধুরীর বাড়ীতে একজন চাকর খুন হইয়াছে. আপনাকে এখনই তাহার অনুসন্ধানে যাইতে হইবে। সাহেব গিয়াছেন। এই বলিয়া সে আমার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি স্বয়ং সাহেবের লেখা; আরদালি আমায় যে কথা বলিল, পত্রেও ঠিক সেই কথা লেখা ছিল।

আরদালি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। আমি একজন কনষ্টেবলকে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতে বলিলাম।

গাড়ী আনীত হইল, আমি ত্রৈলোক্য বাবুর বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। লক্ষপতি ত্রৈলোক্য চৌধুরী একজন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোক। শুনিয়াছি, তাঁহাদের আদি নিবাস কলিকাতায় নহে। ত্রৈলোক্যনাথের পিতামহ কলিকাতায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার পিতার জন্ম কলিকাতায়, তিনি জন্মাবধি কলিকাতাতেই বাস করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথও কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার অগাধ সম্পত্তি। প্রকাণ্ড বাড়ী, নাম যশ যথেষ্ট। এ হেন লক্ষপতির বাড়ীতে খুন! কি ভয়ানক!

ত্রৈলোক্যনাথের বাড়ী আমাদের সকলেরই পরিচিত। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড মাঠ; প্রতিদিন বৈকালে সেখানে ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট প্রভৃতি সময়োচিত খেলা হইয়া থাকে। বাড়ীখানি প্রকাণ্ড ও দ্বিতল—চারিদিকে অনুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত,

বাড়ীর ফটক প্রায়ই খোলা থাকে। ফটক পার হইয়া আমরা বাড়ীর বাহিরের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ইতি-পূর্ব্বেই সেখানে কয়েকজন কর্ম্মচারী ও সাহেব উপস্থিত হইয়াছেন।

উঠান্ পার হইয়া বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র স্থানীয় থানার দারোগা বাবু, বাড়ীর কর্ত্তা ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার একমাত্র পুত্র রজনীকান্ত আমাদের নিকট আসিলেন।

অন্যান্য দুই একটি কথাবার্ত্তার পর, দারোগা বাবু আমাকে কার্য্যস্থানে লইয়া গেলেন। যেখানে ভৃত্যটীর মৃতদেহ পড়িয়াছিল, আমি সেইখানে গেলাম। দেখিলাম, একজন বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ যুবক চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার বক্ষঃস্থল দিয়া রক্তস্রোত নির্গত হইতেছে, যে স্থানে সে পড়িয়াছিল, তাহা রক্তে রক্তাক্ত হইয়াছে। আমি নিকটে গিয়া ভৃত্যের দেহ পরীক্ষা করিলাম, দেখিলাম, তাহার বক্ষে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র। সম্ভবতঃ, বন্দুকের গুলি তাহার বক্ষ ও হৃদয় ভেদ করিয়াছিল এবং তদ্দণ্ডেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার পুত্র আমার নিকটেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে আমার কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় নাই। দারোগা বাবু ইতিপূর্ব্বেই সেই লোমহর্ষণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারই নিকট হইতে আবশ্যকীয় সংবাদ গ্রহণ করিলাম।

ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার পুত্র রজনীকান্ত আমাকে বারম্বার সেই খুনের বিষয় বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়া, বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন। আমি তখন দারোগা বাবুকে বলিলাম, "মহাশয়, আমার শরীর বড় ভাল নয়, তিন চারি

দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি। আপনি এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের কতদূর কি করিয়াছেন বলুন?"

দারোগা বাবু অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "এখনও কিছুই করিতে পারি নাই। কিন্তু যখন আপনি আসিয়াছেন, তখন শীঘ্রই এ রহস্য ভেদ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

দারোগার কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছেন?"

দা। আপনার আসিবার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে।

আ। কোন সূত্র পাইয়াছেন?

দা। শুনিয়াছি, হত্যাকারীকে না কি দেখা গিয়াছে।

দারোগার কথায় আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, "সত্য না কি? হত্যাকারী দেখা দিয়া কোথায় গেল? কে তাহাকে দেখিয়াছে?"

দা। সে চাকরকে গুলি করিয়া কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। স্বয়ং ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার পুত্র উভয়েই হত্যাকারীকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন।

আ। কত রাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়?

দা। দুপুর বাজিতে এক কোয়ার্টার পূর্ব্বে।

আ। সেই রাত্রে ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার পুত্র জাগিয়াছিলেন কেন?

দা। ত্রৈলোক্য বাবু প্রতিদিনই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত হিসাবপত্র করিয়া থাকেন। রাত্রি দুপুরের পূর্ব্বে তিনি একদিনও বিশ্রাম করেন না।

আ। কি রকমে তিনি হত্যাকারীকে দেখিতে পান?

দা। কায কর্ম্ম শেষ করিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে যাইতে-ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা বন্দুকের শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। সেই শব্দ শুনিয়া তিনি যেমন জানালার নিকট গেলেন, অমনই একজন লোককে তীরের মত ছুটিয়া যাইতে দেখিতে পান।

আ। চাকরের নাম কি? এ বাড়ীতে সে কতদিন চাকরি করিতেছে?

দা। ভৃত্যের নাম দুর্গাচরণ,—বাল্যকাল হইতে এখানে চাকরি করিতেছে বলিয়া, সে বাবুদের বড় বিশ্বাসী।

আ। ত্রৈলোক্য বাবুর পুত্র কি দেখিয়াছিলেন? তিনিই বা কেন তত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছিলেন?

দা। শুনিলাম, তিনি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ দুইজনের কথাবার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হয়। তিনি তখনই ঘরের জানালার নিকট গেলেন, দেখিলেন, দুর্গাচরণ আর একজন অপরিচিত লোকের সহিত বচসা করিতেছে। দুর্গাচরণ পুরাতন ভৃত্য—রজনীকান্ত জানালা হইতে ঐ ব্যাপার অবলোকন করিয়া, তখনই নীচেয় আসিলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই একটী বন্দুকের শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি দ্রুতগতি সেই ভৃত্যের নিকট আগমন করিলেন। দেখিলেন, দুর্গাচরণ চিৎ হইয়া নিশ্চল নিস্পন্দবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থল হইতে অনর্গল রুধির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

আ। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভৃত্য কোন কথা বলিয়াছিল?

দা। কই, সে কথা ত শুনি নাই।

আ। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ভৃত্য বাহিরে ছিল কেন? বাড়ীর সদর দরজাই বা খুলিল কে?

দা। আগেই বলিয়াছি, দুর্গাচরণ বড় বিশ্বাসী ভৃত্য। ত্রৈলোক্য বাবু, তাঁহার পুত্র ও বাড়ীর আর আর সকলেই তাহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। রাত্রে বাড়ীর সমস্ত দরজা ও জানালাগুলি বন্ধ করিবার ভার তাহারই উপর ছিল। সেদিন দরজা বন্ধ করিয়াছিল কি না সন্দেহ হওয়ায়, সে যেমন সেই দরজার নিকট আইসে, অমনি কোন লোক তাহাকে আক্রমণ করে।

আ। ভৃত্যের নিকট কি এমন কোন জিনিষ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে এই হত্যাকাণ্ডের সন্ধান করিতে পারা যায়?

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে দারোগা বাবু পকেটে হাত দিলেন এবং একখণ্ড ময়লা ছেঁড়া কাগজ বাহির করিয়া, বলিলেন, "এই কাগজখানি দুর্গাচরণের হাতে পাওয়া গিয়াছে। দেখিয়া বোধ হয়, উহা একখানি পত্রের অংশ মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতে যে সময়ের কথা লেখা আছে, ঠিক সেই সময়েই সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে।"

দারোগা বাবুর হাত হইতে সেই কাগজ আমি গ্রহণ করিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা পরীক্ষা করিলাম। পরে দারোগা বাবুকে বলিলাম, "আমার বোধ হয়, ভৃত্য যখন এই পত্রখানি পাঠ করিতেছিল, তখন কোন লোক বলপূর্ব্বক অবশিষ্ট অংশটুকু ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে। সময়ের মিল দেখিয়া, বোধ হয়, যেন পূর্ব্বেই এই বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

দা। আমিও সেইরূপ বিবেচনা করি।

আ। ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার বাড়ীর লোকে ভৃত্যকে যতদূর বিশ্বাসী বলিয়া মনে করেন, সে বাস্তবিক তত বিশ্বাসী নহে। আমার বিশ্বাস, ঐ দুর্গাচরণই দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। তাহারা হত্যা

করিতে আইসে নাই, ত্রৈলোক্য বাবুর বাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়াছিল। শেষে কোন কারণ বশতঃ উভয়ের কলহ হইয়াছিল। সেই কলহের ফল ভৃত্যের মৃত্যু।

দারোগা বাবু আমার কথায় সায় দিলেন। বলিলেন, "আমারও বিশ্বাস সেইরূপ। দুর্গাচরণ যে দস্যুদলের পরিচিত এবং সেই যে তাহাদিগকে দরজা খুলিয়া দিয়াছিল, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদিকে সম্প্রতি আর কখন চুরি হইয়াছিল ?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া দারোগা বাবু গম্ভীর হইলেন। পরে বলিলেন, "প্রায় একমাস পূর্ব্বে সরোজ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে।"

আ। চোর ধরা পড়িয়াছে ?

দা। না।

আ। কত টাকা চুরি গিয়াছিল ?

দা। সে বড় আশ্চর্য্য চুরি—একটীও নগদ পয়সা চুরি যায় নাই। যে সকল দ্রব্য চুরি গিয়াছে, তাহা শুনিলে আপনি বিস্ময়ান্বিত হইবেন।

আ। সে কি ?

দা। একটা কাচের নল, খানিকটা সুতা, একখানা পুরাতন পঞ্জিকা আর একটা বাতিদান।

আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "এ রকম অদ্ভুত চুরির কথা কখন শুনি নাই। তাহারা কি ঐ কয়েকটী দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য এই বাড়ীতে চুরি করিয়াছিল ?"

দারোগা বাবুও ঈষৎ হাসিলেন। পরে বলিলেন, "আমার ত সে রকম বোধ হয় না।"

আ। কেন?

দা। তাহারা সরোজ বাবুর বাড়ীর দুই তিনখানি ঘর তোলপাড় করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই সেই ঘরে যথেষ্ট মূল্যবান দ্রব্য থাকিতেও চোরেরা তাহার একটিও স্পর্শ করে নাই।

আ। আপনারা ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

দা। না।

আ। সরোজ বাবু কেমন লোক? তাঁহার সম্পত্তি কত?

দা। সরোজ বাবু অতি সজ্জন ও অমায়িক লোক। তাঁহারও যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। এরূপ শোনা যায় যে, তাঁহার সম্পত্তির আয় ত্রৈলক্যনাথের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। তবে সম্প্রতি ত্রৈলোক্য বাবুর সহিত এক মোকদ্দমায় উভয় পক্ষে অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি সেই ছিন্ন পত্রাংশখানি বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার অপর অংশ কোথায় বলিতে পারেন?"

দা। না।

আ। অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

দা। করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই।

আ। কোথায় খুঁজিয়াছিলেন?

দা। যেখানে দুর্গাচরণের মৃতদেহ পড়িয়াছিল; তাহার হাতে কাগজটুকু পাইবার পরই আমার বোধ হইল যে, নিশ্চয়ই উহার অবশিষ্ট অংশটুকু নিকটে কোথাও পড়িয়া থাকিবে। এই

মনে করিয়া আমি জনকয়েক কনেষ্টবলকে উহার অন্বেষণে নিযুক্ত করি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা বাহির করিতে পারিল না। তখন আমি স্বয়ং উহার যথেষ্ট অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু আমিও সফল হইতে পারি নাই।

আ। তাহাতে স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে যে, কোন লোক সেখানি লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমার বোধ হয়, হত্যাকারী স্বয়ং এ কাজ করিয়াছে। সেই ঐ অংশটুকু কোথায় সরাইয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার কথা শুনিয়া দারোগা বাবুর বিশ্বাস হইল। তিনি বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য হইতে পারে; কিন্তু সেখানি লুকাইবার বিশেষ প্রয়োজন কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি ঈষৎ হাসিলাম। বলিলাম, "সে যদি জানিত যে, পত্রখানির কিয়দংশ ভৃত্যের হস্তেই ছিন্ন ভিন্ন হইলে কখনও এ কাজ করিত না। পত্রখানির মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় লিখিত আছে। পাছে আর কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে সে উহা হস্তগত করিয়াই কোন গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে। আর এক কথা, ঐ কাগজ কোথা হইতে ভৃত্যের আসিল বলিতে পারেন?"

দা। আজ্ঞে হাঁ—সে সন্ধানও লইয়াছি। কাল দিনের বেলায় সে একখানি পত্র পায়। কাগজখানি নিশ্চয়ই সেই পত্রের অংশ।

আ। ভৃত্যকে কে পত্র পাঠাইয়াছে? দুর্গাচরণ কোথা হইতে পত্র পাইল?

দা। সে কথা বলিতে পারিলাম না।

আ। ডাকে আসিয়াছিল কি?

দা। এইরূপই শুনিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না।

আ। খামখানা কোথায়?

দা। সম্ভবতঃ ভৃত্যই সেখানি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

আ। পিয়নের সহিত দেখা করিয়াছিলেন?

দা। করিয়াছিলাম; কিন্তু সেও কিছু বলিতে পারিল না। সে বলিল, দুর্গাচরণের নামে একখানি পত্র আসিয়াছিল, তাহাই জানে। কোথা হইতে যে সে পত্রখানি আসিয়াছিল, তাহা সে জানেও না, আর জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা করে না।

দারোগা বাবুকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। একবার ত্রৈলোক্য বাবুর বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা হইল এবং সেই অভিপ্রায়ে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বাহিরে আর কিছু জানিবার নাই; কিন্তু আমাকে একবার ভিতরে যাইতে হইবে।"

আমার কথায় দারোগা বাবু সম্মত হইলেন এবং তখনই আমাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

আমরা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর যাইবা মাত্র রজনীকান্ত আমাদের সম্মুখীন হইলেন। যখন প্রথমে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।

এখন নিকটে আগমন করায় দেখিলাম, তাঁহার বয়স প্রায় বাইশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। কিন্তু চাল-চলন দেখিয়া আমি আন্তরিক বিরক্ত হইলাম। তাঁহার প্রতি কথায় অহঙ্কার প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার ন্যায় অহঙ্কারী যুবক আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে কি না সন্দেহ।

আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়, এখনও কি করিতেছেন? ভাবিয়াছিলাম, আপনি শীঘ্রই একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন, কিন্তু এখন আর সে আশা নাই।"

আমিও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "আমিও মানুষ—দেবতা নহি। কিছু সময় না দিলে এই ভয়ানক জটিল রহস্য ভেদ করা সম্ভব নহে।"

উচ্চহাস্য হাসিয়া রজনীকান্ত উত্তর করিলেন, "আরও সময়? রাত্রি পৌনে বারটার সময় এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়, এখন রাত্রি প্রায় চারিটা। সময় যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে। এখনও বোধ হয়, কোন সূত্রও পান নাই। কেমন?"

রজনীকান্তের কথায় আমার সর্ব্বশরীর যেন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মনের আগুন মনেই নির্ব্বাপিত করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "যেমন করিয়াই হউক, সূত্র পাই ভাল, না পাই ভাল, আপনার কার্য্যের প্রয়োজন। শীঘ্রই এ রহস্য ভেদ করিব। ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন?"

আমার কথায় বাধা দিয়া রজনীকান্ত বলিয়া উঠিলেন, "বলেন কি মহাশয়! ব্যস্ত হইব না? কোন্ অপরাধে আমাদের বহু-

কালের বিশ্বাসী চাকর খুন হইল? কে তাহাকে এমন করিয়া খুন করিল? যতক্ষণ না হত্যাকারী ধরা পড়িতেছে, যতক্ষণ না তাহার দেহ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতেছে, ততক্ষণ আমার প্রাণের ক্ষোভ মিটিবে না। বিশেষ যখন আপনারা দুই দুইজন নামজাদা লোকে এখনও কোন সূত্র বাহির করিতে পারিলেন না, তখন যে আপনাদের দ্বারা আমাদের বিশেষ কোন উপকার হইবে, এমন বোধ হয় না।"

দারোগা বাবু রাগান্বিত হইলেন। রজনীকান্তের কথা শুনিয়া তিনি চৈতন্য হারাইলেন, তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হইল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি রজনীকান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বলিলেন, "রজনী বাবু, এ আপনার অতি অন্যায় বিচার। আমরা নিশ্চিন্ত নহি, আর আমরা যে কোন সূত্র পাই নাই, তাহাও নহে।"

দারোগা বাবুর দিকে চাহিয়া অতি গম্ভীরভাবে রজনীকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সূত্র পাইয়াছেন, বলুন?"

দারোগা বাবুর বুদ্ধি তত প্রখর ছিল না। তিনি আপনার গৌরব বৃদ্ধির জন্য বলিয়া উঠিলেন, যদি আমরা জানিতে পারি—" এই বলিয়াই দারোগা বাবু আমার দিকে চাহিলেন ও আমার ইসারায় তিনি মুখ বন্ধ করিলেন।

আমি দারোগা বাবুকে বলিলাম, "সদর দরজা ভগ্ন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি হত্যাকারী ভিতরে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে বুঝিতাম, ভিতরে যাইবার জন্যই দরজা ভাঙ্গা হইয়াছে। কিন্তু বাহির হইতে বাটীর ভিতরে কোন লোকই প্রবেশ করে নাই দেখিতেছি।"

দারোগা বাবু আমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া জানিলেন যে, বাহিরের লোক ভিতরে প্রবেশ করে নাই ?"

হাসিতে হাসিতে আমি উত্তর করিলাম, "সে রকম পায়ের দাগ দেখিতে পাইতেছি না। আমি প্রথমেই আমার যন্ত্রের সাহায্যে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম; পদচিহ্নগুলি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।"

রজনীকান্ত এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি আমার শেষ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কেমন করিয়াই বা সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, আর তাহার দরজা ভাঙ্গিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল ?"

আমি হাসি চাপিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "আমি ত ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ঐ কথাই ত আমি জানিতে চাই।"

আমার কথা শুনিয়া এবং আমাকে হাসিতে দেখিয়া, তিনি বিরক্ত হইলেন, রাগতভাবে বলিলেন, "যদি সকল কথাই আমরা বলিয়া দিব, তবে আপনাদের এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ছিল ?"

রজনীকান্তের কথায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আমিও রাগিয়া উত্তর করিলাম, "কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। আমি দারোগা বাবুর সহিত কথা কহিতেছিলাম এবং তাঁহাকেই ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আমাদিগের কার্য্যে আপনার কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের কার্য্য আমরা ভাল বুঝি।"

আমাকে রাগান্বিত দেখিয়া রজনীকান্ত অনেকটা শান্ত হইলেন। ত্রৈলোক্য বাবুও সেই সময় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন

আমি তখন হাসিলাম। বলিলাম, "আপনি স্বচক্ষে কি দেখিয়াছেন বলুন?"

ত্রৈ। আমি যখন কার্য্য শেষ করিয়া জানালা বন্ধ করিতে যাই, ঠিক সেই সময় আমাদের বাড়ীর সম্মুখের মাঠ দিয়া দুইজন লোককে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে দেখিতে পাই। লোক দুইজন চকিতের মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নীচে চাহিয়া দেখি, রজনীকান্ত ও কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমার কেমন সন্দেহ হইল। আমি তখনই নীচে গেলাম, যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তাহার পর পুত্রের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া স্থানীয় পুলিসে সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ত্রৈলোক্য বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে চারিদিকে কাক কোকিল প্রভৃতি পক্ষী সকল প্রভাতী গান আরম্ভ করিল। পূর্ব্বাকাশ রক্তিমাভা ধারণ করিল। বুঝিলাম, প্রভাত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্য বাবুর কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বলিলাম, "আপনার ঘরে তখন নিশ্চয়ই আলোক জ্বলিতেছিল?"

ত্রৈলোক্য বাবু বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন, "হাঁ, আলোক জ্বলিতেছিল বই কি।"

আ। আপনার পুত্রের গৃহে ?

ত্রৈ। সে ঘরেও আলো ছিল।

আ। বাড়ীতে দুই দুইটী আলোক জ্বলিতেছিল, তবুও চোর প্রবেশ করিল, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! তবে এ কথা স্থির জানিবেন যে, সেদিন সরোজ বাবুর বাড়ীতে যাহারা চুরি করিয়াছিল, তাহারাই আপনার ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছে।

আমার শেষ কথা শুনিয়া রজনীকান্ত ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন, "অসম্ভব! ভুল ধারণা! আপনার কথা কথাই নয়।"

আমি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "তবে সে-চুরির উদ্দেশ্য কি বলুন? শুনিয়াছি, কোন দামী জিনিষ চুরি যায় নাই। মূল্যবান জিনিষগুলি থাকিতে যে চোর দড়ির বাণ্ডিল, ভাঙ্গা বাতি, এই সকল অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য লয়, সে চোর বড় সাধারণ চোর নয়!"

আমার কথায় ত্রৈলোক্যবাবু অনেকটা শান্ত হইলেন। বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমরা সামান্য বুদ্ধির লোক, ঐ সমস্ত রহস্যপূর্ণ কথা বুঝিব কেমন করিয়া? এখন বলুন, কি করিলে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যায়?"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর উত্তর করিলাম, "এক কার্য্য করুন, তবে তাহাতে আপনার কিছু ব্যয় হইবে।"

ত্রৈলোক্য বাবু আমাকে বাধা দিয়া উত্তর করিলেন, "ব্যয় হইবে বলিলে কি করিব? আপনি খরচের জন্য সঙ্কুচিত হইবেন না। বলুন, আমাকে কি করিতে হইবে?"

আ। আপনি সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুন—"যে ব্যক্তি সেই হত্যাকারীর সন্ধান দিতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

ত্রৈ। বেশ কথা, আপনি একটা মুসবিদা করুন, আমি স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইয়া দিতেছি।

ত্রৈলোক্য বাবুর আদেশ পাইয়া আমি তখনই একখানা কাগজে ঐ মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন লিখিলাম এবং স্বাক্ষরের জন্য ত্রৈলোক্য বাবুর হস্তে প্রদান করিলাম।

তিনি কাগজখানি গ্রহণ করিয়া অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। পরে হাসিয়া বলিলেন, "আর সব বেশ হইয়াছে বটে কিন্তু একটা ভয়ানক ভুল করিয়াছেন।"

আমি তাঁহার মুখে আমার ভুলের কথা শুনিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু বাহ্যিক যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি! ভুল কোথায় হইল? তবে তাড়াতাড়ি লিখিয়াছি, ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে।"

ত্রৈলোক্য বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আপনি লিখিয়াছেন, রাত্রি একটা বাজিতে এক কোয়াটার পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যনাথ—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রাত্রি দুপুর বাজিতে এক কোয়াটার পূর্ব্বে;—পৌনে বারটার সময়।

ত্রৈলোক্যনাথের কথা শুনিয়া দারোগা বাবু আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বোধ হইল, আমার এই সামান্য ভুলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। রজনীকান্তও এ মহাসুযোগ ত্যাগ করিলেন না। তিনি আমায় উপহাস করিয়া নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ আমার হাত হইতে কলম লইয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পরে কাগজখানি আমায় দিয়া বলিলেন, "এই নিন্, যত শীঘ্র পারেন, ছাপাইয়া ফেলুন। পরে যে যে স্থানে পাঠাইলে ভাল হয়, সেই সেই স্থানে প্রেরণ করুন। আমাদের বিশ্বাসী ভৃত্যের হত্যাকারীকে যথোচিত শাস্তি দিতে না পারিলে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না। ইহাতে যত টাকা ব্যয় হইবে, সমস্তই অকাতরে দিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় সাতটা বাজিল। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। পূর্ব্বদিন যেমন সদাই মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সেদিন আর মেঘের লেশমাত্র ছিল না। প্রবলবেগে উত্তরে বাতাস বহিতেছিল। একে সেই ভয়ানক শীত. তাহার উপর সেই কন্‌কনে বাতাস, সকলকেই কাঁপিতে হইতেছে।

ত্রৈলোক্যবাবুর হস্ত হইতে কাগজখানি গ্রহণ করিয়া অতি যত্নসহকারে আমি উহাকে পকেটে রাখিয়া দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুর্গাচরণ কাল কত রাত্রে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিল জানেন?"

ত্রৈ। জানি—রাত্রি প্রায় এগারটার সময়।

আ। প্রতিদিনই কি সে ঐ সময়ে শুইতে যায়?

ত্রৈ। সে কথা বলিতে পারি না।

ত্রৈলোক্যনাথের শেষ কথায় বোধ হইল, তিনি ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। আমি আর সে কথা উত্থাপন করিলাম না। পুনরায় ভাঙ্গা দরজাটী পরীক্ষা করিলাম। পরে ত্রৈলোক্যনাথকে বলিলাম, "দেখুন, বাটালি কিম্বা ঐপ্রকার অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে দরজার হুড়কো খোলা হইয়াছে। কে এ কাজ করিল? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত কষ্ট করিয়া যে দরজা খুলিল, সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল না কেন?"

কথাটা আমি যে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা নহে, শেষ কথাগুলি আমি দারোগাবাবুর দিকে চাহিয়াই বলিয়াছিলাম; সুতরাং ত্রৈলোক্যনাথ সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু তিনি যে আন্তরিক রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়াই বেশ জানিতে পারিয়াছিলাম।

সে যাহা হউক, আমি আর কোন কথা না বলিয়া দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ত্রৈলোক্যবাবু ও রজনীকান্ত বাবুর শয়নগৃহগুলি দেখিয়াছিলেন?"

দারোগাবাবু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "না।"

আ। কেন?

দা। দেখিবার কোন প্রয়োজন বুঝি নাই।

আ। যেখান হইতে পিতাপুত্রে সেই হত্যাকারীকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন, সে স্থান দুইটি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলেন কেন? হয়ত সেখানে যাইলেই কোন নূতন সূত্র বাহির করিতে পারিতেন।

ত্রৈলোক্যবাবু আর থাকিতে পারিলেন না। অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যদি কেবল সময় নষ্ট করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পর্য্যন্তই ভাল। আর কিছু করিতে হইবে না। যদি ক্ষমতা না থাকে, স্বীকার করিয়া চলিয়া যান। এখানকার দারোগাবাবু যেমন, আপনিও সেইরূপ দেখিতেছি।"

দারোগাবাবুও রাগান্বিত হইলেন। বলিলেন, "আপনি বারম্বার আমাদিগকে এরূপ অপমানিত করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, বা আপনার কোন মতামত চাহিতেছি না। আমাদিগের কার্য্য আমরা জানি, এরূপভাবে আমাদিগের কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিবেন না।"

দারোগাবাবুর কথায় আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "ভাই, রাগের কাজ নয়। বিশেষতঃ যখন আমি বারবার ভুল করিতেছি, তখন উনিই বা আমাকে ছাড়িবেন কেন? এখন ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই। যাহার জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া রহিয়াছি, যাহার জন্য এতখানি বেলা পর্য্যন্ত মুখে জল দিই নাই, আগে সেই কাজ করা যাউক। আমি একবার শয়নগৃহ দুইটী না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।"

আমার কথায় রজনীকান্ত অট্টহাস্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "যদি একান্তই না দেখিলে নয়, তবে আসুন।"

ত্রৈলোক্যনাথ এই বলিয়া আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমি ও দারোগাবাবু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। রজনীকান্ত সকলের শেষে চলিলেন।

ত্রৈলোক্যবাবুর শয়নগৃহ দ্বিতলে—ঘরে কোন স্ত্রীলোক ছিল না। অগ্রে তিনি তথায় প্রবেশ করিলেন। আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

ত্রৈলোক্যবাবুর শয়নগৃহটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়; দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ হাত, প্রস্থেও আট হাতের কম নহে। ঘরের মধ্যে তিনটা দেরাজ, একটা আলমারি, দুইটা লৌহের সিন্দুক ছিল। দেওয়ালে খানকয়েক ভাল ভাল ছবি, তিনটী দেয়ালগিরী ও একখানি প্রকাণ্ড আয়না ছিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ত্রৈলোক্য বাবু আমাকে একটী জানালার নিকট লইয়া গেলেন। বলিলেন, সেই স্থান হইতে তিনি হত্যাকারীকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন। আমি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, একবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলাম, পরে বলিলাম, "এইবার রজনী বাবুর শয়ন গৃহে চলুন।"

ত্রৈলোক্যনাথ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বাহির হইলাম।

রজনীকান্তের শয়নগৃহ তাঁহার পিতার গৃহের কিছু দূরে ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ আমাদিগকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পুত্রের ঘরখানি পিতার গৃহ অপেক্ষা আরও বড় ও উহার সংলগ্ন একটী চোরা কুঠরি আছে বুঝিতে পারিলাম।

ঘরের এক পার্শ্বে একখানা প্রকাণ্ড পালঙ্ক, তাহার উপর দুগ্ধফেননিভ এক অতি সুকোমল শয্যা। দেওয়ালগুলিতে নানাপ্রকার দেব-দেবীর ছবি। ঘরের মধ্যে একটা বড় গোল টেবিল—তাহার পার্শ্বে আর একটা ছোট টেবিল।

আমি এ ঘরটী উত্তমরূপে দেখিয়া সেই চোরা কুঠরির ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার কালীন পিতা পুত্রে আমাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন, আমি তাঁহাদিগের নিষেধ না শুনিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিলাম, ও সেই কুঠরি অনুসন্ধান করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইলাম, তাহার নিমিত্ত পিতা ও পুত্রকে সেই সময়ে গ্রেপ্তার করিলাম। ঐ কুঠরির ভিতর আমি যে কি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা পাঠকগণ সময়ে জানিতে পারিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রে বন্দী হইবার পর আমি সকলের সমক্ষে একখানি ছেঁড়া কাগজ বাহির করিলাম। দারোগা বাবু প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলোম না, আমার হস্তে একখানা ছেঁড়া কাগজ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "কাগজখানি সেই চিঠির অবশিষ্ট অংশ।"

আমার কথা শুনিয়া দারোগা বাবু স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, 'সত্য না কি, কাগজখানি পাইলেন কোথা?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "যেখানে কাগজখানি পাইব আশা করিয়াছিলাম। আমি এখনই সমস্ত কথা প্রকাশ করিতেছি।"

দারোগা বাবু তখন অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কোন্ সূত্র ধরিয়া, কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া, এই কার্য্যে সফল হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "সমস্তই বলিতেছি, কিন্তু আপাততঃ বন্দীদ্বয়কে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।"

এই বলিয়া আমি ত্রৈলোক্য বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "নীরদা কে ?"

আমার কথা শুনিয়া আমার সমভিব্যাহারী দারোগা বাবু স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু সাহস করিয়া আমাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। ত্রৈলোক্য বাবু আমার কথায় লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। তিনিও কোন উত্তর করিলেন না।

আমি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ত্রৈলোক্য বাবু তখন উত্তর করিলেন, "যখন আপনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন আর আমায় প্রশ্ন করিতেছেন কেন ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না মহাশয়, সত্যই আমি নীরদার কথা জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে এত লোকের সাক্ষাতে আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতাম না। আপনার কোন চিন্তা নাই, আমার সমস্ত লোকই বিশ্বাসী, ইহাদের দ্বারা আপনার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ, যখন আপনি শীঘ্রই ইহলীলা ত্যাগ করিবেন, তখন আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতে দোষ কি ?"

ত্রৈ। নীরদা একটী ভদ্রমহিলা।

আ। তাঁহার নিবাস কোথায় ?

ত্রৈ। আমাদেরই পাড়ায়—আমার বাড়ী হইতে পাঁচ ছয়-খানি বাড়ীর পর নীরদার বাড়ী।

আ। নীরদা সধবা কি বিধবা ?

ত্রৈ। বিধবা।

আ। তাঁহার সহিত দুর্গাচরণের সম্বন্ধ কি ? যে পত্রের কথা-মত আপনার ভৃত্য রাত্রি দুপুরের কিছু পূর্ব্বে এ বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়াছিল, সেই পত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম, আপনার ভৃত্য নীরদার সংবাদ জানিতে ব্যস্ত।

ত্রৈ। আপনার অনুমান সত্য। নীরদার সহিত দুর্গাচরণের অবৈধ প্রণয় ছিল।

আ। কেবল দুর্গাচরণেরই সহিত যে প্রণয় ছিল তাহা বোধ হয় না। আপনিও নীরদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, পত্র পাঠে তাহাও জানিতে পারিয়াছি। কেমন, আমার এ অনুমান সত্য কি না ?

ত্রৈলোক্যনাথ কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া সকলেরই প্রতীয়মান হইল যে, তিনিও নীরদাকে ভালবাসিতেন।

সে যাহা হউক, ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার পুত্রকে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া আনিতে বলিলাম। গাড়ী আনীত হইলে বন্দীদ্বয়কে তাহাতে আরোহণ করাইয়া থানায় প্রেরণ করিলাম।

দারোগা বাবু তখন আমাকে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার সহিত সরোজ বাবুর আলাপ আছে কি ?"

দা। হাঁ, আছে বই কি। কিন্তু আমি লজ্জায় তাঁহার নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেছি না।

আ। কেন?

দা। তাঁহার বাড়ীতে যে চুরি হইয়াছিল, এখনও তাহার কোন কিনারা করিতে পারিলাম না, কোন্ লজ্জায় তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব?

আ। কেন? সে চোর ত ধরা পড়িয়াছে।

দারোগা বাবু স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "সে কি! কবে ধরা পড়িল? কোথায়, কাহার দ্বারা চোর ধৃত হইল?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "সমস্তই বলিতেছি। কিন্তু অগ্রে আমার দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। সরোজ বাবুর সহিত ত্রৈলোক্য বাবুর কোন সম্বন্ধ আছে কি না?"

দা। বোধ হয় কোন সম্বন্ধ আছে।

আ। বোধ হয় কেন?

দা। বহুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে মোকদ্দমা চলিতেছে।

আ। তবে একবার সরোজ বাবুকে এখানে ডাকাইয়া পাঠান। তিনি এখানে আসিলে, তাঁহার সমক্ষে এই অদ্ভুত রহস্য ভেদ করিব।

দারোগা বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। আপনি থানায় যান, আমি সরোজ বাবুকে লইয়া শীঘ্রই সেখানে যাইতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমি যখন থানায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। একে পূর্ব্বরাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হয় নাই, তাহার উপর সেদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত স্নানাহার না হওয়ায়, আমার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

থানায় ফিরিয়া আসিয়া অগ্রে স্নানাহার সমাপন করিলাম। পরে আমার অফিস-ঘরে দারোগা বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বেলা প্রায় বারটার সময় একজন যুবককে সঙ্গে লইয়া দারোগা বাবু আমার নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সমভি-ব্যাহারী বাবুকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "ইহাঁরই নাম সরোজ বাবু।"

সরোজ বাবুর সহিত আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। আমি তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে কহিলাম, "মহাশয়! এতদিন পরে চোর ধরা পড়িয়াছে।"

সরোজবাবু স্তম্ভিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "চোর ধরা পড়িয়াছে?"

আ। হাঁ, তাঁহারা হাজতে রহিয়াছেন।

স। তাঁহারা? চোরকে এত সম্মান কেন?

আ। তাঁহারা যে সে চোর নহে সরোজবাবু! তাঁহারা নামজাদা লোক। অথচ চুরি, জাল, হত্যা প্রভৃতি ভয়ানক কার্য্য তাঁহাদের দৈনিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত।

দারোগাবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এইবার সকল কথা খুলিয়া বলুন। কি করিয়া এই দুইটী ভয়ানক রহস্য ভেদ করিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "যথনই এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করিবার ভার আমার হস্তে পতিত হইল, তথনই আমি আপনার নিকট আসিয়া সমস্ত কথা শুনিলাম। পত্রাংশ আমাকে দিয়াছিলেন, সেখানি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, উহা দুইজনের লেখা।"

এই বলিয়া আমি সেই ছেঁড়া কাগজখানি দারোগা বাবু ও সরোজকুমারকে দেখাইলাম। তাঁহারা আমার কথায় সায় দিলেন। বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য।"

আমি বলিলাম, "দুই হাতের লেখা হইলেও সেই দুইজন যে একই পরিবারভুক্ত এবং তাহাদের একজন বৃদ্ধ ও অপর যুবক, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন; কিন্তু উভয়েরই ল গুলি ন এইরূপ। পূর্ব্বকালে লোকেরা ঐরূপেই ল লিখিত।"

দারোগাবাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখা দেখিয়া বৃদ্ধ কি যুবক জানিলেন কিরূপে?"

আ। বৃদ্ধের লেখার জোর নাই, আল্‌গা কলম ধরিয়া লেখা; যুবকের লেখার জোর আছে, যুবকেরা সচরাচর কলমে জোর

দিয়া লিখিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, যখন আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম, তখন ভাবিলাম, এরূপ দুইজন লোক কোথায়? মনে হইল, ত্রৈলোক্যবাবু ও তাঁহার গুণধর পুত্র রজনীকান্ত।

দা। তাঁহারা আপনাদের বিশ্বাসী চাকরকে হত্যা করিলেন কেন?

আ। সমস্তই জানিতে পারিবেন। যখন ত্রৈলোক্যবাবু ও তাঁহার পুত্রের উপর সন্দেহ হইল, তখন আমি তাঁহার বাড়ীর ভিতর দেখিতে ইচ্ছা করিলাম, কেন না, তাঁহারা উভয়েই হত্যাকারীকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন। যেখানে তাঁহারা হত্যাকারীকে দেখিয়াছিলেন, আমি অগ্রে সেই স্থানে গিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তথায় কাহারও পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। যদি হত্যাকারী বাস্তবিকই সেই পথে পলায়ন করিত, তাহা হইলে সেখানে নিশ্চয়ই পদচিহ্ন দেখিতে পাইতাম। সুতরাং ত্রৈলোক্যবাবু ও তাঁহার পুত্র যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তাহার পর আপনার স্মরণ আছে বোধ হয়, আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, হত্যাকারীর নিকট অবশিষ্ট পত্রাংশ আছে।

দা। হাঁ, বেশ স্মরণ আছে।

আ। যখন ত্রৈলোক্যবাবু ও তাঁহার পুত্রের উপর সন্দেহ হইল, তখন আমি ভাবিলাম, উহাদেরই নিকটে সেই পত্রাংশ আছে। এই ভাবিয়া তাঁহাদের শয়নগৃহ দেখিবার আছিলা করিলাম। এই সময়ে আর একটী ব্যাপার হইল। রজনীকান্তের কথায় আপনি বলিতে যাইতেছিলেন যে, ঐ পত্রাংশ যাহার নিকট

আছে, সেই হত্যাকারী ; এ কথা শুনিলে পাছে তাহারা পিতাপুত্রে সাবধান হয়, এই ভাবিয়া আমি আপনাকে ইসারা করিয়া অপর কথা পাড়িলাম।

দারোগাবাবু আমার কথায় স্তম্ভিত হইলেন।

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তাহার পর হস্তাক্ষর মিলাইবার প্রয়োজন হইল। কি করিয়া ত্রৈলোক্যবাবুর হাতের লেখা দেখিতে পাইব, কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি তাঁহাকে আমার সমক্ষে লেখাইতে পারিব, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার মনে এক উপায় উদ্ভাবিত হইল, আমি ত্রৈলোক্য বাবুকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি আমায় মুসবিদা করিতে বলিলেন। আমারও উদ্দেশ্য সফল হইল। আমি ভুল করিয়া একটা বাক্সিতে এককোয়াটারের মধ্যে লিখিলাম।"

আমায় বাধা দিয়া দারোগাবাবু বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি আপনি ইচ্ছা করিয়া সেই ভুল করিয়াছিলেন ?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "তবে কি আপনি আমায় এতই মূর্খ মনে করেন যে, যাহা একবার শুনিব, তাহা ভুলিয়া যাইব ? না দারেগাবাবু, আমার স্মরণশক্তি এত ক্ষীণ নহে। ইচ্ছা করিয়াই ভুলটী করিয়াছিলাম। ত্রৈলোক্য বাবু স্বহস্তে সেই ভ্রম সংশোধন করিলেন, আমারও উদ্দেশ্য সফল হইল। যে ছেঁড়া কাগজখানি আপনার নিকট হইতে লইয়াছিলাম, তাহাতেও ঐ কথাগুলি লেখা ছিল। আমি দুই লেখা মিলাইলাম। দেখিলাম, ঐ লেখার মধ্যে যে যে অক্ষর বৃদ্ধের লেখা ভাবিয়াছিলাম, তাহার সহিত ত্রৈলোক্যবাবুর সেই সেই অক্ষরের বেশ সামাঞ্জস্য আছে।

বুঝিলাম, পত্রখানি পিতাপুত্রেরই লেখা। তাহার পর ভাবিলাম, সেই ছেঁড়া কাগজখানির অবশিষ্ট অংশ না পাইলে কিছুই করিতে পারিব না। কি করিয়া সেখানি পাইতে পারিব? অনেকক্ষণ ধরিয়া এই চিন্তা করিলাম। শেষে ত্রৈলোক্যবাবু ও তাঁহার পুত্রের শয়নগৃহ দেখিবার ইচ্ছা করিলাম। ভাবিলাম, সেই দুইটী ঘরের মধ্যে কোথাও না কোথাও কাগজখানির অংশ লুক্কায়িত আছে। সুতরাং তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু সেখানে কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিলাম না। সে ঘরে কাগজখানি ছিল না। তাহার পর আপনাদিগকে লইয়া রজনীকান্তের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলাম।

দারোগাবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

আমি বলিলাম, "যখনই আমি রজনীকান্তের ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখনই দূর হইতে উহার মধ্যে একটা চোরাকুঠরী দেখিতে পাইলাম। আমার কেমন সন্দেহ হইল; ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দুইটা জামা ও থানকয়েক কাপড় রহিয়াছে দেখিলাম। সেগুলি পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বোধ হইল, জামার পকেটেই কাগজখানি আছে। সুতরাং আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিতেই সেই কাগজের অর্দ্ধাংশ আমার হস্তগত হইল।

দা। দুর্গাচরণকে হত্যা করিবার কারণ কি? কিজন্যই বা তাঁহারা বিশ্বাসী ভৃত্যকে খুন করিলেন? আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আ। এ কথা এখনও বুঝিতে পারিলেন না?

দা। না।

আ। সরোজবাবুর বাড়ীতে সেদিন যাহারা চুরি করিয়াছিল, তাহারাই দুর্গাচরণকে খুন করিয়াছে। ত্রৈলোক্যবাবুর সহিত তাঁহার মোকদ্দমা চলিতেছে। একখানি আবশ্যকীয় দলিল চুরি করিবার জন্যই ত্রৈলোক্যবাবু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সরোজবাবুর বাড়ীতে চুরি করিতে আসিয়াছিলেন। প্রকৃত চোর হইলে, এত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি না লইয়া সেই সকল সামান্য দ্রব্য চুরি যাইবে কেন? দুইজন ভদ্রলোকের চুরি করা অসম্ভব জানিয়া ত্রৈলোক্য বাবু তাঁহার বিশ্বাসী চাকর দুর্গাচরণকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। পাছে সেই চাকরের দ্বারা ভবিষ্যতে এই কথা প্রকাশিত হয়, এই ভয়েই দুর্গাচরণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

দা। দুর্গাচরণ তাঁহাদের বিশ্বাসী ভৃত্য, তাহাকে খুন না করিয়া অন্য কোন উপায়ে ত বশীভূত করিতে পারিতেন?

আ। না—পারিতেন না। দুর্গাচরণ ইতিমধ্যেই তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

দা। কিসে জানিতে পারিলেন?

আ। সেই চিঠিখানি পাঠ করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহার উপর ত্রৈলোক্যবাবুকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিয়াছিলাম।

দা। চিঠিখানিতে কি লেখা আছে? যদি বিরক্ত না হন, তাহা হইলে দয়া করিয়া বলুন?

দারোগাবাবুর কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "যদি বিরক্ত হইব, তবে স্বইচ্ছায় এ সকল কথা বলিব কেন? চিঠিখানি পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, দুর্গাচরণ নীরদা নাম্নী

কোন ভদ্রমহিলার সহিত অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ। অনেকদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, সে নীরদাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে; এমন কি, সকলের সাক্ষাতে তাহাদের বাড়ী গিয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ করে।

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে সরোজবাবু বলিয়া উঠিলেন, "নীরদা? সে যে আমাদেরই বাড়ীর নিকটে থাকে? শুনিয়াছি, তাহার চরিত্রদোষও আছে।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। সেই নীরদাই দুর্গাচরণের প্রণয়িনী। কেবল তাহাই নহে; ত্রৈলোক্যবাবুও তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; তবে নীরদা দুর্গাচরণকেই আন্তরিক ভালবাসে এবং তাহাকে পাইবার জন্যই ব্যস্ত। দুর্গাচরণের উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া নীরদার অভিভাবক তাহাকে বাড়ীতেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন। বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নীরদার শ্বশুর তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন।"

আমাকে বাধা দিয়া দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্রৈলোক্য বাবু দুর্গাচরণকে ঐপ্রকার উৎপাত করিতে নিষেধ করেন নাই কেন?"

আ। অনেকবার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গাচরণ সে কথায় কর্ণপাতও করে নাই; বরং চুরির কথা প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল।

দা। নীরদার অভিভাবক পুলিসে এ সংবাদ দেয় নাই কেন?

আ। নীরদা ভদ্রঘরের কন্যা, তাহার শ্বশুরও বড় লোক। এ অবস্থায় তিনি যদি দুর্গাচরণের দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশ

করিতেন, তাহা হইলে নীরদার শ্বশুর ও তাহার অভিভাবকের মুখ দেখান ভার হইত।

দা। পত্রে এমন কি ছিল, যাহাতে দুর্গাচরণ প্রলোভিত হইল?

আ। পত্রে লেখা ছিল, যদি দুর্গাচরণ নীরদাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেদিন রাত্রি দুপুর বাজিতে এক কোয়াটারের সময় দরজা খুলিয়া অপেক্ষা করিবে। দুর্গাচরণ সেই পত্রের কথামত সেই সময়ে দরজা খুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে রজনীকান্ত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাহার নিকট গমন করেন এবং তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন।

দা। নিকট হইতে গুলি করিয়াছিলেন, আপনি জানিলেন কিরূপে?

আ। নিকট হইতে গুলি না করিলে দুর্গাচরণের কাপড়ে বারুদের দাগ লাগিবে কেন? দূর হইতে বন্দুক ছুড়িলে বারুদের দাগ দেখা যাইবে কেন?

দারোগাবাবু সমস্ত কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "পরিচারক দুর্গাচরণের হস্তে ঐ পত্রখানি আসিল কি প্রকারে?" উত্তরে আমি কহিলাম, "কোনরূপ উপায়ে উহা দুর্গাচরণের হস্তে প্রদান করা হইয়াছিল।

আমি তখন সরোজবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সরোজবাবু! যে দলিলখানির জন্য আপনার বাড়ীতে চুরি হইয়াছিল, সে দলিলখানি কোথায়?"

সরোজবাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সেখানি এমন স্থানে রাখিয়াছি যে, ত্রৈলোক্যবাবু সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা বাহির

করিতে পারিতেন না। আমার উকীল মহাশয়ের নিকটই দলিল-খানি আছে।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন।"

স। ত্রৈলোক্য বাবু যে দলিলখানি আদায় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন, তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। সেই জন্যই, উহাকে বাড়ীতে না রাখিয়া, উকিল বাবুর বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল।

আ। কেমন করিয়া জানিলেন যে, ত্রৈলোক্য বাবু দলিলখানি আদায়ের চেষ্টা করিবেন ?

স। তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ দলিলের জন্য আমার নিকট লোক পাঠাইতেন। কিন্তু তাহারা এরূপভাবে আসিত যে, কেহই জানিতে পারিত না, তাহারা ত্রৈলোক্য বাবুর নিকট হইতে আসিয়াছিল; পূর্ব্বে আমিও বুঝিতে পারি নাই। শেষে একজনকে কিছু অর্থ দিয়া, তাহার উদ্দেশ্য জানিয়া লইলাম। কিন্তু একটী কথা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। রজনীকান্ত স্বহস্তে দুর্গাচরণকে খুন না করিয়া অপর কাহারও দ্বারা উহাকে হত্যা করিল না কেন ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাহা হইলে ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার পুত্রকে সেই হত্যাকারীর বশীভূত হইতে হইত। যে কারণে দুর্গাচরণ হত্যা হইল, তাহার কোন প্রতিবিধান হইত না। এক জনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অপরের হস্তে পড়িতে হইত।"

দারোগা বাবু ও সরোজকুমার আমার কথায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

পিতা পুত্র উভয়েই ক্রমে সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন। সাক্ষীও পাওয়া গেল, রজনীকান্তের ঘর হইতে বন্দুকও বাহির হইল। বিচারে পিতা পুত্র দ্বীপান্তরিত হইলেন।

সমাপ্ত।

স্ত্রী না রাক্ষসী।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [শ্রাবণ।

স্ত্রী না রাক্ষসী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাস; কিন্তু বেশ শীত পড়িয়াছে। কলিকাতায় মহাধূম। কি একটা যোগ উপলক্ষে বিদেশ হইতে দলে দলে যাত্রীর সমাগম হইতেছে। যেখানে যত খালিবাড়ী ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভাড়া হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আর লোকের স্থান হইতেছে না। মিউনিসিপ্যাল-কর্ম্মচারীগণ সহরের সুবন্দোবস্তের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

যোগের পূর্ব্বদিন বেলা নয়টার সময় আমি স্নান করিতেছি, এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম, একজন বৃদ্ধ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। তাঁহার বাড়ীতে খুন হইয়াছে। সেই সময় আমি ভবানীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

যতশীঘ্র পারিলাম, স্নান সমাপন করিয়া অফিস-ঘরে গমন করিলাম। দেখিলাম, একবৃদ্ধ ঘরের মধ্যস্থলে নিশ্চল নিস্পন্দবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি এত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, যেন তাঁহার বোধ হইল, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। তিনি নির্নিমেষনয়নে অফিস-ঘরের টেলিফোনের যন্ত্রটীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বৃদ্ধের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ,

কিন্তু তাহাতে লাবণ্য নাই। তাঁহার মস্তকের সমস্ত কেশ শুভ্র; শরীরের মাংস শিথিল, চক্ষু কোটরগ্রস্ত এবং জ্যোতিহীন। বৃদ্ধের পরিধানে একখানি মোটাধুতি, গায়ে একখানা নামাবলী, তাহার উপরে একখানা লাল বনাত, পায়ে ঠন্‌ঠনের চটিজুতা। বৃদ্ধ যেরূপভাবে অফিস-ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া বোধ হইল।

আমার জুতার শব্দে বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, তিনি আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি করুণস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, রক্ষা করুন্! রক্ষা করুন্! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, রক্ষা করুন্! এই গরিব ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন্।"

বৃদ্ধ যে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। আমি মিষ্টকথায় তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত করিলাম। পরে তাঁহার হাত ধরিয়া নিকটস্থ একখানি বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিলাম। কলের পুত্তলিকার মত বৃদ্ধ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আসা হইতেছে? আপনার কি করিতে হইবে বলুন?"

বৃদ্ধ অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমার বাড়ী কালীঘাটে। সেখানে একটা খুন হইয়াছে। আপনি আমাকে সেই খুনের দায় হইতে মুক্ত করুন।"

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; ভাবিলাম, কালীঘাটে ভদ্রলোকের ঘরে খুন! তীর্থস্থানে নরহত্যা!! কলিকালে আর কিছু বাকী রহিল না দেখিতেছি। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বাড়ীতেই কি খুন হইয়াছে?"

বৃ। আজ্ঞে হাঁ। আমারই বাড়ীতেই খুন হইয়াছে। এইবার

দেখিতেছি, আমার নাম গেল, যশ গেল, শেষে আমার একমাত্র উপজীবিকা পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আ। কে খুন হইয়াছে? আপনার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি?

বৃ। আমার একজন ভাড়াটীয়া।

আ। আপনার বাড়ীতে ক'জন ভাড়াটীয়া আছে?

বৃ। আমার বাড়ীটী দ্বিমহল। ভিতর মহলে আমি সপরিবারে বাস করি, বাহির মহলে ভাড়া দিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করি। কালীঘাটে প্রত্যহই অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। আমি সেই যাত্রী সকলকেই বাড়ীর বাহির মহল দৈনিক হিসাবে ভাড়া দিয়া থাকি। এই যোগ উপলক্ষে বিদেশের অনেক যাত্রী আদি-গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য কালীঘাটে সমবেত হইয়াছে। অনেক লোকের সমাগম হওয়ায়, আমার বাহির-মহলের সমস্ত ঘরগুলিই তিন চারি দিনের মত ভাড়া হইয়া গিয়াছে। এই সকল ভাড়া-টীয়ার মধ্যে বোধ হয় একজন খুন হইয়াছে।

আমি তাঁহার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বোধ হয় কেন? আপনি কি না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন?"

বৃদ্ধ আমার কথায় বিরক্ত হইলেন না। বলিলেন, "আমার মন বড় চঞ্চল, আমি সকল কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছি না।"

এরূপ নম্রভাবে বৃদ্ধ এই কথাগুলি বলিলেন, যে তাঁহার কথায় আমার কোন সন্দেহ হইল না। বলিলাম, "আপনি স্থির হইয়া আমায় সকল কথা গুছাইয়া বলুন। যদি আপনি বাস্তবিক নির্দ্দোষী হন, তাহা হইলে আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। যেরূপে পারি, আপনাকে রক্ষা করিব।

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—আপনার পিতার সদৃশ। দেখিবেন, আমার কথা নিষ্ফল হইবে না।"

বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদে আমার মনে কেমন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। আমি অতি বিনীতভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "গতকল্য বেলা প্রায় চারিটার সময় এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক আমার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং বাড়ীর একটী ঘর ভাড়া লইবার প্রস্তাব করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ষোলখানি ঘর আমি ভাড়া দিয়া থাকি। উপরে আটখানি, নীচে আটখানি। ঘরগুলি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আলোক ও বায়ুনির্গমনের সুব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীচের সমস্তগুলি ও উপরের ছয়খানি ঘর পূর্ব্বে ভাড়া হইয়া গিয়াছিল। দুইখানি মাত্র ভাড়া হয় নাই। নবাগত লোকটী সেই দুইখানির মধ্যে একখানি মনোনীত করিলেন। তিনদিনের জন্য ঘরখানির পাঁচ টাকা ভাড়া হইল। তিনি ভাড়া অগ্রিম দিলেন। ঘরখানির চাবি তাঁহার হস্তে দিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। আজ বেলা সাতটার পর আমি তাঁহার ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দার ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতেছি, দেখিলাম, গৃহের দ্বার তখনও আবদ্ধ। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, ইহাঁরা তীর্থে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন, বেলা সাতটা বাজিয়া গেল, সকলের একবার দর্শন হইয়া গেল, তাঁহারা কি না তখনও নিদ্রা যাইতেছেন! পরক্ষণেই মনে হইল, তিনি অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন, বোধ হয়, পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছেন। শীতকালের বেলা, সাতটা বাজিলেও এখনও বেশ পরিষ্কার হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিদ্রা দূষণীয় বা নিন্দনীয় হইতে পারে না। এই স্থির করিয়া চলিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে দরজার চৌকাটের নিম্নে জল-নির্গমনের ছিদ্রপথে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। আমার কেমন সন্দেহ হইল। আমি সেইখানে বসিয়া ভাল করিয়া সেই ছিদ্রটী পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, ঘরের ভিতর হইতে একটী রক্তস্রোত সেই ছিদ্রপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বারন্দায় পতিত হইতেছে। আমার ভয় হইল। দরজায় ধাক্কা দিয়া আমি তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে কোন উত্তর পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক সেই দরজার নিকট উপস্থিত হইল, অনেকেই তাঁহাদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। বাড়ীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অন্দরে পর্য্যন্ত এই সংবাদ পঁহুছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘরের ভিতর হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কেহ কেহ দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার পরামর্শ দিল। কিন্তু আমার বড় ভয় হইল, আমি দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সাহস করিলাম না। ভাবিলাম, আপনারা আসিয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন। এখন আপনিই ভরসা, যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে আমার বাড়ীতে যে আর কোন লোক ভাড়া আসিবে, তাহা বোধ হয় না।”

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইলেন। আমি তখনই কএকজন কর্ম্মচারীর সহিত কালীঘাট অভিমুখে গমন করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন আমরা বৃদ্ধের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। নকুলেশ্বর-তলা হইতে বৃদ্ধের বাড়ী প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ। বাড়ীখানি দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু পুরাতন। তাহার উভয় পার্শ্বে উদ্যান।

বাড়ীখানি দেখিয়া বোধ হইল, বহুকাল তাহার সংস্কার হয় নাই। বাহিরের দেওয়ালগুলিতে একটুও বালি নাই। অধিকাংশ স্থানে ইষ্টকগুলি পর্য্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে শৈবাল হইয়াছে, কোথাও বা অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি অমর বৃক্ষাবলী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

বাড়ীখানি দ্বিমহল। বাহির-মহলে সর্ব্বশুদ্ধ ষোলখানি ঘর। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ আমাকে উপরে লইয়া গেলেন এবং যে গৃহের দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইতেছিল, তাহা দেখাইয়া দিলেন।

আমি কিছুক্ষণ সেই রক্তচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম, ভিতর হইতে কোন উত্তর পাইলাম না। তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারীগণকে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণের বাড়ীখানি পুরাতন, দরজা ভাঙ্গিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। আমি তখনই ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, ঘরের

মেজের উপর এক সম্ভ্রান্ত যুবক চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; তাঁহার বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র ছোরা আমূল বিদ্ধ। সেই ক্ষতস্থান দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, এবং ঘরের মধ্য দিয়া দরজার চৌকাটের নিম্নে যে জল-নির্গমনের পথ ছিল, সেই পথে প্রবেশ করিয়াছে।

ঘরখানি ক্ষুদ্র; দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আট হাতের অধিক নহে। প্রায় প্রত্যহই নূতন ভাড়াটীয়া বাস করে বলিয়া বড়ই অপরিষ্কার। ঘরে মেজেয় ধূলা জমিয়া রহিয়াছে। আস্‌বাবের মধ্যে একটী ট্রাঙ্ক, একখানি গামছা, দুইখানি কাপড়, একখানি আলোয়ান ও একটী বনাতের কোট। ঘরের একপার্শ্বে একটা মাদুর, তাহার উপর একখানা সতরঞ্চ ও দুইটা বালিস। যুবক সেই বিছানায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিলেন।

ক্ষুদ্র হইলেও ঘরখানিতে দুইটী জানালা ছিল। দেখিলাম, তাহার একটী খোলা, অপরটী বন্ধ।

ঘরের চারিদিক এইরূপে লক্ষ্য করিয়া আমি যুবককে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, তিনি অনেক পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, ক্ষতমুখ দিয়া রক্ত নির্গমন বন্ধ হইয়াছে। যুবকের গলদেশ একগাছি রজ্জু দ্বারায় আবদ্ধ। যুবকের মুখের ভয়ানক আকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইল যে, সেই দড়ীতেই তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ঘরে অনেক লোকের সমাগম হইল। বাড়ীতে খুন হইয়াছে শুনিয়া, চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। আমি দুইজন কনষ্টেবলকে ভিড় সরাইতে

আদেশ করিলাম। তাহারা অতি কষ্টে আমার আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইল।

বৃদ্ধব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলকে সেই ঘর হইতে বাহির করিয়া আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখুন সদানন্দ বাবু! আপনি ভিন্ন এখানে আপনার আর কে আছে?"

স। আমার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও এক বিধবা কন্যা। ইহা ভিন্ন একজন চাকর ও পাঁচজন দাসীও এখানে থাকে।

আ। আপনার পরিবার তত বড় নহে, পাঁচজন দাসীর প্রয়োজন কি?

স। তাহারা কেবল আমার সেবার জন্য নহে; আমার প্রজা বা ভাড়াটীয়াদিগের কার্য্য করিয়া থাকে। আমি কেবল চাকরের মাহিনা দিয়া থাকি। দাসীদিগকে বেতন দিতে হয় না। তাহারা কেবল আমার বাড়ীতে দুইবেলা আহার করিয়া থাকে মাত্র। যাত্রীদিগের কার্য্য করিয়া তাহারা বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

আ। দাস-দাসীগণ কোথায় রাত্রিবাস করে?

স। এই বাড়ীতেই। যে সকল যাত্রী প্রায় আমার এখানে আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আহারাদি করিয়া সায়ং-কালে প্রস্থান করেন। সুতরাং পাঁচ ছয়জনের বাসোপযোগী যথেষ্ট স্থান থাকে।

আ। এই যুবকের নাম কি জানেন?

স। আজ্ঞে হাঁ—যখন তিনি আমাকে ভাড়া দেন, তখন তাঁহাকে একখানি রসিদ দিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার

নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার নাম বগলাচরণ মিত্র। জাতিতে কায়স্থ। ভাল কথা, এতক্ষণ আমার স্মরণ ছিল না, ইহাঁর সঙ্গিনী কোথায় গেলেন ?

আ। সঙ্গিনী কে ?

স। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই বাবু সস্ত্রীক এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি গেলেন কোথায় ? ইতিপূর্ব্বেই আমার ঐ প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। যুবক যে সস্ত্রীক এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলি নাই। সে কথা আমার বেশ স্মরণ ছিল।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহার বয়স কত ?"

স। আন্দাজ সতের বৎসর। বেশ সুন্দরী। লোকজন সঙ্গে না লইয়া যোগে গঙ্গাস্নানের জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, এখন সেই রমণী কোথায় গেলেন ?

আ। এই হত্যাকাণ্ড বড় সামান্য ব্যাপার মনে করিবেন না। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে। যুবতী হয় পলায়ন করিয়াছে; নচেৎ কোন শত্রু কর্ত্তৃক কৌশলে অপহৃত হইয়াছে।

স। হত্যাকারী কি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইল, বুঝিতে পারিলাম না। কোন্ পথ দিয়াই বা সে রমণীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আপনি স্বয়ং দেখিয়াছিলেন যে, ঘরের দরজা ভিতর হইতে আবদ্ধ ছিল, আপনি স্বয়ংই দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।

আমি পূর্ব্বেই একথা ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথম হইতে আরম্ভ করাই কর্ত্তব্য। বিশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করিলে শেষে বিষম বিড়ম্বনায় পতিত হইতে হয়।

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমি ঘরের মেজে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম।

যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম, মেজের উপর তিন প্রকার পদচিহ্ন! ঘরে যখন দুইজনের অধিক লোক ছিল না, তখন তৃতীয় পদচিহ্ন কোথা হইতে আসিল?

ঘরের সকল স্থানে ধূলা ছিল না বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ধূলিময়। সেই স্থানে তিনপ্রকার পদচিহ্ন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। হতব্যক্তির পদচিহ্ন আমি চিনিতে পারিলাম। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র পদচিহ্নকে তাঁহার সঙ্গিনীর বলিয়া বোধ হইল। এই দুই প্রকার পদচিহ্ন ভিন্ন আর এক প্রকার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেগুলি হতব্যক্তির পদচিহ্ন অপেক্ষা কিছু বড় ও স্থূল। এ চিহ্ন কোথা হইতে আসিল? ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে ঘরে ঐ দুইজন ভিন্ন আর কোন লোক ছিল না। রমণীই বা কোথায় গেল? তবে কি সেই স্বামীকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে? কি করিয়াই বা সে গৃহ হইতে পলায়ন করিবে? যখন ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, তখন সে পথ দিয়া যে কেহ বাহির হয় নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তবে কোন্ পথে হত্যাকারী পলায়ন করিয়াছে. দেখিতে হইবে।

আগেই বলিয়াছি, ঘরটীতে দুইটী জানালা ছিল। এই দারুণ শীতে ঘরের জানালা খুলিয়া কেহ শয়ন করে না। ইহাঁরাই বা একটী জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন, জানিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি তখন আস্তে আস্তে খোলা জানালাটীর নিকট গমন করিলাম, যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, হত্যাকারী সেই পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

দেখিলাম, জানালার একটী গরাদে আল্‌গা। ইচ্ছা করিলে সেটীকে খোলা যায়, এবং তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে একজন লোক বাহির হইয়া যাইতে পারে। একগাছি দৃঢ়রজ্জু সেই জানালায় বাঁধা ছিল। দড়িগাছটী সাধারণ নহে, ইহার মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দেওয়া ছিল। এই রজ্জু অবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই বাহির হইতে কোন লোক ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। হত-ব্যক্তির পদচিহ্ন অপেক্ষা বৃহদাকার পদচিহ্নগুলি যে তাহারই, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। কারণ সেইরূপ অনেকগুলি চিহ্ন জানালার নিকটে দেখিতে পাইলাম। তাহাদের কতকগুলি ঘরের ভিতরে আসিবার, অপরগুলি ঘর হইতে বাহিরে যাইবার। সেই সকল চিহ্নের নিকট রমণীরও কতকগুলি পদচিহ্ন রহিয়াছে দেখি-লাম। দেখিলাম, রমণীও সেই পথে বাহির হইয়া গিয়াছে।

বাড়ীখানি দ্বিতল বটে কিন্তু অতি পুরাতন। আজ কাল একতলা বাড়ী যত উচ্চ হয়, এই দ্বিতল বাড়ীখানিও প্রায় সেইরূপ উচ্চ। সুতরাং সেই ঘর হইতে সেই রজ্জুর সিঁড়ির সাহায্যে যে কোন লোক অনায়াসে বাহির হইতে পারে।

জানালার পার্শ্বেই বাগান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাড়ীর দুই-পার্শ্বে দুইখানি বাগান ছিল। দড়িগাছটী জানালা হইতে সেই বাগান স্পর্শ করিয়াছিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, আমি বিবেচনা করিলাম যে, হত্যাকারী বাবুটীকে হত্যা করিয়া, তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া সেই রজ্জুর সাহায্যে বাড়ীর পার্শ্বস্থ বাগানে উপস্থিত হয়। পরে সেখান হইতে কোনরূপে পলায়ন করিয়াছে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বাগান-খানিও কি আপনার?"

বৃদ্ধ সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করিলেন। আমি একবার সেই বাগানে গিয়া তত্রত্য স্থানগুলি পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলাম। বৃদ্ধ আমাকে বাগানে লইয়া গেলেন। অপর আর একজন কর্ম্মচারী সেই ঘরের সম্মুখে রহিল।

বাগানে গিয়া দেখিলাম, তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। বাগানে অনেকগুলি ফলের বৃক্ষ আছে বটে, কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা বড় ভাল নহে। মধ্যে একটা পুষ্করিণী ছিল, তাহার ঘাট ও সিড়িগুলির অবস্থা আরও ভয়ানক। পুষ্করিণীতে অতি সামান্যই জল ছিল; কিন্তু তাহাও অব্যবহার্য্য।

বাগানের চারিদিকে রাংচিত্রের বেড়া। কিন্তু তাহাও মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাগান হইতে পলায়ন করা কিছুমাত্র কষ্টকর নহে।

বাগানের চারিদিক একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া আমি সেই জানালার নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দড়িগাছটী সেই জানালা হইতে বাগানের ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। সেই দড়ির মূলদেশে অনেকগুলি পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। হতব্যক্তি ও তাঁহার স্ত্রীর পদচিহ্ন ভিন্ন আর যে প্রকার পদচিহ্ন ঘরের ভিতর দেখিতে পাইয়াছিলাম, বাগানেও সেই প্রকার পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেই চিহ্নগুলি যে হত্যাকারীর পায়ের, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। হতব্যক্তির স্ত্রীরও পদচিহ্ন বাগানে রহিয়াছে। যদি সে স্বইচ্ছায় হত্যাকারীর সহিত না যাইত, তাহা হইলে বাগানে তাহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। রমণী যে এই হত্যাকাণ্ডের ভিতর আছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না।

জানালায় দড়ি দেখিয়া এবং হতব্যক্তি ও তাঁহার স্ত্রীর পদচিহ্ন ভিন্ন আর একপ্রকার পদচিহ্ন দেখিয়া, আমি বুঝিলাম, হত্যাকারী নিশ্চয়ই সেই জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। যদি হত-ব্যক্তির স্ত্রী তাহাকে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে সে চীৎকার করিয়া বাড়ীর অপর সকলকে জাগ্রত করিতে পারিত। সেই বাড়ীর অপরাপর যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, বাড়ীর আর কেহ রাত্রে সেই ঘর হইতে কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পায় নাই। সুতরাং সেই রমণীই হত্যাকারীর সহায়। যদি তাহাকে কেহ বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই চীৎকার করিত। যদি কেহ কোন কৌশলে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে জানালার নিকট ও বাগানে তাহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইতাম না।

এই স্থির করিয়া আমি পুনরায় হতব্যক্তির নিকট আগমন করিলাম। বৃদ্ধও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া আমি হতব্যক্তির আস্‌বাবগুলি পরীক্ষা করিলাম। অগ্রে তাঁহার কাপড় জামাগুলি দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। দুই একটা রক্তের চিহ্ন ছাড়া তাঁহার পোষাকে আর কিছু নূতনত্ব ছিল না।

কাপড়গুলি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ট্রাঙ্ক দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। কিন্তু উহার চাবী পাওয়া গেল না। অগত্যা ট্রাঙ্কটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, তাহার মধ্যে দুইখানি শাড়ী, একখানি নূতন গামছা, কয়েকখানা চিঠীর কাগজ, দশ-বারখান খাম ও টিকিট এবং একটা ছোট ক্যাস-বাক্স। ক্যাস-বাক্সটী খোলাই ছিল; দেখিলাম, তাহার ভিতরে একটী পয়সাও নাই।

বাবুটী যখন স্বদেশ স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া তীর্থে স্নানের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন তিনি যে শূন্যহস্তে আসেন নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহার অর্থ কোথায় গেল? বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, রমণীর গাত্রে খানকয়েক অলঙ্কার ছিল, বাবুটীর ঘড়ী চেন ও আংটী ছিল, সে সকলই বা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই সেই রমণী সমস্ত লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

হতব্যক্তির জিনিষ-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া আমি ঘরের চারিদিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবার পর ঘরের একটী কোনে একটী বাতির দগ্ধাবশিষ্ট ও কয়েকটা অর্দ্ধদগ্ধ দিয়াসালাইএর কাটী দেখিতে পাইলাম। তাহারই নিকটে কয়েকখানি পোড়া কাগজ দেখিলাম। কাগজগুলি অতি সন্তর্পণে তুলিয়া লইয়া জানালার নিকট গমন করিলাম ও সেগুলি বিশেষরূপে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না; তবে বুঝিতে পারিলাম, কোন যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে উহার কতক অংশ পড়া যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ আমার কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং আমাকে বারম্বার নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তখন ব্রাহ্মণের কোন কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। বলিলাম, "এখন আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না; শীঘ্রই এই রহস্য ভেদ করিব। তখন সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিবেন। তবে এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখুন যে, যে রমণী এই ব্যক্তির সহিত এখানে আসিয়াছিলেন, যাহাকে আপনি হতব্যক্তির স্ত্রী বলিয়া জানেন, তিনি বড় সামান্য রমণী নহেন। তিনি হয় স্বয়ং

নতুবা অপর কোন লোকের সাহায্যে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, “বলেন কি, মহাশয়! রমণীর বয়স অধিক নহে, তাহাকে বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার দ্বারা যে এই ভয়ানক কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা আমার ধারণাই হয় না।”

আমি বৃদ্ধের কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া তৎক্ষণাৎ মৃতদেহ সরকারি ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার্থে পাঠাইয়া দিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সকল কার্য্যে একটা বাজিয়া গেল। যে ঘর বগলাচরণ ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বের ঘরে একজন পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন। শুনিলাম, তিনি গত রাত্রিতে কালীঘাটে পঁহুছিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আরও জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার সহিত বগলাচরণের সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনিও স্ত্রী, বৃদ্ধা জননী ও বিধবা ভগিনী লইয়া যোগে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন। বগলাচরণের ঘরের ঠিক পার্শ্বের ঘরে ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগের সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। মৃতদেহ সেই স্থান হইতে স্থানান্তরিত

হইবার পর তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। তিনি আসিবা মাত্র আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তাঁহাকে ডাকিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম।

ব্রাহ্মণ তদনুসারে তাঁহাকে সেইখানে ডাকিয়া আনিলেন। আমাকে পুলিসকর্ম্মচারী জানিয়া প্রথমতঃ তাঁহার ভয় হইল। তিনি তখনই সেখান হইতে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বলিলাম, "মহাশয়! আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়েই আপনাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম।"

তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম?"

তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিলেন, "আমার নাম সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

আ। নিবাস?

সু। পলাশবাড়ী, ঢাকা।

বৃদ্ধব্রাহ্মণ আমার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন মহাশয়! পলাশবাড়ী?"

সু। আজ্ঞে হাঁ, কেন বলুন দেখি, আপনি আমার কথায় এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন?

বৃ। এই ঘরে যে ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারও বাড়ী ঐ গ্রামে। আমার বোধ হয়, তিনি আপনার পরিচিত।

সুধীর বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুটার নাম কি?"

বৃদ্ধ সাগ্রহে উত্তর দিলেন, "বগলাচরণ মিত্র।"

সুধীরবাবু স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "বগলাচরণ খুন

হইয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! তিনি যে সম্প্রতি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন।"

বৃ। তবে কি তাঁহার সঙ্গে যে রমণী এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী নয়?

সু। আজ্ঞে না।

বৃ। আমিও পূর্ব্বে সেইরূপ মনে করিয়াছিলাম।

আমি তখন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ঐ প্রকার সন্দেহের কারণ কি?"

বৃ। যুবকের বয়সের সহিত তাঁহার স্ত্রীর বয়সের অনেক প্রভেদ, যুবকের বয়স চল্লিশ বৎসর, কিন্তু যুবতীর বয়স সতের বৎসরের অধিক নহে। তাই মনে করিয়াছিলাম, তিনি যুবকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

সুধীরবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি তাঁহার স্ত্রীও এখানে আসিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "হাঁ,—বগলাচরণের সহিত কি আপনার সদ্ভাব ছিল?"

সুধীর বাবু সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। বলিলেন, "আমাদের উভয়েরই বাড়ী এক পাড়ায়। সদ্ভাব না থাকাই আশ্চর্য্য।"

আমি এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলাম। এতক্ষণে একটা সূত্র পাইলাম মনে করিয়া, সুধীর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গত রাত্রে এই ঘর হইতে কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন?"

সু। আজ্ঞে না। আমরা সকলেই পথশ্রমে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, রাত্রিতে সামান্য মাত্র জলযোগ করিয়া বিশ্রাম

করিয়াছিলাম। আজ প্রাতে যখন বাড়ীওয়ালার চীৎকার শব্দ শুনিতে পাই, তখনই আমার মনে কেমন এক প্রকার সন্দেহ হয়। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য এই ভয়ানক কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর আসিয়াছি, তাহাতেই মনঃসংযোগ করিলাম। গতরাত্রে যখন কালীঘাটে উপনীত হই, তখন মহামায়ীর দরজা বন্ধ ছিল। কাল রাত্রে আর দর্শন হয় নাই, সেইজন্য আজ শয্যাত্যাগ করিয়াই মায়ের মন্দিরে গমন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখনও মায়ের দ্বার খোলা হয় নাই। কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পর মন্দিরের দরজা খোলা হইল, আমি মায়ের চরণ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম।

আ। বগলাচরণের শ্বশুর-বাড়ী কোথায় জানেন ?

স্থ। প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ী আমাদেরই গ্রামে। দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরবাড়ী কলিকাতা হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে—গ্রামে।

আ। কতদিন পূর্ব্বে বগলাচরণ দেশ হইতে রওনা হইয়াছেন ?

স্থ। প্রায় দশ দিন।

আ। আপনাদের গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিতে কত দিন লাগে ?

স্থ। তিন দিন মাত্র; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিলে দুই দিনেও আসা যায়। তবে তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে।

আ। শুনিলাম, বগলাচরণও গত কল্য বেলা চারি পাঁচটার সময় এখানে পঁহুছিয়া ছিলেন, যদি তিনি দশদিন পূর্ব্বে আপনাদের গ্রাম হইতে রওনা হইয়া থাকেন, তবে তিনি এতদিন ছিলেন কোথায় ?

স্থ। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীতে থাকাই সম্ভব।

আ। কেমন করিয়া জানিলেন ?

সু। যখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে ছিল, তখন তিনি নিশ্চয়ই শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়াছিলেন। কারণ দেশে তাঁহার স্ত্রী ছিল না। তিনি একাই সেখান হইতে আসিয়াছিলেন।

আ। তাঁহার এই স্ত্রী কি আপনাদের দেশে যায় নাই ?

সু। হাঁ গিয়াছিল বই কি। কিন্তু সেখানে অধিক দিন ছিল না।

আ। কতবার সেখানে গিয়াছিল ?

সু। দুইবার মাত্র। কিন্তু বোধ হয়, প্রতিবারে এক মাসের অধিক ছিল না।

আ। কতদিন হইল বগলাচরণ এই বিবাহ করিয়াছেন ?

সু। দুই বৎসর মাত্র।

আ। শুনিলাম, তাঁহার স্ত্রীর বয়স প্রায় সতের বৎসর। যদি দুই বৎসর আগে তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বগলা-চরণ পনের বৎসরের এক যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ?

সু। আপনার অনুমান যথার্থ। দেশে তাঁহার এই স্ত্রীকে দেখিয়া, অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

আ। তাঁহার চরিত্র কেমন শুনিয়াছেন ?

সু। যাহা শুনিয়াছি, তাহা বড় ভয়ানক। শুনিয়াছি, তাহার দোষের জন্য তাঁহার পিতার মুখ দেখাইবার যো ছিল না। কন্যার বিবাহ হইয়া গেলে পাড়ার অনেকেই অনেক প্রকার উপহাস করিয়াছিল।

আ। সে সকল কথা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?

সু। আমি স্বয়ং বরযাত্রী হইয়া ঐ গ্রামে আসিয়াছিলাম। পল্লীর লোকদিগের উপহাস শুনিয়া আমরা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া-

ছিলাম। তাঁহারা তখন যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা আমি মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিব না।

আ। কেন? এমন কি কথা যাহা আপনি আমার সাক্ষাতে বলিতে পারিবেন না।

সু। সে সকল অশ্লীলভাষা ভদ্রসন্তানের বক্তব্য নহে। তবে আপনি এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখুন যে, বগলাচরণের স্ত্রীর চরিত্র অতি জঘন্য।

"আমিও সেইরূপ মনে করিয়াছি।" এই বলিয়া আমি সুধীর বাবুকে সঙ্গে লইয়া সেই সময় সেই মৃতদেহ যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে গমন করিলাম। তিনি মৃতদেহ দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বগলাচরণের ঘরে যে সকল দগ্ধ কাগজ পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি একত্র করিয়া আমি পকেটে রাখিলাম এবং ঘর বন্ধ করিয়া কনষ্টেবলকে সেখানে রাখিয়া, আমি ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইলাম। আসিবার সময় ব্রাহ্মণ আমার হাতে ধরিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। আমিও তাঁহাকে বিনীতভাবে সান্ত্বনা করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

যখন থানায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা প্রায় তিনটা। বলা বাহুল্য, তখনও পর্য্যন্ত আমার আহার হয় নাই। কাপড় ছাড়িয়া অগ্রে আহার করিলাম, পরে সেই দগ্ধকাগজগুলি লইয়া, পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে সরকারি ডাক্তারের রিপোর্ট আসিল। রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিলাম, ছোরাখানি বগলাচরণের হৃদয় ও ফুস্ ফুস্ ভেদ করিয়াছিল। বগলাচরণ সেই এক আঘাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আঘাত এত জোরে হইয়াছিল যে, ছোরাখানি বক্ষ ভেদ করিয়া একেবারে হৃদয়ে গিয়া স্পর্শ করিয়াছিল। এক সামান্য রমণীর দ্বারা সেইরূপ আঘাতের সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয়ই কোন পুরুষ বগলাচরণকে হত্যা করিয়াছে। সে কে? রমণী যে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং সে যে রমণীর পরিচিত, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এমন লোক কে? নিশ্চয়ই সে রমণীর উপপতি। কিন্তু সে বগলাচরণকে হত্যা করিল কেন? উপপতি হইলেই যে রমণীর স্বামীকে হত্যা করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ, যখন সেই রমণী শ্বশুরালয়ে যাইত না, তখন তাহার স্বামী থাকিতেও তাহার উপপতির বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না। তবে সে কেন বগলাচরণকে হত্যা করিল? এ রহস্য বড়ই অদ্ভুত।

কনষ্টেবলকে বিদায় দিয়া, আমি সেই অর্দ্ধদগ্ধ কাগজগুলি পরীক্ষা করিলাম। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক কষ্টে কিছু কিছু পড়িতে পারিলাম। যাহা বুঝিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, রমণীই এই হত্যাকাণ্ডের মূল।

সর্ব্বশুদ্ধ দুইখানি কাগজ ছিল। একখানির লেখা একেবারে

পুড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহা আর পড়িতে পরিলাম না। অপর খানির অর্দ্ধেকটা পুড়িয়াছিল, অবশিষ্টাংশ অতি কষ্টে পড়িলাম। পত্রগুলি যে রমণীর উপপতি বা হত্যাকারীর লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না।

যে অংশ পাঠ করিতে পারিলাম, তাহাতে লেখা ছিল।—

• • • • • বাসা আমার জানা আছে,

• • • • • ধারের ঘর ভাড়া পাইয়া

• • • • • ভালই হইয়াছে। আর

• • • • • আজই রাত্রি একটার সময়

• • • • • হইবে। আমি প্রস্তুত হইয়া

• • • • • নি তুমি আমায় দিয়াছিলে,

• • • • • উদ্ধার হইবে। ছোরাখানি

• • • • • কিন্তু তুমি যাহা বলিয়াছ,

• • • • • কারণ যদি টাকা না পাওয়া

• • • • • থ্যা নরহত্যা করিয়া লাভ

• • • • • শুর বাড়ী ঘর করিবে না।

• • • • • • হানি হইবে না। একগাছি

• • • • • • • খুব গোপনে রাখিবে।

• • • • • • • • ঘুমাইলে দড়ি

• • • • • • • • দিকে ঝুলাইয়া

• • • • • • • • • • ঘরে যাইব,

• • • • • • • • • • ভুলিও না,

• • • • • • • • • • • • • তোমার

• • • • • • • • • • • • • সুধাংশু

পত্রাংশ পাঠ করিয়া আমি অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিয়া অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইব, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ভাবিয়াও কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না।

পত্রখানির দগ্ধাবশিষ্ট অংশ বারবার পাঠ করিলাম। ভাবিলাম, এই সুধাংশুই যে বগলাচরণকে হত্যা করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় কোথা? সুধীর বাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে সেই রমণীর পিত্রালয়—গ্রামে বলিয়াই বুঝিয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রাম একটু সামান্য স্থান নয়। বিশেষতঃ যখন সেই রমণীর নাম আমার জানা নাই, তখন তাহার সন্ধান কিরূপে হইতে পারে? স্ত্রীলোকের নাম জানিলেও সহজে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করা অসম্ভব। এ স্থলে তাহার যখন নামই জানা নাই, তখন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব।

তাহার পর মনে করিলাম, যেখানে সেই রমণীর বাসস্থান, সুধাংশু বাবুও যে সেই স্থানে বাস করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পত্রের ভাব দেখিয়া বোঝা যায়, তাহাদের এই অবৈধ প্রণয় এক আধ দিনের নহে—বহুদিন হইতে তাহারা এই ব্যাপারে লিপ্ত আছে। যদি সুধাংশুর বাসস্থান এই রমণীর বাড়ী হইতে অধিক দূরে হইত, তাহা হইলে তাহাদের এই প্রণয়ব্যাপার কোন না কোন লোকের কর্ণগোচর হইত—তাহারা এত সাহসের সহিত এই ভয়ানক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত না।

এইরূপ স্থির করিয়া আর একবার সুধীর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। বেলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, সূর্য্যদেব

পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আর সে তেজ, সে উগ্রমূর্ত্তি নাই। পক্ষী সকল আপন আপন বাসায় ফিরিতেছে। আমি আর কালবিলম্ব করিলাম না; তখনই সুধীর বাবুর বাসায় গমন করিলাম। সুধীর বাবু তখন সেখানে ছিলেন না, আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন।

শীতকাল না হইলেও বেশ শীত পড়িয়াছে। বেলাও ছোট হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, রাত্রি আটটার সময় মহামায়ার আরতি হইয়া থাকে। রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা। আরও এক ঘণ্টা কি করিয়া অতিবাহিত করিব, স্থির করিতে পারিলাম না।

আমি সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর সুধীর বাবু সপরিবারে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়! হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "শীঘ্রই পাইবার আশা করি। এখন আপনার নিকট দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

সুধীর বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, "আমার নিকট! এমন কি কথা আপনি জানিতে চান্ বলুন, জানিলে আমি অবশ্যই বলিব।"

আমি বলিলাম, "আপনি তখন বলিয়াছিলেন যে, আপনি বগলাচরণের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরবাড়ী জানেন। কোনরূপে আমাকে বাড়ীটী দেখাইয়া দিতে পারেন?"

সুধীর বাবু উত্তর করিলেন, "যদি আমার কার্য্যের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে আমি অনায়াসে আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি। কাল যোগ, যে কার্য্যের জন্য সাত সমুদ্র

তের নদী পার হইয়া এখানে আসিয়াছি, অগ্রে সে কার্য্য সমাধা করিয়া, মহামায়ার পূজা দিয়া, আহারাদির পর আপনার সহিত যাইতে পারি।”

আমাকে বাধ্য হইয়া যোগের দিন অপেক্ষা করিতে হইল। যোগের পরদিবস সুধীর বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমি সেই গ্রামে গমন করিলাম। সুধীর বাবু আমাকে বগলাচরণের শ্বশুর-বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, কয়েকদিবস পূর্ব্বে বগলাচরণ সেই স্থানে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীতে কয়েকদিবস থাকিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কালীঘাট গিয়াছেন। সেই স্থানে যোগে স্নান করিয়া পরিশেষে স্ত্রীকে লইয়া আপন দেশে গমন করিবেন।

সেই গ্রামে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া আরও জানিতে পারিলাম যে, বগলাচরণের স্ত্রী অতিশয় দুশ্চরিত্রা, তাহার চরিত্রের কথা ঐ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অবগত আছেন।

সুধাংশু নামক একটী দুশ্চরিত্র যুবকের সহিত তাহার কিছু প্রণয় অধিক। উভয়ে উভয়ের জন্য একরকম পাগল বলিলেও হয়। আরও জানিতে পারিলাম, যেদিন হইতে বগলাচরণ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেইদিন হইতে সুধাংশুশেখরকে সেই গ্রামে আর কেহ দেখে নাই।

এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আমার মনে আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, বগলাচরণের হত্যাকারী তাহার আপন স্ত্রী ও সুধাংশুশেখর, অপর কেহই নহে। এখন উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই এই মকদ্দমার কিনারা হইতে আর বাকী থাকিবে না। এখন কিরূপ উপায়ে

উহাদিগকে ধরিতে পারিব, মনে মনে তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমার মনে হইল, এরূপ অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকটীকে লইয়া সুধাংশুর কলিকাতায় থাকাই খুব সম্ভাবনা; কারণ এরূপ অবস্থায় কলিকাতায় লুকাইয়া থাকা যেরূপ সহজ, এরূপ আর কোন স্থানে নহে। কারণ এখানে একব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোনরূপ সন্ধানই রাখে না, ও রাখিবার চেষ্টাও করে না; সকলেই আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া উহাদিগের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমি কলিকাতায় আগমন করিলাম।

কলিকাতার সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ বদমায়েসের উপপত্নীর একটী পাকা বাড়ীতে কোথা হইতে একজন একটী স্ত্রীলোককে লইয়া আসিয়াছে ও তাহাকে উপরের একখানি ঘরে রাখিয়াছে। সেই ঘরের দরজা প্রায়ই খোলা হয় না. ও অপর কোন বক্তি তাহাদিগকে দেখিতেও পায় না। ঐ বাড়ীর উপরে কেবল মাত্র দুইখানি ঘর, তাহার একখানিতে সেই বদমায়েসের উপপত্নী বাস করে, অপরখানিতে আগন্তুকেরা বাস করিতেছে। নিচের ঘরে কোন লোক থাকে না, উহা রন্ধনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ বাড়ীর ভিতর লোক পাঠাইয়া আগন্তুকদিগের সন্ধান লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

একবার ভাবিলাম, প্রকাশ্যভাবে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, উহাতে কাহারা বাস করিতেছে। আবার ভাবিলাম, যাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিব, সে নিজে বদমায়েস, তাহার বাড়ীতে

প্রবেশ করিয়া যদি কাহাকেও না পাই, তাহা হইলে পরিশেষে সে নানারূপ গোলযোগ করিতে পারে। আর যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ঐ বাড়ী অনুসন্ধান করিবার ওয়ারেণ্ট লইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে সে কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে; একবার যদি সে কোনরূপে উহা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কোনরূপেই ধরা যাইবে না।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার একটী উপায় স্থির করিলাম। ভাবিলাম, ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে পরিণামে যাহাই হউক, প্রকাশ্য ভাবে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, অপর একজন পুলিস-কর্ম্মচারীর সাহায্যে একটী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও চালাক বারবনিতার যোগাড় করিলাম। তাহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলাম। সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাহাকে লইয়া আমি ছদ্মবেশে একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সেই বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কয়েকজন কনষ্টেবলকে ঐ বাড়ীর সন্নিকটে এরূপভাবে লুকাইত ভাবে অবস্থান করিতে কহিলাম, যেন আবশ্যক হইলে তাহারা আমার সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া গিয়াছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া আমি সেই বাড়ীর দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। আমাকে অপরিচিত লোক দেখিয়া সেই বদমায়েস আমার নিকট দৌড়িয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি মনে করিয়া মহাশয়?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। একজন যুবতীকে তাহার পিত্রালয় হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু এই রাত্রে কোথাও বাসোপযোগী স্থান পাইতেছি না। যদি একটু স্থান দাও, তাহা হইলে আজিকার রাত্রি কোনরূপে অতিবাহিত করিতে পারি। পূর্ব্বে জানা থাকিলে অগ্রেই বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিতে পারিতাম। কিন্তু রমণী যে আজই আমার সঙ্গে আসিবে, তাহা আমার জানা ছিল না।"

আমার কথা শুনিয়া সে হাসিয়া উত্তর করিল, "যদি একরাত্রি থাকা হয়, তাহা হইলে দশ টাকার কমে হইবে না।"

আ। রমণীর বাসোপযোগী স্থান আছে ত?

ব। নিশ্চয়ই আছে। নতুবা এত টাকা চাহিব কেন আপনি স্বয়ং সেই ঘর দেখিয়া আসিবেন চলুন। কিন্তু সে ঘরে আরও একজন ভদ্রমহিলা আছে। দুইজনে একঘরে থাকিতে হইবে।

আ। সে ত উত্তম কথা। আমার পরম সৌভাগ্য যে, এখানে এখন আর একজন রমণী আছে। তবে চলুন, একবার ঘরটি দেখিয়া আসি।

ঠিক এই সময়ে সেখানে আর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "সে ঘরে অন্য কোন রমণীর স্থান হইবে না। যখন আমি অগ্রে টাকা দিয়াছি, তখন সে ঘর আমার। আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা অপর লোককে সে ঘরে রাখিতেছ কেন?"

লোকটার কথা শুনিয়া সে হাসিয়া উঠিল। বলিল, সুধাংশু বাবু! তোমার জন্য কি আমরা লোকসান করিব। ইনিও আমাদিগকে এক রাত্রির জন্য দশ টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন।

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "দশ টাকা কেন, যদি আজ রাত্রি নিরাপদে অতিবাহিত করিতে পারি, যদি রমণীর বাড়ীর কোন লোক এখানে আসিয়া উৎপাত না করে, তাহা হইলে আমি ২০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলাম।"

আমার কথায় বাড়ীওয়ালা অত্যন্ত আনন্দিত হইল। বলিল, "আপনার কোন চিন্তা নাই। আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিব। এখান হইতে—এই বাঘের গহ্বর হইতে রমণীকে লইয়া যায়, কাহার সাধ্য? যখন আশ্রয় দিয়াছি, তখন আপনি নিঃসন্দেহে বাস করুন। কিন্তু টাকা—"

"অগ্রিম দিতে হইবে? বেশ কথা।" এই বলিয়া আমি তখনই পকেট হইতে দুই কেতা দশ টাকার নোট দিলাম। বাড়ীওয়ালা টাকা পাইয়া সুধাংশুর দিকে চাহিল। বলিল, সুধাংশু বাবু! দুইজনই স্ত্রীলোক। ইহাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হইবে না, অথচ আমারও এক রাত্রির জন্য কিছু লাভ হইবে।"

সুধাংশু আর কোন কথা কহিল না। বাড়ীওয়ালা আমাকে সেই ঘর দেখাইয়া দিল। আমি সেখানে গিয়া দেখি, এক অতি সুন্দরী যুবতী সেই ঘরে বসিয়া আছে।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুও গিয়াছিল। সে রমণীকে বলিল, তোমার আর এক সঙ্গিনী আসিয়াছে। বাড়ীওয়ালার ইচ্ছা, আজ রাত্রে তোমারা উভয়েই এই ঘরে থাক। যেরূপ দেখিতেছি,আমাদিগকে কালই এখান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে।

রমণী শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়? পিত্রালয় কিম্বা পলাসবাড়ী ছাড়া আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে, আমি সেই-খানেই যাইব।"

সুধাংশু হাসিয়া উঠিল। বলিল, "না না, তোমাকে আর বগলাচরণের বাড়ীতে যাইতে হইবে না। বিশেষতঃ, যখন তোমার স্বামী মরিয়া গিয়াছে, তখন আর সে ভয় কেন?"

রমণী শান্ত হইল। আমি ঘরটি দেখিয়া পুনরায় বাহিরে আসিলাম এবং গাড়ীর ভিতর হইতে যুবতীকে হাত ধরিয়া নামাইয়া পুনরায় সেই ঘরে গমন করিলাম। আমার সঙ্গিনী অতি চতুরা, সে যেভাবে কার্য্য করিতে লাগিল, তাহাতে সকলেই আমার কথায় বিশ্বাস করিল, কোন প্রকার সন্দেহ করিল না।

রমণীকে সেই ঘরে রাখিয়া আমি একবার বাড়ীটার চারিদিক লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, দুইজন রমণী ও সুধাংশু, বাড়ীওয়ালা ও তাহার উপপত্নী ভিন্ন আর কোন লোক সেই স্থানে নাই।

বাহিরে যে সকল কর্ম্মচারী আমার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, আমার সঙ্কেত পাইবামাত্র তাহারা সকলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ও সেই স্বামীঘাতিনী রমণী ধৃত হইল।

উহাদিগের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ হইল, তাহাতে তাহারা বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইল না, উভয়েই চিরদিনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইল।

যে যে ব্যক্তি আমাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্তরূপে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 185. দারোগার দপ্তর, ১৮৫ সংখ্যা

গোঁসাই ঠাকুর।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [ভাদ্র।

গোঁসাই ঠাকুর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পৌষ মাস। বড়দিনের ছুটী হইয়া গিয়াছে। স্কুল, কলেজ, অফিস সমস্তই বড়দিন উপলক্ষে বন্ধ হইয়াছে। দীর্ঘ অবকাশ পাইয়া স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ দেশ-দেশান্তর হইতে কলিকাতায় তামাসা দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছে।

আমারও কাজকর্ম্ম কমিয়া গিয়াছে। তবে আমার অবকাশ অতি অল্প। দৈনিক কার্য্যগুলি না করিলে আর আমার অব্যাহতি নাই।

এই সময় একদিন প্রাতঃকালে আমি থানার অফিস-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা টুং টুং করিয়া বাজিয়া উঠিল। নিকটে কেহ না থাকায় আমিই যন্ত্রের নিকট যাইলাম। শুনিলাম, বড় সাহেব বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য আমায় তলব করিয়াছেন। আমিও যত শীঘ্র সম্ভব, সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম।

সাহেব আমারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিবা মাত্র সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "হাড়কাটা গলিতে একটা খুন হইয়াছে। আপনাকে এখনই তাহার তদন্তে যাইতে হইবে।"

সাহেবের কথা শুনিয়া আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম ও এক কোয়ার্টারের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম; এবং যে বাড়ীতে খুন হইয়াছে, সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাড়ীখানি দ্বিতল কিন্তু ক্ষুদ্র। দেখিলাম, স্থানীয় পুলিসের দারোগাও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। তিনি আমাকে উপরে লইয়া গেলেল। উপরে দুইটী ঘর। একটী ঘর বাহির হইতে আবদ্ধ ছিল, তিনি পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সেই ঘরটী খুলিয়া দিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ঘরের মেঝে রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে, একজন বৃদ্ধ উপুড় হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ড ছোরার আঘাত চিহ্ন; সেই ক্ষতমুখ হইতে তখনও অল্প অল্প রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল।

দেহের অবস্থা দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, বৃদ্ধ অনেক পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তথাপি কালবিলম্ব না করিয়া একজন ডাক্তারকে তথায় আনিতে আদেশ করিলাম। একজন কর্ম্মচারী চলিয়া গেল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই একজন ডাক্তার সঙ্গে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল।

ডাক্তার বাবু আমার পরিচিত। তিনি আসিবামাত্র আমি অতি সমাদরে তাঁহাকে সেই গৃহে লইয়া গেলাম। তিনি বৃদ্ধের দেহের নিকট গমন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে পরীক্ষা করিলেন। পরে বলিলেন, "প্রায় ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে এই ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, কোন শাণিত ছোরা দ্বারাই ইনি আহত হইয়াছেন। পৃষ্ঠের যে অংশে আঘাত করা হইয়াছে, তাহাতে ইনি যে আত্মহত্যা করিয়া-

ছেন, এরূপ বোধ হয় না। ইহার গলায় অঙ্গুলির দাগ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, কোন লোক ইহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। যেরূপভাবে দাগগুলি দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পাছে ইনি চীৎকার করিয়া সকলকে জাগ্রত করেন, এই ভয়েই ইহার গলা চাপিয়া ধরা হইয়াছিল। যে ছোরা দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে, তাহার দুই দিকে ধার। আঘাতও এত জোরে করা হইয়াছিল যে, ছোরাখানি বৃদ্ধের হৃদয় ও ফুস্‌ফুস ভেদ করিয়াছে। সুতরাং ইহার মৃত্যুও যে ঠিক সেই সময়েই হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লাস পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বাবু প্রস্থান করিলেন। আমি তখন বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ লাস কার? ইনিই কি তোমার প্রভু?"

বেহারা অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, ইনিই আমার মনিব।"

আ। এ বাড়ীতে আর কেহ থাকে?

বে। ইহাঁর এক কন্যা ছাড়া আর কেহ থাকে না।

আ। কোথায় সে?

বে। বলিতে পারি না।

আ। তুমি কতদিন এখানে চাকরি করিতেছ?

বে। প্রায় এক বৎসর।

আ। তোমার প্রভু কি কাজ করিতেন জান?

বে। থিয়েটারে কি কর্ম্ম করিতেন।

আ। কন্যাটীর বিবাহ হইয়াছে?

বেহারা ঈষৎ হাসিল। বলিল, "বিবাহ? আজ্ঞে না।"

বেহারার মুখের ভঙ্গী ও তাহার কথা শুনিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, বৃদ্ধের কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। যখন সে থিয়েটারে কার্য্য করে, তখন অনেক যুবকই এখানে আসিয়া থাকে, এই বিবেচনা করিয়া আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কোন বাবু আসিয়া থাকেন?"

বেহারা কিছুক্ষণ কোন উত্তর করিল না। পরে বলিল, "থিয়েটার রাত্রি ছাড়া প্রায় প্রতি রাত্রেই এক জমীদার বাবু এখানে আসিতেন। প্রায় এক সপ্তাহ হইল তিনি আর আসেন না।"

আ। কেন?

বে। সে কথা বলিতে পারি না।

আ। উভয়ের মধ্যে কি বিবাদ হইয়াছে?

বে। জানি না।

আ। জমীদার বাবুর নাম কি? তাঁহার নিবাস কোথায়?

বে। নাম মোহিতকুমার; বাড়ী হ্যারিসন রোডে।

আ। কন্যাটীর নাম কি?

বে। মালতী।

আ। মালতী কি বৃদ্ধের ঔরসজাত কন্যা?

বে। শুনিয়াছি, ইনি না কি মালতীকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিতেছেন। আপনার কন্যা হইলে ইনি কখনও তাঁহাকে থিয়েটারে কাজ করিতে অনুমতি দিতেন না।

আ। মোহিতকুমার কতদিন এখানে যাতায়াত করিতেছেন?

বে। প্রায় ছয় মাস হইবে। শুনিয়াছিলাম, তিনি না কি মালতীকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর কি হইল বলিতে পারি না।

আ। মোহিতকুমারের সহিত মালতীর কি তবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে?

বে। এখানে ত হয় নাই। যদি গোপনে আর কোথাও হইয়া থাকে, বলিতে পারি না।

আ। মালতী বৃদ্ধের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করে? উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব কেমন?

বে। সদ্ভাব বেশ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় উভয়ের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়া থাকিবে। পূর্ব্বে মালতীকে কখনও অবাধ্য হইতে দেখি নাই, কিম্বা বৃদ্ধের সহিত তর্ক করিতেও শুনি নাই। কিন্তু ইদানীং মালতী প্রায়ই বৃদ্ধের কথার উপর কথা কহিতেন, উভয়ের মধ্যে প্রায়ই বচসা হইত।

আ। গত রাত্রে আর কোন লোক এখানে আসিয়াছিল?

বে। না।

আ। কাল বুধবার গিয়াছে; থিয়েটার ছিল। কালও কি ইঁহারা থিয়েটারে গিয়াছিলেন?

বে। হাঁ। সন্ধ্যার কিছু পরেই বাবু আমাকে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিতে বলেন। গাড়ী আনিলে উভয়ে তাহাতে আরোহণ করেন এবং থিয়েটারে গমন করেন। বাড়ীতে আমি একাই ছিলাম। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমি বাবুকে দরজা খুলিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিলে আমি যখন দরজা বন্ধ করিতে যাই, তখন তিনি আমায় নিষেধ করেন। বলেন, মালতী এখনও আসে নাই, দরজা খোলাই থাকুক। এই বলিয়া বাবু উপরে গেলেন, আমিও দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম কিন্তু অর্গল বদ্ধ করিলাম না। বলা বাহুল্য, আমি তখন নিদ্রায়

বড়ই কাতর হইয়াছিলাম। সুতরাং বাড়ীর সদর দরজা ভেজাইয়া দিয়া খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িলাম এবং তখনই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম।

আ। মালতী কখন ফিরিয়া আসিয়াছিল?

বে। তিনি ত আর ফিরিয়া আসেন নাই।

আ। তুমি ত গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলে। মালতী আসিয়াছিল কি না, কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?

বে। তিনি আসিলে আমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম।

আ। তার পর।

বে। তার পর, আজ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া বাবুর চা প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করি। সেখানে গিয়া যাহা দেখি, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা উড়িয়া গিয়াছিল। গৃহের মধ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছিল, বৃদ্ধ উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। আমি গৃহ মধ্যস্থ কোন দ্রব্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া তখনই সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া থানায় খবর দিই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লাসটী পরীক্ষার নিমিত্ত যথাস্থানে প্রেরিত হইল। আমি বেহারাকে সঙ্গে লইয়া মোহিতকুমার ও মালতীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম।

মোহিতকুমারের বাসা জানিতাম না বলিয়া পদব্রজেই গমন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পার হইয়া একটী ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে কতকগুলি ভদ্রলোক দেখিতে পাইলাম। মোহিতকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন, "নিকটবর্ত্তী একখানি ত্রিতল বাটীতে তাঁহার বাসা।" সন্ধানে আরো জানিলাম, তিনি সত্য সত্যই পূর্ব্ববঙ্গের এক জমীদার-পুত্র। বাণিজ্য উপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন। তাঁহার বাসাতেই কাপড়ের গুদাম। সেখানে তিনি ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভিন্ন আর কোন লোক থাকে না। আমি আরও অগ্রসর হইলাম। মোহিতকুমারকে কাপড়ের ব্যবসায়ী জানিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলাম।

প্রায় এক কোয়াটারের পর মোহিতকুমারের বাসা পাইলাম। দেখিলাম, বাড়ীখানি সত্যই ত্রিতল। বাটীর সদর দরজা পার হইয়া দক্ষিণ দিকের একটী প্রকোষ্ঠে কয়েকজন ভদ্রলোককে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সাগ্রহে আমার অভ্যর্থনা করিলেন, পরে আমার অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম, "মোহিতকুমারের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। যদি তিনি এখানে থাকেন, একবার অনুগ্রহ করিয়া ডাকিয়া দিন, আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

আমার কথা শুনিয়া একটী ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন। আমার ইঙ্গিত মত বেহারা দূরে বাহিরে রহিল। দেখিলাম, বাড়ীটী ত্রিতল হইলেও ক্ষুদ্র। বোধ হয়, এককাঠা ভূমির উপর সেই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাড়ীতে স্ত্রীলোক

না থাকায় আমিও নিঃসঙ্কোচে উপরে উঠিলাম; এবং সেই ভদ্রলোকের সহিত এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, একটী সম্ভ্রান্ত যুবক একা সেই গৃহে বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতে-ছেন। আমাকে সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আমার সমভিব্যাহারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে হরিদাস?"

ভদ্রলোকটীর নাম হরিদাস। গলে যজ্ঞোপবীত থাকায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির প্রশ্ন শুনিয়া হরিদাস উত্তর করিল, "ইনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ইহারই নাম মোহিতকুমার বাবু। আমরা সকলেই ইহাঁর কর্ম্মচারী।" এই বলিয়া হরিদাস প্রস্থান করিলেন।

মোহিতকুমার আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। দেখি-লাম, ঘরটী দৈর্ঘে প্রস্থে প্রায় দশ হাত; ঘরের ভিতর ছয়টী জানালা ও একটী দরজা। আসবাবের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দেরাজ ও দুইটী আলমারি, একখানা বড় আয়না ও একটী ঘড়ী। চারিটী দেওয়ালে দশবারখানি হিন্দু-দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। দেরাজের উপর একটী সুন্দর আলোকাধার। ঘরের মেঝেয় ঢালা বিছানা। একটা তোষকের উপর একখানা সতরঞ্চ, তাহার উপর একখানি দুগ্ধফেননিভ চাদর পাতা ছিল। মোহিতকুমার সেই শয্যোপরি বসিয়া একখানি খাতা খুলিয়া কি হিসাব দেখিতে-ছিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধে সেই শয্যার উপর বসিয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে মোহিতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি? কি অভিপ্রায়েই বা এখানে আসা হইয়াছে?"

আমি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "আমার নাম বিমলাচরণ। পশ্চিম বঙ্গে আমার বাড়ী। কাপড়ের ব্যবসায় উপলক্ষে আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। মহাশয় অনেকদিন হইতে ঐ কার্য্য করিতেছেন শুনিয়া, ঐ বিষয়ে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।"

মোহিতকুমার অতি সজ্জন। আমাকে ব্যবসায়ী জানিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "কতদিন হইল আপনার এখানে আসা হইয়াছে?"

আ। প্রায় মাস খানেক হইবে।

মো। আপনার বাসা কোথায়?

আ। বড় বাজারে ঢাকাইপটীতে।

মো। আপনি কাপড়ের ব্যবসায় করিবেন? কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে আর তেমন লাভ নাই। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যেমন লাভ করিয়াছিলাম, গত বৎসরে তাহার অর্দ্ধেকও লাভ হয় নাই। তা বলিয়া মনে করিবেন না যে, আমি আপনাকে নিরুৎসাহ করিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে। যখন আপনি আমার নিকট পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন, তখন আমাকে সকল কথাই বলিতে হইবে।

আ। নিশ্চয়ই। আমি আপনার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। বিশেষতঃ আপনার সুখ্যাতি শুনিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। আপনার মুখে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিব বলিয়াই আমার এখানে আগমন।

বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। মোহিতকুমার যে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাও শেষ হইয়াছে। তিনি খাতা-পত্র বন্ধ করিয়া আমাকে কাপড়ের ব্যবসায় সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরামর্শ দিতেছিলেন। কোন্ কোন্ কোম্পানির নিকট হইতে কিরূপ ভাবে কাপড় পাওয়া যায়, তাহাদিগের টাকা দিবার নিয়মই বা কি, কোন্ দালালের সাহায্যে কোন্ কোম্পানির মাল পাওয়া যায়, এই সকল কথা তিনি আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন।

নানাপ্রকার পরামর্শ দিয়া তিনি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং শয়ন করিবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "আপনার কষ্ট হইতেছে, আজ আমি বিদায় হই, আর একদিন আসিয়া অপরাপর কথা জানিয়া লইব।"

মোহিতকুমার ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন। গতরাত্রে থিয়েটারে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় চারিটা বাজিয়াছিল। সুতরাং গত রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হয় নাই।"

থিয়েটারের নাম শুনিয়া আমি আন্তরিক আনন্দিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ থিয়েটারে গিয়াছিলেন। কাল বুধবার গিয়াছে। বুধবারে ভাল বিষয় হয় না। তদ্ভিন্ন আজ-কাল থিয়েটারে একপ্রকার নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি নাচ গান না হইলে আজ-কাল দর্শকগণের মনের তৃপ্তি হয় না। আপনি কোন্ থিয়েটারে গিয়াছিলেন?"

মো। ষ্টার থিয়েটারে।

আ। ষ্টার থিয়েটার? আজ-কাল সেখানে ভাল অভিনেত্রী কে? আমি বহুদিন পূর্ব্বে একরাত্রি ষ্টারে গিয়াছিলাম। সে দিন চৈতন্যলীলা অভিনয় হইয়াছিল। যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা এ জন্মে ভুলিতে পারিব না।

মো। সে সকল পালা আর আজ-কাল অভিনীত হয় না। এখন অন্যান্য পুস্তক অভিনীত হইয়া থাকে। আজ-কালকার বিখ্যাত অভিনেত্রীর নাম মালতী। তবে সে কোন নির্দ্দিষ্ট থিয়েটারের বেতনভোগী নহে। যেদিন যেখানে সুবিধা হয়, সেই দিন সেইখানেই অভিনয় করিয়া থাকে। মালতীর মত নর্ত্তকী, গায়িকা ও অভিনেত্রী, আজ কাল কলিকাতার মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মালতী যেদিন যেখানে থাকিবে, সেই দিন সেইখানেই অতিরিক্ত দর্শকবৃন্দের সমাগম হইবে।

আ। তবে তাহাকে কেহ বেতন দিয়া রাখে না কেন? যদি এক মালতী থাকিলেই দর্শকবৃন্দের হুড়াহুড়ী হয়, তবে লোকে তাহাকে একচেটিয়া করিয়া লয় না কেন?

মো। মালতী বেতনভোগী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। অনেকে তাহাকে দুইশত টাকা বেতন দিয়াও রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মালতী তাহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই।

আ। একরাত্রি অভিনয় করিতে সে কত টাকা লইয়া থাকে?

মো। পঞ্চাশ টাকার কম নহে।

আ। আর আমি যদি তাহার বাড়ী গিয়া নৃত্য-গীতাদি শুনিয়া আসি, তাহা হইলে আমাকে কত দিতে হইবে?

মোহিতকুমার হাস্য করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারও ঐ সকল স্থানে যাতায়াত আছে না কি?"

আমিও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "দেশ ছাড়িয়া, পরিবার ছাড়িয়া, যখন কলিকাতায় আসিয়াছি, তখন একটু-আধটু আমোদ না করিলে বাঁচিব কিরূপে? তবে অনর্থক অযথা ব্যয় করাও আমার অভিপ্রায় নহে।"

মো। বেশ কথা, আপনি আজ সন্ধ্যার পর এখানে আসিবেন। আপনাকে মালতীর গান শুনাইয়া আনিব।

আ। কিন্তু আমায় কত দিতে হইবে? সেখানে গিয়া যেন আমাকে অপ্রস্তুত হইতে না হয়।

মো। সে চিন্তা আপনাকে করিতে হইবে না, আপনাকে একটী পয়সাও দিতে হইবে না।

আ। তবে কি মালতীর সহিত আপনার আলাপ আছে? সেখানে যাতায়াত আছে?

মো। আলাপ আছে বই কি! অতবড় একটা অভিনেত্রী, রূপে গুণে সমান, তাহার সহিত সদ্ভাব না থাকিবে, তবে আর কাহার সহিত আলাপ থাকিবে? আপনি আজ সন্ধ্যার পর আসিবেন। আমার সহিত সেখানে যাইলেই বুঝিতে পারিবেন, আমার সহিত তাহার কেমন সদ্ভাব।

আর কোন কথা না বলিয়া আমি মোহিতকুমারের নিকট বিদায় লইয়া থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই পুনরায় ছদ্মবেশ ধারণ করিলাম এবং সন্ধ্যার পরই মোহিতকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমায় বসিতে বলিলেন।

আমি পূর্ব্বে যে ঘরে তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম, সেই ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে মোহিতকুমার আমার নিকট আগমন করিলেন। দেখিলাম, তিনি বিষণ্ণ। আমি স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর দেরি কেন? শুভস্য শীঘ্রং।"

মোহিতকুমার হাসিলেন বটে কিন্তু সে হাসি আমার বড় ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে মহাশয়! মালতী কোথায় চলিয়া গিয়াছে।"

সে কথা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। তত্রাপি যেন তাঁহার কথায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি মহাশয়! আপনার সঙ্গে তাহার এত আলাপ, এত সদ্ভাব, আর আপনাকে একটী কথাও না বলিয়া চলিয়া গেল? মালতীর বাড়ী কোথায়?"

মো। হাড়কাটা গলিতে।

আ। তাহার বাড়ীতে আর কে থাকে?

মো। তাহার পিতা! জন্মদাতা পিতা নহে, পালক পিতা।

আ। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

মো। তিনি কি আর আছেন? গতরাত্রে তাঁহাকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। বলিলাম, "সে কি! খুন! এই সহরের মধ্যে হাড়কাটা গলির মত জনাকীর্ণ স্থানে খুন! কে খুন করিল? যখন মালতী পলায়ন করিয়াছে, তখন লোকে তাহারই উপরে সন্দেহ করিবে। থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে?"

মো। সে কি আর এখনও বাকি আছে? বাড়ীতে একটা বেহারা ছিল, সেই থানায় সংবাদ দিয়াছিল। শুনিলাম, পুলিস না কি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আ। আমার বোধ হয় মালতীই খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আপনি অবশ্য মালতীর চরিত্র অবগত আছেন। আমি নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারি না। যদি মালতীর সহিত তাহার পালক পিতার বিবাদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মালতীই খুন করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মো। আপনার অনুমান কতকটা সত্য হইলেও হইতে পারে। মালতীর সহিত বৃদ্ধের বিবাদ চলিতেছিল বটে; কিন্তু স্ত্রীলোক হইয়া সে কেমন করিয়া একজন পুরুষকে হত্যা করিল বুঝিতে পারি না।

আ। সে নিজে স্বহস্তে খুন না করিতে পারে, অন্য কোন লোকের দ্বারা মালতী এ কার্য্য করিতে পারে।

মো। আর ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই। বেহারা বেটা না কি আমার নাম পর্য্যন্ত পুলিসের গোচর করিয়াছে। আমার সত্য সত্যই বড় ভয় হইয়াছে।

আ। মালতীর সহিত কি আপনার কাল দেখা হইয়াছিল?

মোহিতকুমার কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে

পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি যেন বিরক্ত হইলেন। আমি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "মোহিত বাবু! আমাকে আপনার বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন। যখন আমরা উভয়েই ব্রাহ্মণ, তখন আপনি আমার পর নহেন। নিশ্চয়ই কোন না কোন সম্পর্ক আছে।"

মোহিতকুমার ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছেন। আপনাকে দেখিয়া অবধি আমারও কেমন বিশ্বাস হইয়াছে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে আপনাকে আজ মালতীর নিকট লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইব কেন?"

আমি দেখিলাম, ঔষধ ধরিয়াছে. সুতরাং কোন কথা কহিলাম না। মোহিতকুমার আবার বলিতে লাগিলেন, "বিমলা-চরণ বাবু! মালতী সম্বন্ধে আমি যাহা জানি বলিতেছি শুনুন।

"প্রায় সাত মাস হইল, একদিন ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে মালতীকে অভিনয় করিতে দেখি। মালতীর রূপলাবণ্য,তাহার হাবভাব,তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া তাহার সহিত আমার আলাপ করিবার ইচ্ছা হয়। থিয়েটার শেষ হইলে, আমি মালতীর সন্ধান লই এবং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহার অনুসরণ করি। সেই দিন আমাদের প্রথম আলাপ হয়। মালতীর রূপ যেমন, তাহার গুণও সেইরূপ। তাহার সদ্ব্যবহারে আমি এত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে, সেই দিন হইতে আমি প্রত্যহই সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। ছয়মাস এইরূপে অতীত হইল।"

আমি মোহিতকুমারকে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মালতীকে কত করিয়া দিতেন? সে যখন বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তখন যে

বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু তবুও কিছুতেই সে সম্মত হয় নাই। সাত আট দিন হইল, মালতীর সহিত তাহার বিবাদ হইয়াছিল। মালতী প্রাণপণে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার বিবাহে বৃদ্ধের মত ছিল না। অবশেষে পিতাপুত্রীতে মৌখিক খুব ঝগড়া হইল। আমাকেও দুই একটা কথা বলিতে ও শুনিতে হইল। আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া আমি আর মালতীর বাড়ী যাই নাই।

আ। মালতী আপনার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী নহে, আপনি বৃদ্ধের উপর রাগ করিয়া তাহার সহিত আলাপ বন্ধ করিলেন কেন?

মো। না, মালতীর সহিত আমার প্রত্যহই দেখা হইত। আমি প্রত্যহই থিয়েটারে যাইতাম। সকল থিয়েটারের লোকের নিকট আমি পরিচিত। যেদিন সে যেখানে থাকিত, আমিও সেইদিন সেখানে গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম।

আ। বুধ, শনি ও রবি, সপ্তাহে এই তিনদিন মাত্র থিয়েটার হয়। আপনি প্রত্যহই মালতীকে কেমন করিয়া দেখিতে পাইতেন?

মোহিতকুমার হাস্য করিলেন। বলিলেন, "আপনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন, এখনও আপনার কোন বিষয় জানা হয় নাই। সপ্তাহে একদিন, বোধ হয় সোমবার ভিন্ন প্রতিদিনই থিয়েটার খোলা থাকে। সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীকেই সেখানে যাইতে হয়। বুধ শনি ও রবিবারে সাধারণের সমক্ষে অভিনয় হয়। অপর দিন শিক্ষাকার্য্য সমাধা হয়।"

আমি ও সকল কথা বেশ জানিতাম, কিন্তু যে কার্য্য উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, তাহার জন্য আমাকে সত্য সত্যই "নেকা"

সাজিতে হইল। আমি বলিলাম, "আপনি অনেক দিন এখানে আছেন, কাজেই এখানকার অনেক বিষয় আপনার জানা আছে। যদি প্রত্যহই আপনার সহিত মালতীর দেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি কালও রাত্রে মালতীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন?"

মো। হাঁ, কালও মালতীর সহিত দেখা হইয়াছিল।

আ। কোথায়? কোন্ থিয়েটারে?

মো। ষ্টারে। থিয়েটারের কার্য্য শেষ হইলে আমরা তিন জনে একসঙ্গেই এক গাড়ীতে গৃহে ফিরিয়াছিলাম। দেখিলাম, উভয়ের মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালতী আবার বৃদ্ধের সহিত বিবাদ করিয়াছিল। বৃদ্ধ তাহাকে কলিকাতা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছে। মালতী আমাকে এই সকল কথা চুপিচুপি বলিতেছিল, বৃদ্ধ তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। তাহাতে বৃদ্ধ মালতীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল। মালতী সহ্য করিল না। সেও বৃদ্ধকে যথেষ্ট গালাগালি দিয়া বলিল, "যদি নিজের মঙ্গল চাও, কোন কথা কহিও না। নতুবা জানিও, আমি না পারি এমন কাজ নাই। এতদিন কুসংসর্গে বেড়াইয়াও যে অধঃপাতে যাই নাই, সে কেবল আমার মনের বলে।" যতক্ষণ আমি তাহাদের সহিত ছিলাম, ততক্ষণ পিতাপুত্রীর বিবাদ চলিতে লাগিল। আমি আমার বাসায় পঁহুছিলাম, তাহারা উভয়ে সেই স্থান হইতে পদব্রজে চলিয়া গেল। আমি গাড়ী লইয়া যাইতে কহিলাম, কিন্তু তাহারা তাহা লইল না; রাগভরে উভয়েই প্রস্থান করিল।

আ। আপনি বাড়ী ফিরিলেন কখন?

মো। তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ

করিয়া আমার মনে কেমন সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, মালতীর সহিত বৃদ্ধের যেরূপ বিবাদ হইতেছে, তাহা শীঘ্র মিটিবে না। হয় ত বাড়ী গিয়া উভয়েরই ক্রোধবৃদ্ধি হইবে এবং শেষে হয় ত একটা গুরুতর কাণ্ড হইবে। এই মনে করিয়া আমি তখনই আবার বাসা হইতে বাহির হইলাম এবং শীঘ্রই তাহাদের নিকট যাইলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে বকিতে বকিতে যাইতেছে, মালতী গম্ভীর ভাবে তাহার অনুসরণ করিতেছে। আমি আর তাহাদিগকে দেখা দিলাম না—কিছুদূরে থাকিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। হাড়কাটা গলির মোড়ে আসিলে বৃদ্ধ গলির ভিতর প্রবেশ করিল। মালতী সেদিকে গেল না। সে পথের পশ্চিমদিকের ফুটপাতে আসিল এবং নিকটস্থ একটী গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া সটান পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ একবার ফিরিয়াও দেখিল না।

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মালতী কোথায় গেল ?"

মো। সমস্তই বলিতেছি, শুনুন। মালতীকে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখিয়া আমারও সন্দেহ হইল। আমি ভাবিলাম, হয় ত মালতীর কোন গুপ্তবন্ধু আছে, সে তাহারই নিকট যাইতেছে। আমার কৌতুহল জন্মিল। আমি তাহাকে দেখা দিলাম না; কিছু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। রাত্রি তিনটা বাজিল, পথে জনমনুষ্য নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একটা কুকুর চীৎকার করিয়া প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আর এক একজন কনষ্টেবল অর্দ্ধনিমীলিতচক্ষে কোন একটী গ্যাস পোষ্টে হেলান দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মালতী কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া ক্রমাগত যাইতে লাগিল। আমিও তাহার

পাছু পাছু ছুটিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ গমন করিয়া মালতী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। এখনও আমি তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর মালতী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া গঙ্গায় নামিতে লাগিল। আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, ভাবিলাম, মালতী আত্মহত্যার জন্য গঙ্গাতীরে আসিয়াছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। তখনই মালতীর পশ্চাতে যাইয়া দৃঢ়-মুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিয়া উপরে তুলিলাম। মালতী আমায় দেখিয়া চমকিত হইল। বলিল, "তুমি এখানে?"

মোহিতকুমারেকে বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মালতী কি জলমগ্ন হইয়াছিল?"

মো। না, জলমগ্ন হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল।

আ। তার পর?

মো। তার পর আমি মালতীকে সমস্ত কথা বলিয়া তাহার আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, বৃদ্ধ তাহাকে যেরূপ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার মরণই মঙ্গল। সে প্রায়ই ভয় দেখায় যে, তাহাকে কলিকাতা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবে, কলিকাতায় তাহার অনেক বন্ধু জুটিয়াছে। যেভাবে মালতী শেষ কথাগুলি বলিল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার বড় দুঃখ হইয়াছে। আমি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম, ও অবশেষে তাহাকে লইয়া হাড়কাটা গলিতে আসিলাম।

আ। আপনি মালতীর বাড়ী গিয়াছিলেন?

মো। না, তাহাকে গলির মোড়ে ছাড়িয়া দিয়া একস্থানে

গোপনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম, মালতী বাড়ীর দরজায় পঁহুছিল। তখন আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কাপড় ছাড়িয়া শয্যায় শুইতেছি, চারিটা বাজিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোহিতকুমারের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, মালতীই বৃদ্ধকে হত্যা করিয়াছে। সে আত্মহত্যা করিয়া বৃদ্ধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সফল না হইয়া বৃদ্ধকেই হত্যা করিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল, মালতী একা এই কার্য্য করিতে পারিবে না, নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গে আর কোন লোক ছিল। সরকারী ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বৃদ্ধের গলায় যে দাগ রহিয়াছে, তাহা কোন লোকের অঙ্গুলির চিহ্ন, বৃদ্ধ পাছে চীৎকার করে, এই আশঙ্কায় তাহার গলা টিপিয়া ধরা হইয়াছিল। যে গলা ধরিয়াছিল, সে কিছু আঘাত করে নাই। একাজ একজনের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। নিশ্চয়ই দুই বা ততোধিক লোকের দ্বারা হইয়াছে। মালতী গেল কোথায়? যে রমণী কলিকাতায় থিয়েটারে অভিনয় করে, সে না পারে এমন কি কাজ আছে? মালতী যখন একজন অভিনেত্রী, তখন সে যে খুন করিতে পারিবে না, একথা মনে লাগে না। কিন্তু মালতী একা খুন করিতে পারে নাই, তাহার সঙ্গে আর কোন লোক

ছিল। কে সেই লোক? বোধ হয় মোহিতকুমার। মোহিত কুমারের আন্তরিক ইচ্ছা, সে মালতীকে বিবাহ করে। কেবল বৃদ্ধের জন্যই তাহাদের এতদিন বিবাহ হয় নাই। বৃদ্ধই সেই বিবাহের একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল। মোহিত যে সে প্রতিবন্ধক দূর করিতে চেষ্টা করিবে না, এ কথা কে বলিতে পারে? মোহিত কুমারই কাল রাত্রে মালতীর সহিত ছিল। উভয়ে একসঙ্গে গঙ্গা-তীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে যে হাড়কাটা গলির মোড়ে মালতীকে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিল, তাহা মিথ্যা কথা। উভয়েই মালতীর বাড়ী গিয়াছিল এবং বৃদ্ধকে নিদ্রিত দেখিয়া মোহিতকুমার তাহার গলা চাপিয়া ধরে এবং মালতী ছোরার আঘাত করে। মোহিতকুমার এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই লিপ্ত আছে। কিন্তু কি করিয়া জানা যায়? অথচ সে আমাকে মালতীর বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, সে যদি উহাকে হত্যাই করিবে, বা হত্যার কথা অবগত থাকিবে, তাহা হইলে সন্ধ্যার পর আমাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে চাহিবে কেন?

পরদিবস মোহিতকুমার থানায় আনীত হইলেন। পূর্ব্বে তিনি আমার ছদ্মবেশ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং আমায় চিনিতে পারিলেন না। আমি মোহিতকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারই নাম মোহিতকুমার?"

মো। আজ্ঞে হাঁ। কোন্ অপরাধে আমি বন্দী হইলাম।

আ। সে কথা পরে জানিতে পারিবেন। এখন বিরক্ত করিবেন না। যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার যথার্থ উত্তর দিন। হাড়কাটা গলীতে মালতী বলিয়া একজন অভিনেত্রী বাস করিত। সে একজন বৃদ্ধকে খুন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। মালতীর

বাড়ীর চাকর বলে যে, আপনার সহিত মালতীর বিশেষ আলাপ ছিল। আপনি তাহার অনেক সংবাদ রাখেন। সেই জন্যই আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে।

মো। মালতীর সহিত আমার আলাপ ছিল বটে কিন্তু সে যে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তাহা আমি জানি না।

আ। আপনার সহিত তাহার কাল দেখা হইয়াছিল?

মোহিতকুমার কিছুক্ষণ কি ভবিল। পরে বলিল, "হাঁ, হইয়াছিল।"

আ। কখন?

মো। রাত্রে?

আ। কোথায়?

মো। ষ্টার থিয়েটারে।

আ। কত রাত্রে আপনি চলিয়া আইসেন?

মো। রাত্রি প্রায় দুইটা।

আ। মালতী কি আপনার সঙ্গে বাড়ী গিয়াছিল?

মো। হাঁ।

আ। শুনিয়াছি, বৃদ্ধও থিয়েটারে কর্ম্ম করিত। সেও কি আপনাদের সঙ্গে আসিয়াছিল?

মো। সে আমাদের সঙ্গে আসিতেছিল, আমার বাড়ী হ্যারিসন রোডে। ষ্টার থিয়েটার হইতে আসিবার সময় আগে আমি বাড়ী গিয়াছিলাম।

আ। মালতী কোথায় গেল?

মো। সে বাড়ীর দিকে গিয়াছিল।

আ। ঠিক বলিতেছেন?

মো। হাঁ।

আমি দেখিলাম, মোহিতকুমার অনেক কথা গোপন করিলেন। কিন্তু সে সকল আমি আর উত্থাপন করিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি, আপনি না কি মালতীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া মোহিতকুমার উত্তর করিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, কিন্তু বৃদ্ধের তাহাতে মত ছিল না; তাই বিবাহ হয় নাই।"

আ। মালতীর আর কোন বন্ধু আছে ?

মো। কই, আমার ত মনে হয় না।

আ। মালতী কি বৃদ্ধের কন্যা ?

মো। আজ্ঞা হাঁ—তবে ঔরসজাত নহে। বৃদ্ধ পালক পিতা মাত্র।

আ। মালতীর পৈতৃক বাড়ী কোথায় জানেন ?

মোহিতকুমার কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "কথায় কথায় একদিন মালতী বলিয়াছিল, তাহার পৈতৃক বাটী— গ্রামে। সে না কি সেখানকার কোন ভদ্রঘরের কন্যা।"

আমি মোহিতকুমারের শেষ কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ভাবিলাম, মালতী নিশ্চয়ই সেইখানে পলায়ন করিয়াছে।

মোহিতকুমার'ক ছাড়িতে পারিলাম না। তাঁহাকে বন্দী করিয়া থানায় রাখিলাম। কিন্তু যাহাতে তাহার কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আহারাদি করিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া মালতীর গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলাম। শীতকাল, গঙ্গা স্থির, কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই।

যখন নৌকায় আরোহণ করিলাম, তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। যখন সেই গ্রামের ঘাটে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা দুইটা। কলিকাতা হইতে ঐ গ্রাম প্রায় বার মাইল; তিন ঘণ্টায় আমরা বার মাইল পথ অতিক্রম করিলাম।

বলা বাহুল্য, আমি ছদ্মবেশেই খড়দহে গিয়াছিলাম। সেই গ্রামের সেই ভদ্রলোকের বাড়ী আমার জানা ছিল। পূর্ব্বে সেখানে আমি দুই একবার গিয়াছিলাম। ঘাট হইতে সেই বাড়ী প্রায় পনের মিনিটের পথ।

নৌকা হইতে নামিয়া দেখিলাম, ঘাটে তখনও দুই একজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার মনে কেমন সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, তাহাদের মুখেই মালতীর সন্ধান পাইব। কিন্তু পাছে তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের ভয় হয়, কিম্বা তাহারা সেই সকল কথা গোপন করে, এই আশঙ্কায় কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ঘাটের নিকটস্থ একটী বট-বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলাম। এরূপভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম যে, ঘাটের স্ত্রীলোকেরা আমাকে দেখিতে না পায়, অথচ আমি তাহাদিগের সকল কথাই শুনিতে পাই।

কিছুক্ষণ সেই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, একজন আর এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি গো মাসি! আজ তোমাদের এত বেলায় স্নান হচ্চে যে?”

অপরা রমণী উত্তর করিল, “আর মা! মনিবের মন যোগাতে আর পারি না। কোথা হতে এক হতভাগী কাল আমাদের বাড়ীতে এসেছে; তারই জন্যে আজ আমার এত বেলা।”

প্রশ্ন। সে কে মাসি?

উত্তর। কে জানি নে মা, শুন্‌ছি ত সে আমাদের মনিবেরই আত্মীয়। মেয়েটী বড় সুন্দরী—ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই বোধ হয়। কিন্তু মা, আমি ত এতদিন ও বাড়ীতে চাকরি কচ্চি, কই, আর কখনও ত তাকে দেখি নে।

প্র। আমিও সে কথা শুনেছি। তোমার বাবুর দূরসম্পর্কের এক ভাইয়ের এক মেয়ে ছিল। মেয়েটীকে কে না কি চুরি ক'রে নে গেছিলো। তার বয়স কত মাসি?

উ। বয়স ষোল সতের বৎসর হবে।

প্র। নাম কি?

উ। গিন্নী ত তাকে প্রভাবতী বলেই ডাক্‌ছেন।

প্র। এতদিন তিনি ছিলেন কোথায়?

উ। শুন্‌ছি কল্‌কেতায়।

প্র। সধবা না বিধবা?

উ। তা জানি নে মা।

প্র। ও মা, সে কি! মাথায় সিঁদুর আছে?

উ। কই না।

প্র। তবে সে বিধবা। তা এতদিন সে কার কাছে ছিল?

উ। তা কেমন ক'রে বল্‌বো। সে কথা ত শুনি নে।

আমি অতি মনোযোগের সহিত এই সকল কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। ভাবিলাম, প্রভাবতী কে? মালতীরই নাম কি প্রভাবতী? নিশ্চয়ই হয় ত এতদিন সে প্রকৃত নাম গোপন করিয়াছিল।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। তখনই সেই বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

বাড়ীখানি প্রকাণ্ড। পূর্ব্বে অনেক পরিবার ছিল, সম্প্রতি অনেকেই মারা পড়িয়াছেন। আমি বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র একজন ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহাশয়, কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

আমি উত্তর করিলাম, "তোমার বাবুকে, তিনি কোথায়?"

ভৃ। বড় বাবুকে ডাকিতেছেন? তিনি এইমাত্র উঠিয়াছেন, এতক্ষণ ঘুমাইতেছিলেন।

আমি বাবুর নাম জানিতাম না। কৌশলে জানিয়া লইবার জন্য হাসিতে হাসিতে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শীতকালেও তোমার বাবু দিনের বেলায় নিদ্রা যান?"

ভৃত্যও হাসিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, যতই গোলযোগ হউক না কেন, ললিতবাবুকে দিনের বেলায় একবার চক্ষু মুদিতে হইবেই হইবে।"

আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বল দেখি, তিনি কি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকেন?"

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ, তিনি রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে কোন দিন নিদ্রা যান না।

আ। কেন? এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি কাজ করেন?

ভৃ। কাজ? কাজ আবার কি? রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত তিনি তাশ খেলিয়া থাকেন। পাড়ার অনেকেই এখানে আসিয়া থাকেন।

আ। খেলা আরম্ভ হয় কখন?

ভৃ। রাত্রি আটটার সময়।

আ। প্রতি দিনই ঐ সময়ে?

ভৃ। প্রায় বটে, তবে যেদিন বাবুর কোন কাজ কর্ম্ম থাকে, সেই দিন হয় খেলা বন্ধ থাকে, না হয় কিছু অধিক রাত্রে খেলা বসিয়া থাকে।

আ। আজও বসিবে?

ভৃ। আজ আরও সকাল সকাল বসিবার কথা আছে।

আ। কেন?

ভৃ। কাল রাত্রে খেলা হয় নাই।

আ। কারণ কি?

ভৃ। অনেক দিন পরে এ বাড়ীর একটী মেয়ে কাল এখানে আসিয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় কাল রাত্রে খেলা বসে নাই।

ভৃত্যের কথা শুনিয়া তখন আমার আর ললিত বাবুর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হইল না। ভাবিলাম, কাল যখন খেলা বসে নাই, তখন নিশ্চয়ই আজ সেই বিষয়ে কোনরূপ কথোপকথন হইবে। যদি সেই সকল কথাবার্ত্তা গোপনে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কতকটা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

এই মনে করিয়া আমি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাবু কখন বাহিরে আসিবেন বলিতে পার?"

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ, তাঁহার বাহিরে আসিতে এখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে।

আ। কেন, এত দেরি কেন?

ভৃ। হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ না করিয়া তিনি বাহিরে আসেন না।

আ। তবে আমি এখন বিদায় হই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব।

ভৃত্য সম্মত হইল। আমিও সেখান হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম এবং এক নির্জন স্থানে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি আবার সেই বাড়ীর নিকটে গেলাম। দূর হইতে দেখিলাম, চারিপাঁচজন লোক বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া গল্প-গুজব করিতেছে।

বাড়ীখানি দ্বিতল বটে, কিন্তু সম্মুখে খানিকটা একতলা। মধ্যে প্রকাণ্ড এক উঠান, তাহার চারিদিকে চক-মিলান। সদর দরজার উভয় পার্শ্বে দুইখানি করিয়া বড় ঘর। এই দুই ঘর বৈঠকখানা। সদর দরজার ঠিক সম্মুখে পূজার দালান। দালানের দুই দিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। পর্ব্বোপলক্ষে

যখন বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম হয়, সেই সময় ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে অনেকেই শয়ন করিয়া থাকে।

বৈঠকখানা দুইটীর মধ্যে দক্ষিণ দিকেরটীর সমস্ত জানালা খোলা ছিল, বাহির হইতে সমস্তই দেখা যাইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে বাহিরের লোকগুলি একে একে ভিতরে গেল। আমি বুঝিলাম, এইবার খেলা আরম্ভ হইবে। আমার অনুমান মিথ্যা হইল না। লোকগুলি ভিতরে যাইবামাত্র আমি তখনই সেই ঘরের একটী জানালার পার্শ্বে এমন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম যে, ভিতরের কোন লোক আমাকে দেখিতে পাইল না।

তাসের শব্দে ও কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, খেলা আরম্ভ হইয়াছে। কিছুক্ষণ বেশ উৎসাহের সহিত খেলা চলিল, তাহার পর ঘরের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, "শিরীষ বাবু, আজ যে বড় জোর খেল্‌ছো, ব্যাপার কি ?"

যাহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি উত্তর করিলেন, "খেল্‌বো না কেন ? কাল খেলা বন্দ ছিল, কাজেই আজ জোর বাড়িয়াছে।"

কথার ভাবে বুঝিলাম, তিনিই শিরীষ বাবু। তিনি উত্তর দিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ললিত বাবু! কাল মজলিস্ বসালে না কেন ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "কাল সেই গোলযোগে পড়িয়াছিলাম, তাই খেলা বন্ধ গিয়াছে। তা' না হইলে এ বাড়ীর খেলা কি কখন বন্ধ হয় ?"

শিরীষ বাবু উত্তর করিলেন, "মেয়েটার খুব সাহস বটে।"

ললিত বাবু সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। শিরীষ বাবু আবার বলিলেন, "এরই মধ্যে পাড়ায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

অনেকে অনেক কথা কহিতেছে। যা' বল ভাই, কলিকাতায় এ সব ব্যাপার নিয়ে এত গোলযোগ হয় না। যত উৎপাত এই পল্লীগ্রামে।"

উত্তর হইল, "গোলমাল করিয়া আমার কে কি করিবে? বেশী উৎপীড়ন করে, মেয়েটাকে দূর করিয়া দিলেই চলিবে।"

শিরীষবাবু উত্তর করিলেন, "কেন ভাই, তোমার বড় ভাইয়ের মেয়ে বলিয়া কি তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না? সে কি! লোকনিন্দায় তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? হাজার হউক আপনার; সে যখন বলিতেছে যে, তোমার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিয়া নিজের ভরণ পোষণ করিবে, তখন তোমার আপত্তি কি?"

ঠিক এই সময়ে আমিও বাড়ীর ভিতর গিয়া সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, "ললিত বাবু এখানে আছেন?"

এক অতি সম্ভ্রান্ত যুবক, বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, দেখিতে গৌরবর্ণ, দোহারা, মুখশ্রী অতি সুন্দর, বলিয়া উঠিলেন, "আমারই নাম ললিত। আপনার কি প্রয়োজন বলুন?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে একবার নির্জ্জনে আসিতে হইবে। গোপনীয় কথা।"

ললিতবাবু তখনই আমার সহিত সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। আর একটী ছোট ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের ভিতরে তিন চারিটী বেতের মোড়া। আমি তাহারই একটায় বসিয়া পড়িলাম। ললিত বাবুও আমার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন মহাশয়, কি কথা?"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, "আপনারা এতক্ষণ যে মেয়েটীর কথা কহিতেছিলেন, সে একজনকে খুন করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাহাকে ধরিবার জন্য পুলিস নিশ্চয়ই আপনার বাড়ীতে আসিবে। তাই বলিতেছি, তাহাকে এখনই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিন। নতুবা আপনার পর্য্যন্ত বিপদ হইবে।"

আমার কথা শুনিয়া ললিতবাবু স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "বলেন কি মহাশয়! প্রভা খুন করিয়াছে? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, খুন করিল কেমন করিয়া? আপনার নাম কি?"

আ। আমার নাম বিমলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ল। কোথা হইতে আসা হইয়াছে?

আ। কালকাতা হইতে।

ল। প্রভাকে আপনি চিনিলেন কিরূপে?

আ। সে আমাদেরই থিয়েটারে কর্ম্ম করিত, যেদিন সে অভিনয় করিত, সেইদিন আমাদের যথেষ্ট লাভ হইত। এই জন্যই তাহাকে বাঁচাইবার আমাদের এত ইচ্ছা।

ললিতবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "প্রভা যে থিয়েটারে কর্ম্ম করিত, একথা এখানে রাষ্ট্র করিবেন না। তাহা হইলে এখানকার লোকে আমায় একঘরে করিবে। প্রভা আমাদের বাড়ীতে রহিয়াছে বলিয়া পাড়ায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কথা আর কেহ জানিতে পারিবে না। কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহার কি করিতেছেন?"

ললিতবাবু আবার কি ভাবিলেন। বলিলেন, "প্রভা সামান্য রমণী; সে যে কোন লোককে খুন করিবে, ইহা আমাদের মনে লাগিতেছে না। তবে সে হঠাৎ এখানে আসিল কেন, একথা জিজ্ঞাস্য বটে। আমি একবার প্রভাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। ভাল কথা, প্রভার সহিত যখন আপনার পরিচয় আছে, তখন তাহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিতেছি, আপনিই তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আ। আমি থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী মাত্র। আমার সহিত কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর আলাপ নাই। প্রভাকে আমি চিনি বটে, কিন্তু সে আমাকে দেখে নাই। তাহা হইলেও যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে একবার তাহাকে এই ঘরে ডাকিয়া আনুন।

ল। যে রমণী কলিকাতায় থিয়েটার করিত, তাহার লজ্জাই বা কি আর ভয়ই বা কি? আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এখনই তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।

আ। প্রভা আপনার কে?

ল। জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্কন্যা। প্রভার পিতার মৃত্যুর পর সে আমারই গলগ্রহ হয়। কিছুদিন পরে আমার একটী কন্যার সহিত তাহার বিবাদ হয়, সেই বিবাদের জন্য আমার স্ত্রী প্রভাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। প্রভার বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার মাতার মৃত্যু হয়। যখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাহার বয়স সাত বৎসর। বালিকাকে এ বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব জানিতে পারিয়া, পাড়ার এক ভদ্রলোক দয়া করিয়া তাহার ভরণ-পোষণ-ভার গ্রহণ করে। সেই অবধি প্রভা তাহার সহিত

নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কবে সে কলিকাতায় যায়, কবেই বা সে নাচ-গান শিক্ষা করে, তাহা আমি জানি না। ভাবিয়াছিলাম, এতদিনে সে মারা পড়িয়াছে। কিন্তু কাল হঠাৎ সে এখানে আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, বৃদ্ধ তাহার অভিভাবক মরিয়া গিয়াছে, অন্য আশ্রয় অভাবে তাহাকে আমার বাড়ীতে আসিতে হইয়াছে।

আ। বৃদ্ধ মারা পড়ে নাই, বৃদ্ধকে প্রভাই খুন করিয়াছে। এখন আপনি একবার তাহাকে এখানে আসিতে বলুন। আপনার সাক্ষাতেই আমি তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ল। প্রভাই যে খুন করিয়াছে তাহার কিছু প্রমাণ আছে?

আ। না থাকিলে এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিব কেন?

ললিত বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেথান হইতে চলিয় গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই এক সুন্দরী ষোড়শী যুবতীর সহিত পুনরায় আমার নিকট আগমন করিলেন। দেখিলাম, প্রভার দেহে একখানিও গহনা নাই। তাহার পরিধানে একখানা মোটা সাদা ধুতি. দেখিয়াই তাহাকে বিধবা বলিয়া বোধ হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রভা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। আমি তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি, তোমার প্রকৃত নাম প্রভাবতী। তবে এতদিন মালতী বলিয়া থিয়েটারে পরিচয় দিতে কেন?"

প্রভা ওরফে মালতী উত্তর করিল, "সে কেবল আমার পিতার ইচ্ছায়? তিনি আমাকে যেরূপ শিথাইয়াছিলেন, আমি সেইরূপই করিয়াছি।

আ। কোন্ দোষে তোমার পিতাকে হত্যা করিলে?

প্র। আমি? না মহাশয়, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমি পিতৃহত্যা করি নাই।

আ। বৃদ্ধ তোমার পালক পিতা মাত্র।

প্র। আমার যখন সাত বৎসর বয়স, তখন আমার পিতা মরিয়া যান। তাহার পরই বৃদ্ধ আমাকে গ্রহণ করে। আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা পালক পিতাই আমার যাবতীয় সৌভাগ্যের মূল। সুতরাং তাহাকে হত্যা করিলে আমারই ক্ষতি। আমি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিতে যাইব কেন?

আমি মোহিতকুমারের মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, সমস্তই প্রকাশ করিলাম। প্রভাবতী সমস্তই স্বীকার করিল কিন্তু সে যে পিতৃহত্যা করিয়াছে, একথা স্বীকার করিল না।

যেভাবে প্রভা অস্বীকার করিল, তাহাতে আমার স্পষ্টই বোধ হইল, সে নির্দ্দোষী। একবার মনে করিলাম, তাহাকে স্থানীয় পুলিসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাই, কিন্তু আমি একাকী বলিয়া সেই সময় সেই কার্য্য করিতে সাহসী হইলাম না।

আমি ললিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে বৃদ্ধ প্রভার ভরণ-পোষণ-ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বাড়ী কোথায় ছিল জানেন?"

ল। এই পাড়াতেই তাঁহার বাড়ী ছিল। একটা গোলযোগে পড়িয়া তিনি কিছুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। যখন প্রভার পিতার মৃত্যু হয়, সেই সময় তিনি পুনরায় ফিরিয়া আইসেন। প্রভার পিতা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর লোকে আমাকে প্রভার ভার

লইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। প্রভার পিতার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই তিনি পূর্ব্বে বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এমন সঙ্গতি ছিল না যে, প্রভা শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে। প্রতিবেশীগণ চাঁদা তুলিয়া সে কাষ সমাধা করিয়াছিল। আমাকে প্রভার ভরণ-পোষণে অনিচ্ছুক দেখিয়া, তাহারাই ঐ ব্যক্তির হস্তে তাহাকে সমর্পণ করে। তিনিও আহ্লাদের সহিত প্রভাকে গ্রহণ করেন এবং তাহাকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যান। সেই অবধি আর তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আজ আপনার মুখে শুনিতেছি, তাহাকে কে হত্যা করিয়াছে।

ললিতবাবুর কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার প্রকৃত নাম কি? কলিকাতায় তিনি মহাদেব শর্ম্মা বা মহাদেব ওস্তাজ বলিয়া পরিচিত।"

ললিত বাবু উত্তর করিলেন, "তাঁহার নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।"

আ। আপনি যে গোলযোগের কথা বলিলেন, সেটা কি আপনার জানা আছে?

ল। আজ্ঞে না, ঠিক জানি না।

আ। না জানেন, শুনিই না; তাহাতে আপনাদের কল্যারই মঙ্গল। যদি কোন উপায়ে প্রকৃত হত্যাকারী গ্রেপ্তার হয়, তাহা হইলে প্রভার কোনরূপ ক্ষতি হইবে না। নতুবা পুলিস উহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিবে।

ল। যাহা শুনিয়াছি, তাহা মুখে বলিলেও পাপ হয়। শুনিয়াছি, তিনি না কি গুরুকন্যা হরণ করিয়াছিলেন।

আ। সে কি! ছি. ছি! সত্যই একথা শুনিলে পাপ হয়। ঘটনা কিরূপ হইয়াছিল শুনিয়াছেন?

ল। আশুতোষ বাবু কোন সময়ে গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। সেখানেই এই ঘটনা হইয়াছিল। কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া গুরুকন্যাকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করেন।

আ। সে কথা পুলিসকে জানান হইয়াছিল?

ল। বোধ হয় না; তাহা হইলে অনেকেই একথা জানিতে পারিত। এখন আমি ভিন্ন সে কথা আর কেহ জানে না!

আ। তাঁহার সহিত কি আপনাদের কোন সম্পর্ক ছিল?

ল। ছিল; তিনি আমার দূর-সম্পর্কীয় পিসতুত ভাই ছিলেন। তাঁহার মাতা আমার দূর-সম্পর্কের পিশি-মা।

আ। তাঁহার গুরুর বাড়ী কোথায় জানেন?

ল। আমাদেরই এক জ্ঞাতি তাঁহার গুরু। তাঁহার নিবাস কলিকাতায়, বোধ হয় গোঁসাই গলিতে।

আ। নাম কি?

ল। হরমোহন গোস্বামী।

আমি তখন প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি বলিতেছ, রাত্রি দুইটার পর একবার বাড়ী গিয়াছিলাম। সত্য করিয়া বল দেখি, তখন তোমার পালক পিতার অবস্থা কিরূপ?"

প্রভাবতী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অস্পষ্টভাবে বলিল, "সে কথা মনে হইলেও আমার কেমন আতঙ্ক হয়। তিনি উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠ দিয়া রক্তস্রোত নির্গত হইতেছে। বোধ হইল, তখনও তাহার জীবন আছে। আমি একবার ভিতরে গেলাম। দেখিলাম, আমার অনুমান

মিথ্যা। তিনি পূর্ব্বেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমার সেখানে থাকিতে ভয় হইল। ভাবিলাম, এখনই পুলিস আমাকে হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করিবে; আমি পলায়ন করিলাম। ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে আসিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। বলিলাম, হুগলী যাইব। যখন হুগলী ঘাটে পঁহুছিলাম, তখন বেলা একটা। সেখানে যাহার নিকট যাইব মনে করিয়াছিলাম, তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। কাজেই এখানে আসিলাম।

প্রভাবতীর সমস্ত কথা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। ভাবিলাম, কলিকাতায় হরমোহন গোস্বামীর সন্ধান না পাইলে এ রহস্য ভেদ করা সহজ নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আহারাদি শেষ করিয়া ভাবিলাম, বৃদ্ধকে কে খুন করিল? রহস্য ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, মোহিতকুমারই হত্যাকারী। কিন্তু তাঁহার কথা-বার্ত্তায় আমার সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। মোহিতকে নিরপরাধী বলিয়াই বোধ হইল। তাহার পর ভাবিলাম, মালতী খুন করিয়াছে। কিন্তু সে যেভাবে সমস্ত কথা বলিল, তাহাতে তাহার উপর আর সন্দেহ হয় না। বিশেষতঃ মালতী একা কখনই হত্যা করিতে পারে না। নিশ্চয়ই তাহার কোন সহকারী ছিল। কিন্তু আজ তাহার কথা শুনিয়া আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে যে,

সেও নির্দ্দোষী। তবে কে এ কাজ করিল? ললিতবাবুর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে হরমোহন গোস্বামী তাহার শত্রু ছিলেন। হয় তিনি নিজে, না হয় তাঁহার কোন লোক বৃদ্ধকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আশুতোষের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের কম নহে। সে যখন গুরুকন্যা অপহরণ করিয়াছিল, তখন তাহার যৌবনাবস্থা। সে আজ দশ এগার বৎসর। যদি হরমোহন গোস্বামীর লোক বৃদ্ধকে খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে এতদিন ঐ কার্য্য হয় নাই কেন? বৃদ্ধ এতদিন নানাস্থানী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, একস্থানে এক বৎসরের অধিক বাস করে নাই! সুতরাং তাহার সন্ধান পাওয়াও কঠিন ব্যাপার।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া হরমোহন গোস্বামীকেই হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিলাম, এবং পরদিনই তাঁহাকে একেবারে গ্রেপ্তার করিতে মনস্থ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গোঁসাই গলির সন্ধান লইলাম। অগ্রে নিমু গোস্বামীর গলিতে গেলাম, কিন্তু সেখানে হরমোহন গোঁসাইএর কোন সন্ধান পাইলাম না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, গোঁসাই পাড়া নামে আরও একটী পাড়া আছে। অগত্যা সেইদিকে গমন করিলাম।

গোঁসাই পাড়ায় উপস্থিত হইয়া হরমোহন গোস্বামীর বাড়ীর সন্ধান পাইলাম এবং অবিলম্বে সেইখানে গমন করিলাম।

যখন হরমোহন গোস্বামীর বাড়ীতে পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় নয়টা। গোস্বামীর বাড়ীখানি প্রকাণ্ড ও দ্বিতল। বাড়ীতে অনেকগুলি লোকজন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, হরমোহন

সম্প্রতি মারা পড়িয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রই এখন বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁহারা তিন ভাই—রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একজন ভৃত্যকে রামচন্দ্রকে ডাকিয়া দিতে বলিলাম। ভৃত্য আমার বেশ দেখিয়া আমাকে বড়লোক মনে করিল এবং আমায় বসিতে বলিয়া বাবুকে ডাকিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তির সহিত ভৃত্য ফিরিয়া আসিল এবং আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই বাবু আপনাকে কি জন্য ডাকিতেছিলেন।"

ভৃত্য প্রস্থান করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারই নাম রামচন্দ্র বাবু?"

তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দিবার পর আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারই পিতার নাম হরমোহন গোস্বামী?"

রামবাবু ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কয় ভাই? পিতা মাতা বর্ত্তমান?"

রা। পিতা সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; মাতা বর্ত্তমান। আমরা তিন ভাই।

আ। আর দুই ভাই কোথায়?

রা। মধ্যম লক্ষ্মণ এখানে আছেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ। কনিষ্ঠ শিষ্য-বাড়ী গিয়াছেন।

আ। কতদিন হইল তিনি শিষ্য-বাড়ী গিয়াছেন?

রা। আজ দুই দিন।

আ। কোথায়?

রা। হুগলীতে।

আ। কবে আসিবেন?

রা। ঠিক জানি না। সম্ভবত এখন আসিবে না।

যেভাবে তিনি আমার শেষ কথার উত্তর দিলে, তাহাতে আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। আমি বিদায় লইব মনে করিতেছি, এমন সময় রামচন্দ্র বাবু রাগতভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন?"

আমি বিনীতভাবে উত্তর করিলাম, "উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। শুনিয়াছি, আপনার কনিষ্ঠের অনেকগুলি শিষ্য আছে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানও যথেষ্ট। তাঁহাকে গুরু করিবার অভিপ্রায়েই আমার এখানে আগমন। যখন তিনি এখানে নাই, তখন আর বৃথা সময় নষ্ট করি কেন। তিনি আসিলে বহুবাজার বিমলাচরণ বাবুর বাড়ীতে পত্র লিখিলেই আমি পুনরায় এখানে আসিব।"

আমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি বলিলেন, "ভরত শীঘ্র ফিরিবে; আপনি কাল এমন সময়ে আসিবেন, হয় ত দেখা হইতে পারে। আমি আজই তাহার নিকট লোক পাঠাইব।"

আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। ভাবিলাম, ভরত নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া আছে। আমি তখন আর কোন কথা কহিলাম না। পরদিন বেলা নয়টার সময় পুনরায় দেখা করিব বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। কিন্তু থানায় ফিরিয়া আসিলাম না। রামবাবুর বাড়ীর ঠিক সম্মুখে একটা ভাঙ্গা বাড়ী ছিল, আমি সেই বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম।

সে বাড়ীতে কোন লোক-জন ছিল না। জনকয়েক রাজমিস্ত্রী কাজ করিতেছিল। আমায় ভদ্রলোক ও বড় লোক মনে করিয়া তাহারা আমায় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু আমি

তাহাদিগকে সে সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিলাম না। কৌশলে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা ভরত গোস্বামীকে চেনে কি না?

একজন মিস্ত্রী বলিয়া উঠিল, "কে, ছোট গোঁসাই? এইমাত্র তিনি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।"

আ। আজ কখন তিনি বাটীর বাহির হইয়াছিলেন?

রা। আমরা আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতেছি, একজন ভয়ানক আকৃতি লোক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়।

আমিও কিছু পূর্ব্বে একজনকে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম। রাজমিস্ত্রীরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভরত গোঁসাই বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই মনে করিয়া আমি এমন স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, যেখান হইতে গোস্বামী-বাড়ী বেশ দেখা যাইতেছিল। অথচ অপর লোক আমাকে দেখিতে পায় নাই।

প্রায় একঘণ্টা পরে একজন গুণ্ডা সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া 'ভরতবাবু' 'ভরতবাবু' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাজমিস্ত্রীরা আমায় ডাকিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল। বলিল, "এই লোকই প্রাতঃকালে ছোট গোঁসাইকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

গুণ্ডা আমার পরিচিত। সে না পারে এমন কার্য্য অতি বিরল। যখন ভরতের সহিত তাহার এত সদ্ভাব, তখন ভরত যে এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর হইতে একজন বাহির হইল এবং সেই নবাগত গুণ্ডার সহিত কি কথা কহিয়া যেমন বাড়ীর ভিতর গমন করিতে উদ্যত হইবে, অমনই আমি এক লম্ফে সেই বাড়ী

হইতে বহির্গত হইলাম এবং সেই বাবুর হস্তধারণ করিয়া বলিলাম, "ভরতবাবু! একবার বাহিরে আসুন, আপনার সহিত আমার গোটা কতক কথা আছে।"

আমার কথা শুনিয়া এবং আমাকে তাহার হাত ধরিতে দেখিয়া ভরতের মুখ শুকাইয়া গেল। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া মন্ত্র-মুগ্ধবৎ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিল।

ইত্যবসরে ঘাটীর পাহারাওয়ালা সেইখানে উপস্থিত হইল। সে দূর হইতে আমায় দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিল। আমি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলাম এবং আমার সঙ্গী ভরত বাবুকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলাম।

ভরত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। সে উচ্চৈঃস্বরে 'আমেদ' 'আমেদ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

যে বিকটাকার গুণ্ডা এতক্ষণ ভরতের সহিত কথা কহিতে-ছিল, সে ভরতের ডাক শুনিয়া তখনই ফিরিয়া আসিল এবং আমাকে দেখিবামাত্র এক সুদীর্ঘ সেলাম করিল।

ইত্যবসরে ঘাটীর পাহারাওয়ালা ভরতবাবুকে গ্রেপ্তার করিল। সে আমেদকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমেদ বলিল, "বাবু! যাঁহার হাতে পড়িয়াছেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। অন্য কোন লোক হইলে এত ভয় করিতাম না, কিন্তু ইনি বড় সহজ পাত্র নন্। এখন আত্ম সমর্পণ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।"

আমি তখন আমেদকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "আপনার অনুমান সত্য। বৃদ্ধ আশুতোষকে ইনিই হত্যা করিয়াছেন।"

আমি। আর তুমি ?

আমেদ। আমিও সাহায্য করিয়াছি। যখন আপনার হাতে এই খুনের সন্ধান ভার পড়িয়াছে, তখন আর আমাদের নিস্তার নাই ?”

আমি তখন ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বৃদ্ধকে হত্যা করিবার কারণ কি ?”

ভ। আশুতোষ আমার ভগ্নীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। শুনিয়াছি, আমার ভগ্নীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাহাকে বলপূর্ব্বক চুরি করিয়া লইয়া যায়। একথা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। জানিলে বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার সর্ব্বনাশ করিতাম। পিতার মৃত্যু-কালে তিনি আমাদিগকে সমস্ত ব্যাপার বলেন, এবং যাহাতে সেই বৃদ্ধ যথোচিত শাস্তি পায়, তাহার জন্য আমাদিগকে শপথ করিতে অনুরোধ করেন। পিতার মৃত্যুশয্যায় তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া আমি বৃদ্ধের প্রাণসংহার করিব বলিয়া শপথ করিয়াছিলাম। এতদিন বৃদ্ধের সন্ধান করিতে পারি নাই। চারিদিকে লোক পাঠাইলাম, কিন্তু সকলেই নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। কেবল এই আমেদ তাহার প্রকৃত সন্ধান দিয়াছিল। বৃদ্ধের সন্ধান পাইয়া আমার প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইল। আমি আমেদের সহিত পরামর্শ করিলাম। সেও আমার মতে মত দিল। অবশেষে সেই দিন যখন সে থিয়েটার হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন আমরা দুইজনে তাহার পাছু পাছু আসিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাহার কন্যার সহিত তাহার বিবাদ হইল। বৃদ্ধ একাই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার কন্যা কোথায় চলিয়া গেল। আমরাও সুযোগ পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বাড়ীর ভিতর

প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ অপরদিকে মুখ করিয়া কি ভাবিতেছে। আমেদ এমন করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না। ইত্যবসরে আমি তাহার পৃষ্ঠে এমন এক ছোরার আঘাত করিলাম যে, সে তখনই ছট্‌ফট্‌ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমরা কার্য্য সিদ্ধ করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। জানিতাম না, আপনি আমাদিগকে ধরিতে পারিবেন। কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল হইল। আমি বন্দী হইলাম।

আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম এবং ভরত, আমেদ ও সেই কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া প্রায় একটার সময় থানায় ফিরিয়া আসিলাম।

ভরত ও আমেদ সমস্ত কথাই স্বীকার করিল। কিন্তু এই মকদ্দমার অপর বিশেষ প্রমাণ না থাকায় আমেদকে মহারাণীর সাক্ষী করা হয়। প্রধান আদালতের বিচারে ভরতচন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হন। কিন্তু জজ বাহাদুর চরম দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহাকে চির নির্ব্বাসিত করেন।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 186. দারোগার দপ্তর, ১৮৬ সংখ্যা

জাল চেক।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [আশ্বিন।

জাল চেক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মানুষের মন কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। আজ দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপে, রৌদ্রের অসহ্য উত্তাপে উৎপীড়িত হইয়া 'জল জল' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। জল আর হয় না, আকাশ মেঘশূন্য, যেন আর কস্মিনকালেও বৃষ্টি হইবে না। কিন্তু যখন সেই বহু-কালের আশার সামগ্রী, গ্রীষ্ম-প্রপীড়িত মানবের শান্তি-প্রদায়িনী বর্ষা আসিল,—যখন আকাশমণ্ডল নবনীরদজালে আবৃত হইয়া অনবরত গর্জ্জন করিতে লাগিল, যখন অবিশ্রান্ত ধারাপাতে মেদিনী সুশীতল হইল, মানব কি তখন সন্তুষ্ট হইল? মানুষ কি তখনও তৃপ্তিলাভ করিল? না, না—মানব যেমন ছিল, তেমনই রহিল। সে বলিল, 'রোজ রোজ বৃষ্টি ভাল লাগে না, শীত আসিলে বাঁচা যায়।' আবার যখন সেই শীত আসিল, মানব তখনও তুষ্ট হইল না। সে বলিল, 'এ হাড়ভাঙ্গা শীতে কেমন করিয়া বাঁচিব? তাত সয় ত বাত সয় না।' তাই বলিতেছি, মানবের মন কিছু-তেই তৃপ্ত নহে।

আশ্বিন মাসের প্রায় অর্দ্ধেক অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছিল

বটে কিন্তু তাহাতেও গরম কমিতেছিল না। একে সেই ভয়ানক গ্রীষ্ম, তাহার উপর ঘণ্টায় তিন চারিবার বৃষ্টি হইতেছিল, কাজেই আমার মন বড় ভাল ছিল না।

প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই দেখিলাম, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। বেলা আটটার সময় বৃষ্টি ধরিয়া গেল বটে, কিন্তু আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। সূর্য্যের প্রখর রশ্মিও সেই নিবিড় নীরদমণ্ডল ভেদ করিতে পারিল না। জগৎপ্রাণ যেন সেই নবঘনচ্ছটায় ভীত হইয়াই বৃক্ষশিরে পলায়ন করিল। বাতাসের নাম মাত্রও নাই। ভয়ানক গুমোট। শরীর হইতে অনর্গল ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। আমি বিরক্ত হইয়া অফিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম।

গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ পূর্ব্বদিনের অনেক লেখা-পড়ার কাজ বাকী ছিল। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমি সেই সকল কার্য্য আরম্ভ করিলাম। একটা ভয়ানক দাঙ্গার অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম, তাহারই অবস্থা বিশদরূপে লিখিয়া রাখিলাম।

সেই দাঙ্গার রিপোর্ট লিখিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেবও দেখা দিলেন। কিছুক্ষণের জন্য মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম।

আহারাদি শেষ করিয়া বেলা এগারটার পূর্ব্বেই আবার অফিস-ঘরে বসিলাম। এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া যন্ত্রের নিকট গমন করিলাম। শুনিলাম, সাহেবের জরুরি কাজ, আমাকে তখনই তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।

সাহেবের ঘরে গিয়া দেখিলাম, আরও দুইজন সাহেব বসিয়া

আছেন। দুইজনের মধ্যে একজন পরিচিত, কোন একটী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার—হেনেরি ম্যাক্‌লিন্। অপর ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আমাকে দেখিয়াই সাহেব শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাঙ্কে কতকগুলি জাল চেক বাহির হইয়াছে। তোমাকে এখনই তাহার সন্ধানে যাইতে হইবে।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না দেখিয়া, তিনি আবার বলিলেন, "ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ম্যাক্‌লিন্ সাহেবকে তুমি বেশ জান। উহাঁর সহিত তোমার পরিচয়ও আছে।"

আমি সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম। সাহেব তখন অপর ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাঁর নাম জোন্স; ব্যাঙ্কে ইহাঁর নামে অনেক টাকা জমা আছে। সম্প্রতি ইনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কের হিসাব ও উহাঁর নিজের হিসাবে প্রায় লক্ষ টাকার গোলমাল্। হিসাবের ভুল হইয়াছে মনে করিয়া, ইনি ব্যাঙ্কে আসিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্র দেখিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, হিসাবের কোন ভুল নাই। তাঁহার নামে কতকগুলি জাল চেক ভাঙ্গান হইয়াছে। চেকগুলি ব্যাঙ্কেই আছে। তোমার দেখিবার আবশ্যক হইলে সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিতে পার।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া সাহেবের নিকট বিদায় হইলাম এবং ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও জোন্স সাহেবকে সঙ্গে লইয়া তখনই ব্যাঙ্কে গমন করিলাম। ম্যানেজার সাহেবের গাড়ী বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল, পনের মিনিটের মধ্যেই আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম।

ব্যাঙ্কে পঁহুছিয়া যে পুস্তকে জোন্স সাহেবের হিসাব আছে, প্রথমেই সেই পুস্তকখানি দেখিতে চাহিলাম। আমাদিগকে যে

কার্য্য করিতে হয়, তাহাতে সকল প্রকার বিদ্যারই প্রয়োজন। যদি বাস্তবিকই হিসাবে কোন ভুল থাকে, এই আশঙ্কায় জোন্স সাহেবের হিসাব দেখিতে ইচ্ছা হইল।

যে খাতায় জোন্স সাহেবের হিসাবে ছিল, তাহা তখনই আমার নিকট আনীত হইল। আমি হিসাবটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। জোন্স সাহেবের নিজের হিসাবে তাঁহার নামে তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা জমা থাকা উচিত। কিন্তু ব্যাঙ্কের খাতায় দেখিলাম, তাঁহার নামে মোট দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র রহিয়াছে। আশী হাজার টাকার গোল। আমি তখন জোন্স সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এই ব্যাঙ্কের নামে শেষ চেক কবে দিয়াছিলেন?"

জো। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে।

আ। কত টাকার?

জো। পঞ্চাশ হাজার।

আ। কাহার নামে চেক কাটিয়াছিলেন?

জো। লরেন্স কোম্পানীর নামে।

আ। তাহার পর আরও তিনখানি চেক ভাঙ্গান হইয়াছে দেখিতেছি। দুইখানি ত্রিশহাজার করিয়া, একখানি বিশ হাজার। এই আশী হাজার টাকারই গোলযোগ হইয়াছে। আপনার ঠিক মনে আছে যে, শেষ তিনখানি চেকে আপনার স্বাক্ষর নাই?

জো। না—সেই স্বাক্ষর তিনটীই জাল। চেকের নম্বর দেখিলেই, আপনি বুঝিতে পারিবেন। শেষ তিনখানি চেকের যে যে নম্বর দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই নম্বরের চেক এখনও আমার কাছে আছে। যদি প্রয়োজন হয়, আমার অফিসে চলুন, দেখাইয়া দিব।

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে না—আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদি ভবিষ্যতে দরকার হয়, দেখিয়া আসিব। এখন দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া আমি ম্যানেজার সাহেবের দিকে চাহিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "জোন্স সাহেবের হিসাব কাহার হাতে থাকে? তিনি লোক কেমন?"

ম্যাকলিন সাহেব অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "রণেন্দ্রনাথ মিত্র নামে একজন ভদ্র বাঙ্গালীর হাতে জোন্স সাহেবের হিসাব। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাকে অতি সৎ লোক বলিয়াই বিবেচনা হয়।"

আ। তিনি কোথায়? একবার এখানে আসিতে বলুন।

ম্যা। তিনি আজ অফিসে আইসেন নাই। শরীর অসুস্থ বলিয়া তিন দিনের ছুটী লইয়াছেন।

আ। আজ কি জোন্স সাহেবের ব্যাঙ্কে আসিবার কথা ছিল?

ম্যা। কই না—আমি ত জানিতাম না।

আ। রণেন্দ্রবাবুর পরিচিত কোন লোক এখানে চাকরি করেন?

ম্যা। কই না—আমার ত জানা নাই।

আ। রণেন্দ্রের পত্র কে দিয়া গেল।

ম্যা। পত্র ডাকে আসিয়াছিল।

আমি তখন জোন্সকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ যে আপনি ব্যাঙ্কে আসিবেন, একথা কাহাকেও বলিয়াছিলেন? কেহ কি জানিত যে, আপনি আজ এখানে সন্ধান লইতে আসিবেন?"

জো। আজ্ঞে না। আসিব কি না, আমি নিজেই জানিতাম না, অপরে কোথা হইতে জানিতে পরিবে!

আ। সে কি?

জো। কাল রাত্রি নয়টার পর হিসাব মিলাইতে গিয়া দেখিতে পাই, প্রায় লক্ষ টাকার গোল। তাই আজ প্রাতে আসিয়াছি।

আ। কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, হিসাবে লক্ষ টাকার গোলযোগ। ব্যাঙ্কের হিসাব পাইলেন কোথায়?

জো। আমার নামে কত টাকা জমা আছে জানিতে ইচ্ছা করিয়া পরশ্ব ব্যাঙ্কে একখানি পত্র লিখি। কাল সন্ধ্যার পর সে পত্রের উত্তর পাই।

আ। সে পত্রে কাহার স্বাক্ষর ছিল?

জো। সহকারী ম্যানেজার—লরেন্সের সই ছিল।

যে তিনখানি চেক জাল বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, আমি সেই-গুলি দেখিতে চাহিলাম। ম্যাক্লিন্ সাহেব তখনই একজন কেরাণীকে চেক তিনখানি আনিতে আদেশ করিলেন।

চেক তিনখানি হস্তগত হইলে আমি জোন্স সাহেবের সহিত সেই চেকগুলির স্বাক্ষর মিলাইয়া দেখিলাম। সইগুলি একই প্রকার, কোনরূপ তারতম্য নাই। অপরাপর চেকগুলিতে তিনি যেমন সই করিয়াছিলেন, এইগুলিতেও সেইরূপ স্বাক্ষরই রহিয়াছে; কোন প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না।

ম্যানেজার ম্যাক্লিন্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে যে কেরাণীর সহিত জোন্স সাহেবের হিসাবের কোনরূপ সংস্পর্শ আছে, তাহাদের সকলেই উপস্থিত; কেবল রমেন্দ্রবাবুই অনু-

পস্থিত। সুতরাং তাহার উপরেই প্রথম সন্দেহ হইল। আমি তখন সাহেবের নিকট হইতে রণেন্দ্রের বাড়ীর সন্ধান জানিয়া লইলাম এবং জোন্স সাহেবকে আশ্বাস দিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রণেন্দ্রনাথের বাড়ী হাবড়ায়। ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম এবং সাধারণ বেশে হাবড়ায় গমন করিলাম। রণেন্দ্র বড় লোকের সন্তান। সন্ধানে জানিতে পারিলাম, তাঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র মিত্র। এক সময়ে তিনি হাইকোর্টের একজন বড় উকিল ছিলেন। সুতরাং রণেন্দ্র নাথের বাড়ী খুঁজিয়া লইতে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হইল না।

চারি বৎসর হইল রণেন্দ্রনাথের পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার আর কোন ভ্রাতা ছিল না। তিনিই এখন বাড়ীর কর্তা। বাড়ীখানি প্রকাণ্ড দ্বিতল। লোক জনও অনেক। রণেন্দ্রের একটী পুত্র ও একটী কন্যা। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র একজন ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে খুঁজিতেছেন, মহাশয় ?"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, "রণেন্দ্রবাবুর সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি তাঁহারই সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। বড় জরুরি কাজ—শীঘ্র ডাকিয়া দাও।"

ভৃত্য উত্তর করিল, "তিনি আজ প্রাতে দেশে গিয়াছেন, দুই তিন দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন?"

আ। দেশে গিয়াছেন! সে কোথায়?

ভৃ। দেবীপুর—বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে।

আ। সেখানে না যাইলে এখন আর দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই?

ভৃ। আজ্ঞে না।

আ। তোমার কথায় বিশ্বাস হইতেছে না। কাল তিনি অফিসে গিয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে পীড়িত দেখেন নাই। আজ তিনি অফিসের ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিয়াছেন যে, তিনি পীড়িত। আবার তুমি বলিতেছ, তিনি দেশে গিয়াছেন। কোন্ কথা বিশ্বাস করিব?

ভৃ। আমি ত জানি, তিনি দেশে গিয়াছেন। গত রাত্রি হইতে তাঁহার জ্বরভাবও হইয়াছিল।

আ। কি জন্য দেশে গিয়াছেন জান?

ভৃ। আজ্ঞে না, আমরা চাকর—বাবুর কোথায় কি দরকার, আমরা জানিব কি প্রকারে?

আ। রণেন্দ্র বাবুর পরিবার কোথায়?

ভৃ। তিনিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

ভৃত্য যেভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল, তাহাতে তাহার উপর কোনরূপ সন্দেহ হইল না। আমার বিশ্বাস হইল, রণেন্দ্রবাবু দেশেই পলায়ন করিয়াছেন। যখন অফিসের আর আর কেরাণিগণ উপস্থিত আছেন, তখন তাঁহারই উপর সন্দেহ হইবার কথা। কিন্তু তিনি বাস্তবিক দোষী কি না, সে কথা জানিতে পারি নাই।

কেবল সন্দেহ করিয়াই রণেন্দ্রবাবুর সন্ধান লইতেছিলাম। অপরাপর কেরাণিগণ উপস্থিত ছিল বলিয়াই যে তাহারা নির্দ্দোষী, তাহা বলা যায় না। হয় ত তাহাদেরই মধ্যে প্রকৃত অপরাধী আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি রণেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। মনে করিলাম, একবার ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যাক্লিন্ সাহেবকে অপর কেরাণিদের উপর নজর রাখিতে অনুরোধ করিব।

এই স্থির করিয়া আমি ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে শ্যামলাল বাবুর সহিত আমার দেখা হইল। শ্যামলাল বাবু আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু—হাবড়া কোর্টের একজন উকিল।

শ্যামলালের সহিত আমার যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন বেলা প্রায় একটা। সেদিন তিনি একটা বহুকালের পুরাতন মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া প্রায় শতাবধি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই আনন্দে এবং সেদিন কোন কাজ না থাকায়, তিনি সকাল সকাল বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে পথে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ।

আমাকে অনেক দিনের পর দেখিয়া শ্যামলাল আন্তরিক প্রীত হইলেন। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু যে এদিকে? কি মনে করিয়া?"

আমিও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "কাজ না থাকিলে বেলা দুপুরের পর কলিকাতা ছাড়িয়া হাবড়া আসিব কেন? তোমার সংবাদ ভাল ত?"

শ্যা। হাঁ ভাই, আপাততঃ সব ভাল। এখানে কোথায় আসিয়াছিলে?

আ। এই তোমারই প্রতিবেশী রণেন্দ্রবাবুর বাড়ী।

"যদি এতদূরে আসিয়াছ, তবে একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা পড়িবে না?" এই বলিয়া শ্যামবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না।

পূর্ব্বে আর একবার শ্যামলালের বাড়ী আসিয়াছিলাম, কিন্তু সে অনেকদিনের কথা। শ্যামলালের বাড়ীখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে—দ্বিতল। বাহিরে একটা ছোট খাট উঠান। বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র ছেলেদের কোলাহল আমার কর্ণগোচর হইল। দেখিলাম, চারি পাঁচটী বালক বালিকা সেই উঠানে খেলা করিতেছে।

আমরা উপস্থিত হইবামাত্র বালকদিগের কোলাহল থামিয়া গেল। কে কোথায় পলায়ন করিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামলাল একজন ভৃত্যকে বৈঠকখানা খুলিয়া দিতে বলিলেন।

ঘর খোলা হইলে আমরা ভিতরে গিয়া এক একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরেই সেই ভৃত্য তামাকু সাজিয়া আনিল।

তামাকু সেবন করিতে করিতে শ্যামলাল আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "রণেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ ভাই! তিনি যেখানে কর্ম্ম করেন, সেখানে অনেক টাকার গোল হইয়াছে। তাহারই সন্ধানের ভার আমার হাতে পড়িয়াছে। তাই একবার রণেন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়াছিলাম।"

শ্যা। কেন? তিনি আজ অফিসে যান নাই?

আ। না ভাই! সেই জন্যই ত তাঁহার উপর সন্দেহ হইয়াছে।

শ্যা। তিনি বাড়ীতে আছেন?

আ। না—শুনিলাম, দেশে গিয়াছে।

যে ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিয়াছিল, সে আমার কথায় হাসিয়া ফেলিল। আমি তাহার হাসির কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন হে বাপু! আমার কথায় হাসিতেছে কেন? ব্যাপার কি?"

ভৃত্য সে কথার কোন উত্তর করিল না। বলিল, "না মহাশয়! আমি আপনার কথায় হাসি নাই।"

শ্যামবাবু ভৃত্যের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ্ রাম! যদি কিছু জানিস্ ত বল্। এই বাবুকে চিনিস্ না—ইনি পুলিসের ইনস্পেক্টার। শেষে কি মারা পড়্বি। রণেন্দ্রবাবুর চাকরের সঙ্গে তোর আলাপ আছে জানি। যদি তার মুখে কিছু শুনিয়া থাকিস্ বল্—তোর ভাল হবে।"

শ্যামবাবুর কথায় আমিও সায় দিলাম। বলিলাম, "হাঁ বাপু! তোমার মনিব যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যদি কিছু জানিয়া থাক বল, আমি এখনই তোমায় পুরস্কার দিব।"

আমাদের উভয়ের কথায় ভৃত্যের মন খুলিয়া গেল। সে বলিল, "রণেন্দ্রবাবু রেঙ্গুন যাইবেন বলিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে একজন চাকরও আছে।"

আ। কে তোমায় এ কথা বলিল?

ভৃ। সেই চাকরের ভাই।

আ। সে কোথায় থাকে?

ভৃ। কেন, রণেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে। তাহারা দুই ভায়েই সেখানে কর্ম্ম করে।

আ। রণেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কয়জন চাকর আছে জান?

ভৃ। আজ্ঞে জানি বই কি—ঐ দুই ভাই ছাড়া আর কোন চাকর নাই। তবে একজন দাসী আছে বটে।

আ। চাকর দুইজন কি পরস্পরের সহোদর ভাই ?

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ—কেবল সহোদর নয় যমজ। দুজনের আকৃতির অনেক সাদৃশ্য আছে।

আ। আজ বুধবার—বর্ম্মা মেলের দিন। জাহাজ ত কলিকাতা হইতে আজই ছাড়িবে ?

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ, আমিও শুনিয়াছি, বেলা তিনটার সময় জাহাজ ছাড়িবে।

বেলা তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে, আর দেড় ঘণ্টা পরেই জাহাজ ছাড়িবে। এই ভাবিয়া সেখানে আর বিলম্ব করিলাম না। শ্যামবাবুকে গোপনে সকল কথা প্রকাশ করিয়া তখনই সেখান হইতে বাহির হইলাম এবং শীঘ্রই থানায় ফিরিয়া আসিলাম। পরে সাহেবকে সমস্ত কথা বলিয়া, টিকিট কিনিয়া, তখনই রেঙ্গুনে যাইবার জাহাজে আরোহণ করিলাম।

জাহাজখানি প্রকাণ্ড। ইতিপূর্ব্বেই সেখানে অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। আমি যখন জাহাজে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা আড়াইটা। জাহাজ ছাড়িতে তখনও অর্দ্ধঘণ্টা সময় ছিল। ভাবিলাম, যদি কোনরূপে এই আধঘণ্টার ভিতর রণেন্দ্রনাথকে বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমাকে বৃথা রেঙ্গুন যাইতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াও রণেন্দ্রনাথের কোন সন্ধান পাইলাম না।

জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশজন বাঙ্গালী। সকলেই প্রায় এক একটী ক্ষুদ্র কামরা ভাড়া লইয়াছিল। জাহাজ ছাড়িবার

পূর্ব্বে সকলেই জাহাজের পাটাতনের উপর আসিয়াছিল। আমি সকলকেই ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু রণেন্দ্রবাবুর কোন ফটো না থাকায় আমি তাঁহার সন্ধান পাইলাম না।

রণেন্দ্রের বাড়ীতে যে ভৃত্য আমার সহিত কথা কহিয়াছিল, তাহার মত কোন লোকও তখন দেখিতে পাইলাম না।

ক্রমে অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল, জাহাজের নঙ্গর তোলা হইল, চারিদিকের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে জাহাজখানি বেগে রেঙ্গুনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের যে লোকের আমার সহিত যাইবার কথা ছিল, তখনও পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

যতক্ষণ আলোক ছিল, যতক্ষণ দূরের বস্তু দেখা যাইতেছিল, আরোহিগণ ততক্ষণ জাহাজের পাটাতন হইতে নড়িল না। ক্রমে যখন সন্ধ্যা সমাগত হইল, পৃথিবী ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল, জাহাজে বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বলিত হইল, তখন একে একে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কামরায় গমন করিল।

সে রাত্রে আর কিছু হইল না। আমিও নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলাম এবং অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন প্রাতেই শয্যা ত্যাগ করিলাম। দেখিলাম, আরোহিগণের অনেকেই বমি করিতেছে, প্রায় কেহই কামরা ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে নাই।

কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যাইতে সচরাচর চারিদিন লাগে। কিন্তু যদি তুফান হয়, তাহা হইলে ছয় দিনেও যাওয়া যায় না। এই কয়দিনেই যাত্রীদিগের মধ্যে পরস্পরের বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া থাকে।

সেই দিন বৈকালে আমি জাহাজের উপরের পাটাতনে বসিয়া আরোহিগণকে লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, সূর্য্যদেব পাটে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, আকাশমণ্ডল নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, মৃদুমন্দ পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সেই নীলাম্বুস্নাত জগৎপ্রাণের স্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ হইতেছিল। স্বভাবের সেই অপরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। যে কার্য্যে আসিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। একমনে জগৎপিতা জগদীশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম।

সেই যুবকের বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু দেখিবামাত্র বোধ হয়, তাঁহার বয়স ত্রিশের অধিক। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, দোহারা, নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব, মুখশ্রী অতি সুন্দর। দেখিলেই বড় ঘরের সন্তান বলিয়া বোধ হয়।

জাহাজে কোন পরিচিত লোক না থাকায়, আমার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। ভদ্রলোকটিকে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের নাম কি? রেঙ্গুনেই যাইতেছেন?"

আমার কথায় তিনি আপ্যায়িত হইলেন। বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, রেঙ্গুনেই যাইতেছি। আমার নাম খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

আ। কলিকাতা হইতে আসিতেছেন?

খ। আজ্ঞে হাঁ—কলুটোলায় আমার বাড়ী।

আ। রেঙ্গুনে আপনার কোন আত্মীয় আছে না কি?

খ। আজ্ঞে না—আত্মীয় কোথায় পাইব?

আ। তবে কি জন্য সেখানে যাইতেছেন?

খ। ডাক্তারি করিতে

আ। আপনি ডাক্তার?

খ। আজ্ঞে হাঁ—একজন হোমিওপ্যাথ। কলিকাতায় আমার মত অনেক আছে। তাঁহাদেরই অন্ন জোটা দায়। আমি সবে পাশ করিয়াছি, আমায় এখন কে বিশ্বাস করিয়া ডাকিবে? তাই কলিকাতা ছাড়িয়া দূরদেশে যাইতেছি। শুনিয়াছি, রেঙ্গুনে ভাল ডাক্তার নাই।

আ। জাহাজের কোন্‌দিকে আপনার কাম্‌রা?

খ। পশ্চাৎ দিকে।

আ। আপনার সঙ্গে আর কেহ আছে?

খ। না মহাশয়, আমার সঙ্গী কেহ নাই, কিন্তু এখানে আসিয়া আমি এক বিপদে পড়িয়াছি। আমার কামরার ঠিক পার্শ্বে একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ঘর। বৃদ্ধ প্রায় ঘরের ভিতর থাকে, এক-আধবার বাহির হয় মাত্র। বৃদ্ধের নানা রোগ—এখন আমারই চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন।

আ। তিনি কি একাই জাহাজে আসিয়াছেন?

খ। একজন চাকর তাঁহার সঙ্গে আছে। কিন্তু সে সদাই তাঁহার ভয়ে ভীত। সাহস করিয়া একা তাঁহার ঘরের ভিতর যাইতে পারে না। কাল বৈকালে বৃদ্ধ না কি একবার তাহাকে একটা তেলের বোতল ছুড়িয়া মারিয়াছিল, ভৃত্য সেই ভয়ে আর একা তাঁহার নিকটে যায় না।

আ। বৃদ্ধের আহারের কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে?

খ। তিনি যে রোগে ভুগিতেছেন, তাহা এ বয়সে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। জরাগ্রস্ত পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণের যে যে

রোগের সম্ভাবনা, এই বৃদ্ধেরও সেই সেই রোগ। সুতরাং তাঁহার অন্নাহারই ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু জাহাজের ব্রাহ্মণে তাঁহার নিকট অন্ন দিয়া আইসে না, সে কাজও আমায় করিতে হয়। শুনিলাম, বৃদ্ধ তাহাকেও মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমি বৃদ্ধকে ঔষধ দিয়াছিলাম। এই আমার অপরাধ, এই জন্যই আমার এত নিগ্রহ। সেই অবধি আমি ভিন্ন আর কোন লোকে তাঁহার সেবা করিলে তিনি বিরক্ত ও রাগান্বিত হন, কখন কখন প্রহার করিতেও চেষ্টা করেন।

এইরূপ নানা কথায় রাত্রি অধিক হইল। আমি আমার কক্ষে প্রস্থান করিলাম। পরে আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমি নিজেই আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলাম। কতকগুলি উৎকৃষ্ট ফলমূলাদি, মুড়কী, চিড়া, জমাট দুগ্ধ ইত্যাদি আহারীয় সামগ্রী আমি সঙ্গে লইয়াছিলাম।

পরদিন বেলা প্রায় আটটার পর নিদ্রাভঙ্গ হইল। যখন শয্যা ত্যাগ করিলাম, তখনও যেন উষা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আকাশ ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন, বাতাসের নাম মাত্র নাই, সমুদ্র স্থির। জাহাজখানি অটলভাবে দ্রুতগতি রেঙ্গুনাভিমুখে ছুটিতেছিল।

কাপ্তেন হইতে অধস্তন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত বিষণ্ণ—চিন্তান্বিত, যেন ভাবী বিপদের আশঙ্কার সম্ভব। যাহারা প্রায়ই হাস্য-পরিহাস করিয়া মনের আনন্দে দিনপাত করিত, সেদিন তাহারাও কাহারও সহিত কথা কহিল না। সকলেই ব্যস্ত, যেন একটা মহোৎসবের আয়োজনে নিযুক্ত।

আমি উপরের পাটাতনের একটী নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া

ঐ ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলাম, এমন সময় জাহাজের পশ্চাৎ দিকে একখানি চেয়ারের উপর একটী বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলাম। গত রাত্রে ঐ বৃদ্ধেরই কথা খগেন্দ্রবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। উহার অদ্ভুত আচরণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। আমি ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বৃদ্ধ একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমি অনেক নিকটবর্ত্তি হইলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের মাংস শিথিল হইয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে তিনি সেই চেয়ারের উপর বসিয়া সমুদ্র দেখিতেছিলেন। তাঁহার কিছু দূরে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল। ঐ ভৃত্যকে দেখিবামাত্র আমার মনে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল। ভাবিলাম, তাহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি।

ভৃত্য একদৃষ্টে সেই বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াছিল। বোধ হয়, পাছে বৃদ্ধ কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন কিম্বা তাহার নিজের কোনপ্রকার অনিষ্ট হয়, এই ভয়েই সে নির্নিমেষ নয়নে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াছিল।

ভৃত্য এইরূপে থাকায় আমি তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার স্মরণ হইল, লোকটার ভাইকে রণেন্দ্রনাথের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম, রণেন্দ্রই ইহাকে সঙ্গে লইয়াছেন। কিন্তু লোকটা ত একজন বৃদ্ধের সেবায় নিযুক্ত দেখিতেছি।

এ কি রহস্য? উকিলের চাকর আমাকে মিথ্যা বলিবে কেন? সে যাহা শুনিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে। এই লোকটা

দেখিতে ঠিক রণেন্দ্রনাথের বাড়ীর চাকরের মত, তাহাকে দেখিবা মাত্র বোধ হইয়াছিল, যেন তাহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; আমি তাহাকে আর কখনও দেখি নাই, তাহার যমজ ভ্রাতাকে রণেন্দ্রনাথের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম।

যদি সত্য সত্যই রণেন্দ্রনাথ তাহাকে লইয়া পলাইয়া থাকেন, আর যদি তিনি এই জাহাজে থাকেন, তাহা হইলে ঐ বৃদ্ধকেই রণেন্দ্র বলিতে হয়। শুনিয়াছি, রণেন্দ্রনাথ একজন যুবা পুরুষ, বৃদ্ধ নহে। এ কি রহস্য! তবে কি রণেন্দ্রনাথ বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন?

আশ্চর্য্য নয়। যে ব্যক্তি জাল করিয়া আশী হাজার টাকা আত্মসাৎ করিতে পারে, সে নিতান্ত সহজ লোক নয়। আমি পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া বোধ হইল না। কেবল সেই ভৃত্যকে দেখিয়াই তাহার উপর সন্দেহ হইয়াছিল।

অনেকক্ষণ দেখিয়াও আমি তাঁহার ছদ্মবেশ ধরিতে পারিলাম না। আরও কিছু অগ্রসর হইলাম, সেদিকে বেশী লোক ছিল না। তাহারা প্রভু ও ভৃত্য ব্যতীত আর দুইজন মাত্র বসিয়াছিলেন, আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর বৃদ্ধ হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার মাংস শিথিল বটে, কিন্তু বর্ণ যেন অস্বাভাবিক, যেন মৃত-মনুষ্যের মত। দূর হইতে একপ্রকার দেখিয়াছিলাম, নিকটে আর এক প্রকার। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি বৃদ্ধের মত নহে। যৌবনে চক্ষু যেমন চঞ্চল থাকে, এই বৃদ্ধের চক্ষুরও ঠিক সেই ভাব। এই চক্ষু দেখিয়া আমার ভয়ানক সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, এ সন্দেহ কিরূপে দূর করা যায়। একবার

মনে করিলাম, খগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত এ রহস্য ভেদ করিতে পারিব। যদি জানিতে পারি যে, বৃদ্ধ ছদ্মবেশী, তাহা হইলে উহাকে রণেন্দ্র বলিয়া গ্রেপ্তার করিব।

খগেন্দ্রনাথের সহিত দুইএকবার মাত্র আলাপ করিয়া এত বন্ধুত্ব হইয়াছিল, যেন তিনি অনেকদিনের আমার পরিচিত বন্ধু। খগেন্দ্রনাথ যদি এ বিষয়ে কিছু অবগত থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমায় সে কথা বলিবেন।

এই মনে করিয়া খগেন্দ্রনাথের অন্বেষণে জাহাজের অপর দিকে গমন করিলাম। কিন্তু তখন তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। একজন খালাসীর মুখে শুনিলাম, তিনি আপন কামরায় শয়ন করিয়া আছেন। দন্ত রোগের ভয়ানক যাতনায় না কি অস্থির হইয়াছেন।

আমি অগত্যা ফিরিয়া আসিলাম। পূর্ব্বে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখানে আসিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। ভৃত্যও আর সেখানে দাঁড়াইয়া নাই। ভৃত্যের সহিত দেখা করিয়া দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। যেদিকে বৃদ্ধের কামরা ছিল, সে কথা আমি খগেন্দ্রনাথের মুখেই শুনিয়াছিলাম, সেই দিকে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, দুইটি পাশাপাশি কামরাই ভিতর হইতে আবদ্ধ। একটীর দ্বারে সেই ভৃত্য।

আমি অতি সন্তর্পণে ভৃত্যের নিকটে যাইলাম। সঙ্কেত করিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলাম। সে ঘাড় নাড়িল। বুঝিলাম, সে আসিতে পারিবে না। তখন আস্তে আস্তে দুইএকটা মিষ্ট কথায় তাহাকে বশ করিলাম এবং কিছুদূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

পরে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তুমি ত বেশ সুখে আছ?"

ভৃত্য আমায় ভদ্রলোক দেখিয়া এবং আমার ধনী লোকের মত পোষাক দেখিয়া, আমার হাসিতে গলিয়া গেল। সেও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমার বড় সুখের চাকরি; আমায় হয় পাগল করিবে, না হয় একদিন উহাঁরই হাতে আমার প্রাণ যাইবে। কাল বৈকালে একটা তেলের বোতল ছুড়িয়াছিলেন। যদি মাথায় লাগিত, তাহা হইলেই মরিয়া যাইতাম।"

আ। এ চাকরি তোমার কত দিনের?

ভৃ। আজ্ঞে বেশী দিনের নয়—আট দশদিন মাত্র। বাবু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য রেঙ্গুন যাইতেছেন। ভৃত্যের প্রয়োজন, আমি নিষ্কর্ম্মা ছিলাম, কাজেই এই ভয়ানক কাজে নিযুক্ত হইয়াছি।

নাম গোপন করিল দেখিয়া, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?"

ভৃ। হরিদাস।

আ। নিবাস?

ভৃ। রাণাঘাট।

আ। তোমার মা বাপ বর্ত্তমান?

ভৃ। আজ্ঞে না।

আ। ভাই আছে?

ভৃত্য এবার আর তখনই উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলিল, "আজ্ঞে না।"

উত্তর দিতে বিলম্ব দেখিয়া আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। কিন্তু সে বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভৃত্যের সহিত তাহার পারিবারিক কথা কহিতে লাগিলাম।

এইরূপে নানা কথায় বেলা প্রায় এগারটা বাজিল, কিন্তু আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। কৌশলে ভৃত্যকে অনেকবার তাহার প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু হয় সে অত্যন্ত চতুর, আমার চক্ষেও ধূলি দিল,—না হয় বৃদ্ধ রণেন্দ্রনাথ নহে। ভৃত্যকে বৃদ্ধের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহার নাম 'অনাথবন্ধু।' যে লোক এত কাণ্ড করিতে পারে, সে যে নাম লুকাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

খগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃত কথা জানিতে পারিব, এই মনে করিয়া আমি আমার কামরায় ফিরিয়া আসিলাম এবং সত্বর আহারাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম।

বেলা চারিটার সময় কামরা হইতে বাহিরে যাইলাম। দেখিলাম, আকাশের অবস্থা আরও ভয়ানক। মেঘ ক্রমে ঘন হইতে লাগিল, অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। জাহাজের ভিতর বেলা চারিটার সময়েই বৈদ্যুতিক আলোক প্রজ্বলিত হইল।

বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে সহসা খগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। বিনাক্লেশে তাঁহার দর্শন পাওয়ায় আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম; এবং তখনই তাঁহার যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্নে পরম আনন্দিত হইয়া তিনি বলিলেন, অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন!

অন্যান্য অনেক কথার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "খগেন্দ্র বাবু! আপনি ত বৃদ্ধের সহিত খুব ঘনিষ্টতা করিয়াছেন, উহার মধ্যে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?"

আমার কথায় খগেনবাবু আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, দেখিয়াছি; কিন্তু সে বিষয় আমি অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। আপনি এখন জিজ্ঞাসা করাতে আমার স্মরণ হইল। আপনি বৃদ্ধের চক্ষের জ্যোতির কথা বলিতেছেন ত ?"

খগেন্দ্রনাথের কথায় আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমি দুই হস্তে তাঁহার দুটী হাত ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছ ভায়া! আমিও ঐ চোখের কথাই বলিতেছিলাম।"

খগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমারও সন্দেহ হইয়াছিল।" আমি বৃদ্ধকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম, বিশেষ নজর রাখিলাম, কিন্তু কিছুই ধরিতে পারিলাম না। ঐ চোখেই বৃদ্ধের কিছু বিশেষত্ব আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যখন খগেন্দ্রবাবুর সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে জাহাজের কাপ্তেন একখানি সংবাদপত্র লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। জাহাজে অনেকগুলি লোক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞ। আমরা সামান্য লিখিতে ও পড়িতে পারি জানিয়া, কাপ্তেন আমার হাতে

সেই সংবাদপত্র দিয়া বলিলেন, "দেখুন, একজন বাঙ্গালীর কার্য্য দেখুন। জাল চেকের সাহায্যে প্রায় লক্ষ টাকা লইয়া লোকটা কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।" দেখিলাম, আমরা যেদিন জাহাজে উঠিয়াছি, ঐ সংবাদপত্রখানিও সেইদিন বৈকালে বাহির হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সে কথা আমি অনেক পূর্ব্বেই জানিতাম এবং দোষীকে ধরিবার জন্যই আমি তখন জাহাজে ছিলাম। কিন্তু সাহেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি যেন স্তম্ভিত হইলাম। বলিলাম, "সে কি! এত টাকা ভাঙ্গিয়া লোকটা পলায়ন করিয়াছে?"

এই বলিয়া তাঁহার হাত হইতে সংবাদপত্রখানি লইলাম এবং খগেন্দ্রনাথের সমক্ষে সেই অংশ পাঠ করিলাম। দেখিলাম, খগেন্দ্রনাথ যেন বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে তিনি আত্মসংবরণ করিলেন।

আমি এইরূপ ভাব দেখাইলাম, যেন তাঁহার বিমর্ষ মুখখানি আমি লক্ষ্য করি নাই। খগেন্দ্রনাথ আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটার নাম কি?"

আমি বলিলাম, "রণেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যাঙ্কের একজন কেরাণী।"

খ। কবে এ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে?

আ। যেদিন আমাদের জাহাজ ছাড়ে, সেই দিনেই জানা গিয়াছিল। কবে যে জাল হইয়াছিল, সে কথা সংবাদপত্রে লেখা নাই।

খ। তবে ত সে আজ দুই তিনদিনের কথা; হয়ত ইতিমধ্যে অপরাধী ধৃত হইয়াছে।

আ। সে কথা বলা যায় না। এ রকম লোক যে সহজে ধরা পড়িবে, এমন বোধ হয় না।

খ। কত টাকা জাল করিয়াছিল ?

আ। প্রায় লক্ষ টাকা।

খ। লোকটা যে রাতারাতি ধনবান হইয়া পড়িয়াছে ?

আ। যেমন রাতারাতি বড়মানুষ হইয়াছে, তেমনি আবার রাতারাতি ফকির হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে পক্ষপাত নাই। যে যেমন কাজ করে, সে সেই মতই ফল পাইয়া থাকে।

আমার শেষ কথায় খগেন্দ্রনাথ হাস্য করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

ক্রমে অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া আসিল, মেঘমণ্ডল যেন স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে লাগিল। বাতাসের লেশ মাত্র ছিল না। তাহার উপর যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই যেন আরও গুমোট হইতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার পর খগেন্দ্রবাবু নিজ কামরায় চলিয়া গেলেন। আমিও সমস্ত দিন ভয়ানক চিন্তায় এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, রাত্রে যৎসামান্য জলযোগ করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। এবং অনতিবিলম্বে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখনও ভয়ানক অন্ধকার। জাহাজের প্রত্যেক কামরায় বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছিল। সে আলোকে ঘড়ী দেখিলাম, রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। চারিদিকের ভয়ানক কোলাহল, বাতাসের ভয়ানক গর্জ্জন এবং তাহার উপর আরোহীদিগের আর্ত্তনাদে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, ঝড় আরম্ভ হইয়াছে।

যে ঝড়ের আশঙ্কা করিয়া কাপ্তেন হইতে খালাসী পর্য্যন্ত এতক্ষণ বিষণ্ণভাবে সময়াতিপাত করিতেছিল, যাহার ভয়ে এতক্ষণ

তাহারা পরস্পর কথাটী পর্য্যন্ত কহে নাই, এখন সেই ঝড় যেন দ্বিগুণ বেগে সমুদ্রের তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক ঝড় বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে। এক একবার ঝড়ের প্রকোপে জাহাজখানি টলমল করিতেছিল। বোধ হইল, যেন পরক্ষণেই উহা আরোহীগণ সমেত জলমগ্ন হইবে। আমি কামরা হইতে বাহির হইলাম। আমাকে দেখিয়া একজন সাহেব বলিলেন, "বাবু, ঘরের ভিতর যান্। শেষে কি এই ঝড়ে প্রাণ দিবেন?"

সাহেবের কথা শুনিয়া আমার মনে রাগ হইল। বলিলাম, "সাহেব! বাঙ্গালীরা কি এতই ভীরু যে, ঝড়ের সময় বাহিরে আসিতে পারে না?"

আমার কথায় সাহেব অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, "না মহাশয়! আমি সেরূপ মনে করি না। আপনার মঙ্গলের জন্যই আমি ঐ কথা বলিয়াছি। যদি আপনি এই বাতাসের বেগ সহ্য করিতে পারেন, ভালই ত। তবে ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন কেন? আসুন, এইখানে বসিয়া দেখা যাউক।"

সাহেব যে স্থানটী নির্দ্দেশ করিলেন, বাস্তবিক উহা নিরাপদ। সাহেব একখানি চেয়ার লইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং আমাকেও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।

প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল, পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গগুলি যেন জাহাজকে চাপিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে বোধ হইতে লাগিল। ইতি-পূর্ব্বেই জাহাজের পালগুলি নামাইয়া রাখা হইয়াছিল, পাছে ঝড়ে জাহাজের কল খারাপ হইয়া যায়, সেই ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই জাহাজ

বদ্ধ করা হইয়াছিল। ঝড়ের প্রকোপে জাহাজখানি পিছু হটিতে লাগিল।

ক্রমে পাঁচটা বাজিল। ঝড় স্থগিত হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমি একবার খগেন্দ্রনাথের সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু অন্ধকারে জাহাজের সেই দিকে যাইতে পারিলাম না। যেখানে বসিয়াছিলাম, সেইখানেই বসিয়া রহিলাম।

আরও একঘণ্টা অতীত হইল। অল্প অল্প আলোক দেখা দিল। সেই আলোকে আমি দেখিলাম, দূরে সেই বৃদ্ধ একস্থানে নিশ্চল নিস্পন্দবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

বৃদ্ধকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট যাইবার জন্য আমার ইচ্ছা হইল। কিন্তু যে সাহেব আমার নিকট বসিয়াছিলেন, তিনি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, ঝড়ের এত বেগ যে, হয়ত খগেন বাবুর নিকট যাইতে যাইতে আপনি নিজেই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবেন।

সাহেবের কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও আমি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই একটা ভয়ানক দমকা বাতাস আসিল, জাহাজ যেন টলমল করিয়া উঠিল। যে সকল আরোহী এতক্ষণ বাহিরে পাটাতনের উপর ছিল, তাহারা আপন আপন কামরায় পলায়ন করিল। সেই সময় খগেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ ঝড়ের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাহেব সেই ঝড়ের সময়েও জাহাজের ছোট নৌকা নামাইয়া দিলেন, চারিজন খালাসির সহিত একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী উহাতে সেই সময়ে সেই ভয়ানক সমুদ্রের মধ্যে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তরঙ্গের

মধ্যে ঐ নৌকা আর দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা পরে আরোহীর সহিত ঐ নৌকা জাহাজে আসিয়া লাগিল। তাহারা একটী বৃদ্ধের ছদ্মবেশ মাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোন মনুষ্যকে প্রাপ্ত হইলেন না।

এই অবস্থা দেখিয়া আমার মনে ধারণা হইল যে, রণেন্দ্রনাথ বৃদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু কোন-রূপে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাঁহারই সহিত এক জাহাজে গমন করিতেছি, সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে ধরিব। এই ভাবিয়া তিনি অপমানের ভয়ে সমুদ্রে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার ছদ্মবেশ ভালরূপ পরা ছিল না, সুতরাং উহা তাঁহার অঙ্গ-চ্যুত হইয়া ভাসিয়াছে, কিন্তু রণেন্দ্র সেই অগাধ সমুদ্র কবলে কবলিত হইয়াছেন।

এই সংবাদ তখনই জাহাজের চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সকলেই বৃদ্ধকে দেখিয়াছিল, বৃদ্ধের অদ্ভুত আচরণ ও নানাপ্রকার জটিল রোগের কথাও অনেকেই শুনিয়াছিল। বৃদ্ধের অপঘাত মৃত্যুতে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

আরও দুই ঘণ্টা অতীত হইল। ক্রমেই বাতাসের বেগ কমিতে লাগিল। বেলা দশটার সময় ঝড় থামিল। এগারটার পর সূর্য্যদেব আকাশমার্গে দেখা দিলেন। বেলা একটার মধ্যেই প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল, সমুদ্র স্থির হইল, আকাশমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করিল। স্তরে স্তরে সজ্জিত নবঘননীরদমালা যেন কোথায় অদৃশ্য হইল। রৌদ্রে কাঠ ফাটিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমি খগেন্দ্রনাথের নিকট গমন করিলাম। দেখিলাম, তিনি বৃদ্ধের জিনিষ পত্র কাপ্তেনকে বুঝাইয়া দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া অতি দুঃখিতভাবে বলিলেন, "বৃদ্ধের অপঘাত মৃত্যুর কথা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে যিনি যাহাই বলুন, আমার সহিত তিনি কখনও অন্যায়াচরণ করেন নাই। জানি না, কেন তিনি দুইজন নিরীহ লোককে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি আমার চিকিৎসাধীনে ছিলেন, আমি প্রায়ই তাঁহার কামরায় আসিতাম; সুতরাং তাঁহার কোথায় কি জিনিষ-পত্র আছে, তাহা আমার জানা আছে। পাছে তাঁহার ভৃত্য ঐ সকলের কোনটী আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, এইজন্য জাহাজের কাপ্তেন আমারই সাক্ষাতে তাঁহার দ্রব্যগুলির ভার লইতে ইচ্ছা করেন। আমি উহঁারই অনুরোধে বৃদ্ধের জিনিষ-পত্র দেখাইয়া দিতেছি।

কাপ্তেন বৃদ্ধের একটী ট্রাঙ্ক, একটা চামড়ার ব্যাগ, খানকয়েক কাপড়, তিনটা জামা, একটা ছাতা ইত্যাদি লইয়া প্রস্থান করিলে পর, আমি খগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধের বাড়ী কোথায় জানেন ?"

খগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না। আশ্চর্য্য এই যে, একসঙ্গে থাকিয়া কত কথাই কহিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পারিবারিক কোন কথাই জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল তাঁহার রোগের কথা লইয়াই থাকিতাম।"

খগেন্দ্রনাথ যেরূপে শেষোক্ত কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমার কেমন অবিশ্বাস জন্মিল। এতাবৎ কাল তাঁহার উপর কোন বিষয়ে আমার সন্দেহ হয় নাই; কিন্তু এই কথায় কেন অবিশ্বাস হইল বলিতে পারি না।

বৃদ্ধের ভৃত্যের উপরেও সন্দেহ হইল। সে এখন খগেনবাবুর সহিত এরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহে, যেন সে তাঁহার বহুদিনের চাকর। কেন এমন হইল? যে ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে অপরের ভৃত্য ছিল, সে এখন খগেনবাবুর এত পরিচিত হইল কিরূপে? তবে কি তাহারা পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরের পরিচিত? রণেন্দ্রের বয়স প্রায় খগেন্দ্রনাথের মত। ভৃত্য কি তবে খগেন্দ্রনাথেরই? যদি তাহাই হয়, তবে সে এই দুইদিন বৃদ্ধের চাকর বলিয়া পরিচয় দিল কেন? পুলিসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য কি? যদি কেহ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে ঐ বৃদ্ধকেই ধরিবে। খগেন্দ্রনাথ তবে কে? যদি এই ভৃত্য খগেন্দ্রনাথের হয়, তাহা হইলে ইনিই রণেন্দ্র। রেঙ্গুনে পঁহুছিবামাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিব। কিন্তু রণেন্দ্রের আকৃতির যেমন বর্ণনা শুনিয়াছি, খগেন্দ্রের আকৃতি তেমন নয়। যদি ভৃত্য স্বীকার করে যে, সে খগেন্দ্রনাথের বেতনভোগী, তবেই খগেনকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি হাসিতে হাসিতে খগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধকে পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়াছিলেন?"

খগেন্দ্রনাথও ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "না ভাই, তাহা হইলে আগেই আপনাকে বলিতাম। এই দেখুন না, চাকরটাকে একটী টাকা দিয়া তবে বশ করিতে পারিয়াছি। আরও কতদিন সমুদ্রে থাকিতে হইবে, বলা যায় না। ঝড়ে আমাদের জাহাজ-

খান কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও এখন জানা যায় নাই। এ অবস্থায় একজন চাকর সঙ্গে থাকিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। এই মনে করিয়া হরিদাসকে আমার চাকর স্বরূপ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বিশেষতঃ উহার মনিবের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। এখানে এমন কোন লোক নাই, যিনি উহাকে কিছু-দিন ভৃত্যস্বরূপ রাখিবেন। সেইজন্য আমিই উহাকে আপাততঃ আমার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি।"

আ। হরিদাসের সহিত আপনার প্রথম আলাপ হয় কোথায়?

খ। এই জাহাজে, পূর্ব্বে আমিও উহাকে চিনিতাম না, হরিদাসও আমাকে চিনিত না।

আ। আপনার মত চতুর লোক আজকাল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দুই তিন দিন আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেই কেমন আপনার বশীভূত হইয়া পড়িতে হয়। এই ক্ষমতা সাধারণ নহে।

খগেন্দ্রনাথ আমার কথায় আন্তরিক বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ব্রাহ্মণ, বলুন দেখি, এখন বৃদ্ধের শ্রাদ্ধাদি কোথায় কিরূপে ও কাহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত?"

আ। বৃদ্ধের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। এ অবস্থায় অশৌচ তিন দিন মাত্র। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য তাঁহার আত্মীয় স্বজনের দ্বারাই হওয়া উচিত।

খ। কেই বা সেখানে সংবাদ দিবে? ভৃত্যটী যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তাহার দ্বারা একার্য্য হওয়া অসম্ভব।

কা। কেন? হরিদাস ত বেশ চতুর লোক।

খ। স্বীকার করি; কিন্তু সে এই দুঃসংবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না।

আ। সে ত বৃদ্ধের বাড়ী জানে?

খ। আমি ত সেইরূপই জানিতাম। কিন্তু তাহার মুখে আজ শুনিলাম যে, সেও বৃদ্ধের বাসস্থান জানে না।

আ। সে কি! নিশ্চয়ই হরিদাস আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছে। ভৃত্য হইয়া প্রভুর বাড়ী জানে না? অসম্ভব। হরিদাস কি বলে?

খ। সে বলে, যেদিন সে বৃদ্ধের সহিত জাহাজে আরোহণ করে, তাহারই পূর্ব্বদিন তিনি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আ। আমি ত এ রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হরিদাসের মুখে শুনিলাম, তাহার বাড়ী রাণাঘাটে। সে কি তবে বৃদ্ধকে রাণাঘাটেই দেখিয়াছিল? সেইখানেই কি বৃদ্ধ তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল?

খ। সে কথা ঠিক জানি না। হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

খগেন্দ্রনাথের কথার উত্তর না দিয়া আমি হরিদাসের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আর এক-জন ভৃত্যের সহিত কি কথা কহিতেছে। আমি তখনই তাহার নিকট গমন করিলাম এবং ইঙ্গিত করিয়া হরিদাসকে নিকটে ডাকিলাম।

আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরিদাস, তোমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি

নিতান্ত গরিব। অর্থাভাবেই তোমাকে পরের চাকরি করিতে হইতেছে। কেমন, একথা সত্য কি ?"

হরিদাস অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল, আজ্ঞে হাঁ, আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য।"

আ। যদি কোন উপায়ে কিছু অর্থ পাও, তাহা হইলে এ চাকরি ছাড়িয়া দিতে পার ?

হ। কেন পারিব না। পয়সা পাইলে, যাবজ্জীবন ভরণ-পোষণ চলিতে পারে, এমন অর্থ পাইলে, আমি আর চাকরি করিব কেন ?

আ। আমি যদি অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায় দেখাইয়া দিই, তাহা হইলে তুমি তাহা করিবে কি ?

হ। নিশ্চয়ই করিব। তবে চুরি করিতে পারিব না। ও কার্য্য আমার দ্বারা হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই।

আ। আমি এত নীচ নহি যে, তোমাকে চুরি করিতে পরামর্শ দিব। তবে উপায়টী অতি গোপনীয় ; তুমি ভিন্ন আর কোন লোক জানিতে পারিবে না।

হ। বেশ কথা, আমি সম্মত হইলাম। আপনি বলুন, আমায় কি করিতে হইবে।

আ। আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, যদিও আমার কথা তোমার মনঃপূত না হয়, তাহা হইলেও তুমি সেকথা প্রকাশ করিবে না ?

হ। আজ্ঞে না। আমি আপনার পা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি যে, আপনার কথায় আমি স্বীকৃত হই বা না হই, আমার দ্বারা কোন কথা প্রকাশিত হইবে না। বলুন, কি করিতে হইবে ?

আ। আগে আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথাযথ উত্তর দাও, পরে সেই উপায় ব্যক্ত করিব।

হরিদাস সম্মত হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার সহিত খগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে আলাপ ছিল কি না?"

হরিদাস উত্তর করিল, "আমি আপনার পা স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, খগেন্দ্রবাবুর সহিত আমার আলাপ ছিল না। আমি জাহাজে উঠিয়া জানিতে পারি যে, উহাঁর নাম খগেনবাবু।"

হরিদাস যেভাবে উত্তর করিল, তাহাতে তাহার কথায় আমার অবিশ্বাস হইল না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধের সহিত তোমার কতদিনের আলাপ?"

হ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। জাহাজে উঠিবার পূর্ব্ব দিন হইতে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল।

আ। বৃদ্ধের বাড়ী কোথায় জান?

হ। আজ্ঞে না।

আ। সত্য করিয়া বল, যখন তুমি তাহার চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন তাঁহার কি নাম, কোথায় নিবাস, এ সকল না জানিয়াই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ?

হ। মনিবেরাই চাকরের নাম, নিবাস জানিয়া, এমন কি, জামিন পর্য্যন্ত লইয়া চাকরি দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভৃত্যের কর্ম্ম করিবে, সে কোন্ লজ্জায় প্রভুর নাম, নিবাস জিজ্ঞাসা করিবে? আপনি আমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন।

আ। না হরিদাস, সন্দেহ করিতেছি না। তোমার কথায়

আমার অবিশ্বাস নাই। কিন্তু বৃদ্ধের নিবাস জানিতে না পারিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট কিরূপে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়া দিব।

হ। আজ্ঞে, সেকথা সত্য বটে, কিন্তু বাস্তবিকই আমি তাঁহার সন্ধান জানি না।

আ। তুমি কি তাঁহার বাড়ীতে পর্য্যন্ত যাও নাই? পথে পথে তিনি তোমায় চাকরি দিলেন? না হরিদাস, সত্যই আমার এখনও সন্দেহ যাইতেছে না। আমি তোমাদের রহস্য বুঝিতে পারিতেছি না।

হরিদাস কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। পরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি সমস্তই সত্য বলিয়াছি। বৃদ্ধ আমাকে যে বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন, সে বাড়ী তাঁহার নিজের নয়, আর তিনি সে বাড়ীতেও থাকিতেন না। বাড়ীখানি একটা হোটেল বলিলেও হয়। প্রায় কুড়িজন কেরাণী মিলিয়া ঐ হোটেলটী করা হইয়াছিল।"

আ। বৃদ্ধ কোন্ সূত্রে তোমায় সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন? সেখানে তাঁহার কি কোন পরিচিত লোক আছেন?

হ। আজ্ঞে হাঁ, শুনিলাম, সেখানে তাঁহার দূর-সম্পর্কের এক ভাই থাকেন। বৃদ্ধ তাঁহারই ঘরে সেদিন আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আ। সে বাড়ীখানি কোথায়?

হ। কলুটোলায়।

আ। তুমি দেখাইয়া দিতে পারিবে?

হ। পারিব।

আ। বৃদ্ধের নাম কি জান ?

হ। আজ্ঞে না। চাকর হইয়া মনিবের নাম জিজ্ঞাসা করিব কেমন করিয়া ?

আ। তাঁহার ভাই তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিয়া-ছিলেন, তোমার মনে আছে ?

হ। আজ্ঞে হাঁ।—দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। কোন নাম বলেন নাই।

হরিদাসকে আর কোন প্রশ্ন করিলাম না। যাহার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, যে কার্য্যের জন্য এতক্ষণ হরিদাসের সহিত বচসা করিতেছিলাম, তাহাতে নিষ্ফল হইয়া আমি একেবারে হতাশ হইলাম না, মনে মনে আর এক উপায় উদ্ভাবন করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি কাপ্তেনের নিকট গমন করিলাম। সাহেব বড় অমায়িক লোক। তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই সন্তুষ্ট। আমাকে দেখিবামাত্র সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমিও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, আমরা ঐ কয় ঘণ্টার ঝড়ে বিপরীতদিকে একদিনের পথ হটিয়া গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, যেরূপ প্রচণ্ডবেগে ঝড় বহিয়াছিল, তাহাতে ঐ পথ অতি

সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইল। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি ঝড় না হইত, তাহা হইলে কালই আমরা বন্দরে উপস্থিত হইতাম? ঝড় হওয়ার কবে সেখানে পঁহুছিব?"

কাপ্তেন হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কল্য বেলা এগারটায় সময় তীরে পঁহুছিতেন, কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না। পরশ্ব বেলা দশটার পূর্ব্বে যাইতে পারিব।"

সাহেবের সহিত আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য অনেক কথা কহিয়া, শেষে সেই ব্যাঙ্কের চুরির কথা তুলিলাম। রণেন্দ্রের উপর তাঁহারও সন্দেহ হইল।

আমি তখন সাহেবকে আমার পরিচয় দিলাম। কি জন্য সেই জাহাজে উঠিয়াছি, তাহাও বলিলাম। যাহার উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিলাম। অবশেষে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম।

তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। প্রথমে আমার কথা কোন-ক্রমেই বিশ্বাস করিলেন না। আমি তখন গুপ্ত পকেট হইতে ডিটেকটিভের 'ব্যাজ' বা কার্ডখানি প্রদর্শন করিলাম। তিনি উহা দেখিয়া এবং কার্য্যে আমার ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিয়া, আন্তরিক প্রীত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু! আমার দ্বারা আপনার কি এমন সাহায্য হইবে? তবে যদি কোন লোক আপনার অনিষ্ট কামনা করিতেছে জানিতে পারি, তাহা হইলেই আমি সাহায্য করিতে পারিব, নচেৎ নহে।"

আমি উত্তর করিলাম, "আপনি যদি আমার কথামত কার্য্য করেন, তাহা হইলেই আমি আপনার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইব।"

কা। কি করিতে হইবে বলুন ?

আ। আপনার নিকট বৃদ্ধের যে সকল কাপড় আছে, অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতে দিন।

কা। কাপড়ে কি পরীক্ষা করিবেন ?

আ। মাপ করিবেন—সেকথা এখন বলিব না।

কাপ্তেন সাহেব আমার কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া তখনই বৃদ্ধের কাপড় জামা ইত্যাদি আনিতে আদেশ করিলেন। একজন খালাসী সেগুলি আমার নিকট আনয়ন করিল। আমি একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, কাপ্তেনের শয়ন-গৃহে অতি গোপনেই এই সকল কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

কাপ্তেনের সহিত আরও কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া আমি সেখান হইতে খগেন্দ্রের নিকট যাই-লাম। তিনি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিমুখে সম্ভাষণ করিলেন। আমি তাঁহার কামরার ভিতর প্রবেশ করিলাম এবং নানা কথায় তাঁহাকে অন্যমনস্ক রাখিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহার কাপড় চোপড়গুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে কার্য্য সিদ্ধ হইল। আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। খগেন্দ্রনাথ কে ? এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ খগেন্দ্রনাথের সহিত গল্প করিয়া, আমি আমার কামরায় গমন করিলাম। যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, খগেন্দ্রনাথ কে ? বৃদ্ধের কাপড় পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার জামাগুলি নূতন, তাহাতে এখনও রজকের চিহ্ন

পড়ে নাই। কাপড় কয়খানি পুরাতন বটে, কিন্তু একখানি ছাড়া আর সকলগুলির এক রকম চিহ্ন, অপরখানির চিহ্ন স্বতন্ত্র। জামার পকেটে একখানি রুমাল ছিল, কেবল তাহার চিহ্নের সহিত সেই কাপড়ের চিহ্নের মিল ছিল। খগেন্দ্রনাথের সমুদায় কাপড় চোপড়ের একই প্রকার চিহ্ন এবং এই চিহ্ন বৃদ্ধের রুমাল ও একখানি কাপড়ের উপর যে চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপ। ইহার অর্থ কি? কেন এমন হয়? যদি একই রজকে উভয়ের কাপড় কাচিয়া থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধের সমস্ত পোষাকের চিহ্ন খগেন্দ্রনাথের কাপড়ের চিহ্নের মত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া বৃদ্ধের একখানি কাপড় ও একখানি রুমালের চিহ্ন খগেন্দ্রনাথের সহিত মিলে কেন? নিশ্চয়ই কাপড় ও রুমালখানি খগেন্দ্রনাথের এবং হয় খগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ঐ কাপড় ও রুমালখানি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, না হয় খগেন্দ্রনাথ ভুলক্রমে উহা বৃদ্ধের ঘরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। যদি শেষোক্ত কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে যখন তিনি কাপ্তেনকে বৃদ্ধের পোষাক দেখাইয়া দিতেছিলেন, সেই সময়ে ত ঐ দুইখানি দেখিতে পাইয়াছিলেন? কেন তিনি তখন উহা গ্রহণ করেন নাই?

আবার সেই সন্দেহ! তবে কি বৃদ্ধ ও খগেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি? যদি তাহাই হয়, তবে যিনি জলমগ্ন হইলেন, তিনি কে? না, উভয়ে এক ব্যক্তি হইতে পারে না। তবে কি রণেন্দ্রনাথই ছদ্মবেশে ছিলেন, তিনিই কি জলমগ্ন হইয়াছেন?

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। রহস্য ক্রমেই জটিল হইতে লাগিল। আমার বোধ হইল, সেই ভৃত্য হরিদাস ঐ বিষয়ের সমস্ত কথা জানে।

সে আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভৃত্যকে আর একবার পরীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এবার আমি একা থাকিলে হইবে না, কাপ্তেন সাহেবকে পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে সংলিপ্ত করিতে হইবে।

এই স্থির করিয়া, আমি অতি গোপনভাবে কাপ্তেন সাহেবের নিকট যাইলাম এবং তাঁহাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি তখনই হরিদাসকে নিজের নাম করিয়া তাঁহারই প্রকোষ্ঠে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে হরিদাস কাপ্তেন সাহেবের ঘরে আসিল। আমাকে সেখানে দেখিয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। আমি কোন কথা বলিলাম না; কেবল একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

হরিদাসকে উপস্থিত দেখিয়া সাহেব আগে নিজের কামরার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে হরিদাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই বাবু তোমাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার যথাযথ উত্তর দাও। কিন্তু সাবধান, যদি তোমার মিথ্যা কথা ধরা পড়ে, তাহা হইলে তোমায় জেলে দিব।"

সাহেবের কথায় ভীত হইয়া হরিদাস আমার দিকে চাহিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! "কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটীও মিথ্যা কথা নাই।"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলাম, "সেকথা আমায় বলিলে কি হইবে? সাহেব সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছেন। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এখনও সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বল। নতুবা পরে তোমাকে এইজন্য ভয়ানক অনুতাপ করিতে হইবে।"

হরিদাস কোন উত্তর করিল না, স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। আমি তখন তাহাকে মিষ্টভাষে বলিলাম, "পূর্ব্বে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে. তুমি খগেন্দ্রনাথকে চেন না। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি নিশ্চয়ই খগেন্দ্রনাথকে চেন এবং তাঁহার অনেক কথা অবগত আছ।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে হরিদাস বলিয়া উঠিল, "দোহাই ধর্ম্ম! আমি আপনার সমক্ষে মিথ্যা বলি নাই। খগেন্দ্রনাথ নামে কোন লোকের সহিত আমার আলাপ ছিল না এবং এখনও নাই।"

হরিদাসের কথার অর্থ প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। এখন তাহার কথার ভাব কতকটা বুঝিতে পারিলাম, বলিলাম, "বেশ কথা, খগেন্দ্র নামে কোন বাবুকে তুমি চেন না। কিন্তু যাহাকে আমরা খগেন্দ্রনাথ বলিয়া জানি, তাহার সহিত কি তোমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল?"

হ। আজ্ঞে হাঁ।

আ। তবে তাঁহার প্রকৃত নাম খগেন্দ্রনাথ নয়, কেমন ?

হ। আজ্ঞে না।

আ। তবে কি ?

হরিদাস কোন উত্তর করিল না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি তাহার প্রকৃত নাম খগেন্দ্র না হয়, তবে তাঁহার নাম কি ?"

হরিদাস এবার আন্তরিক ভীত হইল। বলিল, "সেকথা ত আপনারা সমস্তই অবগত। কেন আর এই গরিবের অন্ন মারিতেছেন ?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি তিনিই রণেন্দ্র বাবু ?"

হ। আজ্ঞে হাঁ।

আ। তবে বৃদ্ধ কে ?

হ। তিনিই।

আ। যিনি সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন, তিনি কে ?

হ। তিনি মানুষ বা কোন জীব নহে—একটা পোষাক মাত্র।

আ। সে কি! সকল কথা পরিষ্কার করিয়া উত্তর দাও। তোমার হেঁয়ালি বুঝিতে পারিতেছি না।

হ। রণেন্দ্রনাথ যখন পলাইয়া আসেন, তখন একটী বৃদ্ধের ছদ্মবেশ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন ; ঐ ছদ্মবেশ পরিয়াই তিনি জাহাজে উঠেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, জাহাজে হয়তো তাঁহার অনুসন্ধান হইতে পারে, নিজ বেশে থাকিলে তিনি ধৃত হইবেন, এই ভয়েই তিনি ঐরূপ পোষাক পরিধান করিয়া-

ছিলেন। তিনি দুইটী কামরা ভাড়া লন, কারণ যদি কখন তাঁহাকে তাঁহার গুপ্ত বেশ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি প্রথম কামরায় বাস করিবেন। আর যখন বৃদ্ধের পোষাক পরিধান করিবেন, তখন দ্বিতীয় কামরায় বাস করিবেন। আমাকে বৃদ্ধের চাকর বলিয়াই পরিচিত করিয়াছিলেন।

প্রথমত তিনি বৃদ্ধের বেশেই থাকিয়া জাহাজের সমস্ত লোকের অবস্থা উত্তমরূপে দেখিয়া লইয়াছিলেন, ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিচিত বা তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে এরূপ কোন লোক সেই জাহাজে নাই। এই অবস্থা জানিতে পারিলে তিনি সময় সময় বৃদ্ধের পোষাক পরিত্যাগ করিতেন।

তিনি আরও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আপনি পুলিসের কর্ম্মচারী ও আপনি রণেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানে গমন করিতেছেন। আরও জানিয়াছিলেন, তাঁহাকে চিনিতে পারে এরূপ কোন লোক আপনার সহিত নাই।

তিনি আরও জানিতে পারিয়াছিলেন, আপনি ঐ বৃদ্ধকে ছদ্মবেশী রণেন্দ্রনাথ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, সুতরাং যদি তাঁহাকে ধৃত করেন, তাহা হইলে সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে; এই ভয়ে তিনি বৃদ্ধের ছদ্মবেশ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধ ডুবিয়া মরিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করেন। কারণ এই উপায়ে তিনি আপনার চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, এই কার্য্যে আপনি স্থির করিয়া লইবেন যে, রণেন্দ্র ছদ্মবেশে ছিল, পুলিসের হাতে না পড়িতে হয়, এই ভয়ে, তিনি সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়া আপন জীবন নষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় আপনি খগেন্দ্রনাথের উপর আর কোনরূপেই

সন্দেহ করিবেন না। জাহাজ বন্দরে উপস্থিত হইলে কোনরূপে তিনি আপনার দৃষ্টির বাহির হইয়া যদৃচ্ছা পলায়ন করিতে পারিবেন।

হরিদাসের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সাহেবও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি তখন বলিলাম, "খগেন্দ্রনাথই রণেন্দ্র বাবু, ইহাকে গ্রেপ্তার করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

সাহেব সম্মত হইলেন। বলিলেন, "আপাততঃ জাহাজেই বন্দী করা যাউক। পরে রেঙ্গুনে পঁহুছিলে স্থানীয় পুলিসের হাতে দিলেই আপনার কার্য্য শেষ হইবে।"

আমিও তাহাই করিলাম। সাহেবও তাঁহার জনকয়েক কর্ম্মচারী লইয়া খগেন্দ্রনাথের নিকটে যাইলাম। দেখিলাম, তিনি একজন খালাসীর সহিত কি গল্প করিতেছেন।

আমাকে কাপ্তেন ও আরও কতকগুলি লোকের সহিত তাঁহার নিকট যাইতে দেখিয়া, তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং তখনই সমুদ্রে লম্ফ দিয়া পড়িবার অভিপ্রায় করিলেন। আমিও সেইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, তখনই তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি সমস্তই স্বীকার করিলেন।

পরদিন বেলা দশটার সময় রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলাম এবং রণেন্দ্রনাথকে স্থানীয় পুলিসের জিম্মায় রাখিয়া পরবর্ত্তী জাহাজে কলিকাতায় আগমন করিলাম।

তাহার কিছুদিন পরে রণেন্দ্রও কলিকাতায় আনীত হইলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহার বিচার হইয়া গেল। বিচারে তাঁহার সাত

বৎসর কারাদণ্ড হইল। আশী হাজার টাকার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা রণেন্দ্রের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট টাকা পাওয়া যায় নাই।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, No 187. দারোগার দপ্তর, ১৮৭ সংখ্যা

ছেলে ধরা।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [কার্ত্তিক।

ছেলে ধরা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিবস একখানি সংবাদপত্রে একটী ছেলে ধরার ঘটনা প্রথম প্রকাশিত হয়! ছেলেটীর বয়ঃক্রম ষোল বৎসর। তাহার প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া, আমরা তাহাকে যদুনাথ ঘোষ নামে অভিহিত করিব। যদুনাথ যেরূপ বলিয়াছিল, তাহাই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। যদুনাথ বলিয়াছিল, শ্যামবাজারের যে স্থানে ট্রামওয়ের আস্তাবল, তাহারই সন্নিকটবর্ত্তী একটী গলির মধ্য হইতে রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় যেমন আমি বাহির হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, অমনি তিনজন বলিষ্ঠ লোক দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ধরিল, ও একখানি কাপড় দিয়া মুখ বাঁধিয়া আমাকে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীর ভিতর তুলিল। গাড়ীখানি পূর্ব্ব হইতেই সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল। আমাকে গাড়ীর ভিতর উঠাইয়া যেমন তাহারা গাড়ীর ভিতর বসিল, অমনি গাড়ীখানি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে ক্রমে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল ও গঙ্গার পুলের উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া গাড়ীখানা একেবারে শালকিয়ার দিকে দ্রুতবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছুদূর গমন করিবার পর ক্রমে উহা

গঙ্গার পশ্চিম পাড়স্থিত একস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আমার মুখে কাপড় দিয়া সেই তিনজন লোক এরূপভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে, আমি কোনরূপেই চিৎকার করিতে পারি নাই, ও উহারা ঐ গাড়ীর ভিতর বসিয়াছিল বলিয়া ঐ বস্ত্র কোনরূপে উন্মোচন করিতেও সমর্থ হই নাই। একবার চেষ্টা করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু উহাদিগের বল প্রয়োগে আমাকে সে আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পর সেইরূপ বন্ধন অবস্থাতেই উহারা আমাকে সেই গাড়ী হইতে নামাইল।

নিকটেই একখানি জাহাজ গঙ্গার উপর ভাসিতেছিল। ঐ জাহাজ হইতে একখানি প্রায় দেড়ফুট পরিসর তক্তা কিনারা পর্য্যন্ত এরূপভাবে রাখা ছিল যে, উহা দেখিলে লোকে সহজেই অনুমান করিত ঐ জাহাজে গমনাগমন করিতে হইলে ঐ তক্তার উপর দিয়াই করিতে হয়।

যে তিন ব্যক্তি আমাকে ঐরূপ অবস্থায় ঐ স্থানে আনিয়াছিল, তাহারা আমাকে ধরাধরি করিয়া ঐ তক্তার উপর দিয়া সেই জাহাজের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। ঐ তক্তার মধ্যস্থানে উপস্থিত হইলে আমি নিজের উদ্ধারের নিমিত্ত একবার শেষ চেষ্টা করিলাম। অর্থাৎ উহাদিগকে সজোরে এরূপভাবে ধাক্কা মারিলাম যে, সে ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া উহাদিগের একজন সেই গঙ্গা-বক্ষে পতিত হইল, ও অপর দুই ব্যক্তিও সেই সঙ্গে তাহার অনুগমন করিল। আমিও পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম। সেই তক্তাখানি কোনরূপে ধরিয়া আপন জীবন রক্ষা করিলাম ও সেই তক্তার উপর বসিয়া সর্ব্বপ্রথম আমার সেই মুখের কাপড়খানি খুলিয়া সেই স্থান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম

ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্রমে হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে কয়েকখানি খালি গাড়ী ছিল, আমি তাহার একখানির অন্তরালে বসিয়া শ্রম দূর করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই স্থানেও এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন রেলওয়ে পুলিস কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চোর মনে করিয়া আমাকে ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে আমি নিজ অবস্থার কথা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া তাঁহার নিকট কান্নাকাটী আরম্ভ করি। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া পরিশেষে আমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। ইহার পর রাত্রিশেষে আমি আমার বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া আমার অভিভাবকের নিকট আমার এই ভয়ানক বিপদের কথা বর্ণন করি। এই গোলযোগে আমার হস্তের মূল্যবান অঙ্গুরিটী কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, জানি না।

ইহার পরদিনেই সংবাদ-পত্রে এই ঘটনার উপরোক্তরূপ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

সংবাদ-পত্রে কোন একটী বিষয় প্রকাশিত হইলে তাহাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে, ও সকলে তাহার ফলাফলের শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। এরূপ একটী গুরুতর বিষয় সহরের মধ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইল; সুতরাং সহরের মধ্যে একরূপ হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্রে প্রত্যহ কোন্ কোন্ স্থান হইতে কাহার কাহার পুত্র কন্যা পাওয়া যাইতেছে না, তাহার এক একটী তালিকা বাহির হইতে লাগিল। সুতরাং সংবাদ-পত্রের আন্দোলনের সহিত অভিভাবকদের হৃদয়ে প্রবল ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল; স্ব-

গণকে লইয়া বিশেষরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধে ও লোকমুখে ছেলে ধরার সম্বন্ধে ক্রমে নানা কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেহ কহিলেন, কলিকাতা সহরে কোথা হইতে কয়েকজন ছেলে ধরার শুভাগমন হইয়াছে। অদ্য শ্যামবাজার, কল্য শোভাবাজার, পরশ্ব চাঁপাতলা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। ছেলে ধরার ভয়ে স্কুল, পাঠশালা সকল বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটারের একেবারে অর্দ্ধেক দর্শকবৃন্দ কমিয়া গেল। ভয়ে রাস্তায় আর কাহারও ছেলে বাহির হয় না। শেষে আরও প্রচারিত হইতে লাগিল যে, কেবল ছেলেতে কুলাইতেছে না, যুবা ও যুবতীগণ পর্য্যন্ত সহর হইতে চুরি যাইতেছে।

কেহ কহিলেন, ছেলে ধরারা ছেলে চুরি করিয়া একটা জন-মানবশূন্য দ্বীপে লইয়া গিয়া সেইখানে লোকের বসতি করাইতেছে। সেই কারণ কেবল ছেলে কেন,—ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই লইয়া যাইতেছে। কেহ বলিলেন, কোথায় পোল প্রস্তুত হইতেছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গিয়াও সে পোল বান্ধিতে পারিতেছেন না। সেইখানে ১০১টা নরবলি না দিলে সে পোল তৈয়ার হইবে না, এই কারণ এই কলিকাতা সহর হইতে মানুষ চুরি যাইতেছে।

কেহ কহিলেন, ইহার ভিতর স্বদেশী ব্যাপার আছে। গত বৎসর পূজার সময় ছেলেরা বিলাতি কাপড় কেনা-বেচা বন্ধ করিয়াছিল; পাছে এ বৎসর পূজার সময়ও সেইরূপ ছেলেরা সেইরূপ করে, সেই ভয়ে বিলাতি কাপড় ব্যবসায়ী সাহেবেরা টাকা খরচ করিয়া কোথা হইতে কয়েকজন ছেলে ধরা আনিয়া

সহরময় ছাড়িয়া দিয়াছে। ভয়ে মফঃস্বলের ছেলেরা দেশে পলাইয়া যাইবে, আর কলিকাতায় ছেলেরা ঘরের বাহির হইবে না; তখন তাঁহাদের বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা অবশ্য জোর চলিবে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য রটনা, পুলিসের উপর বদ্‌নাম—ইহার ভিতর পুলিসের নিশ্চয়ই যোগ আছে; তাহা না হইলে দিন দুপুরে সহর হইতে কখন কি ছেলে চুরি যাইতে পারে?

প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে এই সকল ছেলে চুরির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সহরের মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল।

এরূপও কথা উঠিয়াছিল যে, সহরের বড় বড় লোক পুলিসের সর্ব্বপ্রধান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় এরূপ ভাবও প্রকাশ পাইয়াছিল যে, পুলিসের যোগেই এই ছেলেধরার ব্যবসা চলিতেছে। এদিকে হাটে, মাঠে, বাজারে, রাস্তায়, ট্রামগাড়ীতে কেবল ঐ ছেলেধরার গল্প চলিতে লাগিল। আবার এমন বৈঠকখানা নাই, যেখানে এই ছেলেধরার কথা আলোচিত না হইতেছে। দুইজন লোক একত্রিত হইলেই ঐ ছেলে ধরার কথা। শেষে পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী সাহেবেরও আসন টলিল। কারণ সংবাদ-পত্রে পুলিসের ঘাড়ে নানারূপ দোষারোপ করা হইতেছিল। সংবাদ-পত্রে বর্ণিত প্রত্যেক তদন্তের ভার পুলিস-কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হইল। সেই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে আমিও একজন মনোনীত হইয়াছিলাম।

এই সকল ছেলেধরার ঘটনা অদ্ভুত হইলেও, অনেকগুলি এক রকমের, সুতরাং তাহা পাঠকগণের তৃপ্তিকর হইবে না। সেই কারণ বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত করিলাম।

যখন সহরবাসী সম্ভ্রান্ত লোকগণের মনে ধারণা হইল যে, প্রকৃতই বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণ ধৃত হইয়া স্থানান্তরিত হইতেছে, তখন তাঁহারা পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া কহিলেন, ট্রিনিদাদ ও মরিসস্ প্রভৃতি স্থানে কুলির কার্য্য করাইবার জন্যই বোধ হয়, এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, যে জাহাজ ট্রিনিদাদ ও মরিসসে কুলি লইয়া যাইতেছে, সেই জাহাজে করিয়াই একটী ভদ্রবংশীয় বালক অপর কতকগুলি বালক-বালিকার সহিত চালান হইতেছে। বাস্তবিকই এই সংবাদ প্রাপ্তির একদিবস পূর্ব্বে ঐ জাহাজ কলিকাতা বন্দর ছাড়িয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য সর্ব্ব প্রধান পুলিস-কর্ম্মচারী ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট ও এদেশীয় দুই-একজন সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে লইয়া একখানি দ্রুতগামী ষ্টিমলঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক সেই জাহাজের অনুসরণ করিলেন। অর্দ্ধ পথ যাইতে না যাইতে ঐ জাহাজখানি ধরিয়া উহার ভিতর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলেন;—কোনও অপহৃত বালক বালিকা বা যুবক-যুবতী প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং সেইস্থান হইতে বিষণ্নমনে সকলকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। যে ভদ্রবংশীয় বালকের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, সেই বালককে বহুদিবস পরে পাওয়া যায়। সে পড়ার ভয়ে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া কোন দূরদেশে গমন পূর্ব্বক লুকাইত ভাবে অবস্থান করিতেছিল। যেরূপ উপায়ে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সবিশেষ বিবরণ পাঠকগণ পরে অবগত হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি বালক নহে—একজন যুবা কেরাণী চুরি।" তিনি নিজে থানায় আসিয়া যে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ।—

কেরাণী বাবু—দেশ হইতে কলিকাতায় চাক্‌রী করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি হ্যারিসন রোডের উপর একটা মেসে থাকিতেন। অনেকদিন দেশে যান নাই; বাড়ীতে যুবতী স্ত্রী আছে, সুতরাং যুবকের বাড়ী যাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মন বড়ই চঞ্চল হইত। দুই-একদিনের ছুটিতে বাড়ী যাওয়া চলে না, সুতরাং আগামী পূজার সময় ছুটি পাইলেই বাড়ী যাইবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ এক টেলিগ্রাফ পাইলেন, বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী পীড়িত ও একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে। এই টেলিগ্রাফ পাঠ মাত্রেই তাঁহাকে দেশে রওনা হইতে বলা হইয়াছে। তিনি টেলিগ্রাফ পাঠ করিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অবশেষে চাক্‌রী থাকুক, বা যাউক, সেই দিন রাত্রের গাড়ীতেই বাড়ী যাওয়া স্থির করিলেন। সন্ধ্যার পর কয়েকটি আবশ্যকীয় দ্রব্য খরিদ করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তিনজন খুব বলিষ্ঠ লোক আসিয়া তাঁহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল, এবং তাঁহার মুখের ভিতর কাপড় পুরিয়া দিল। কেরাণী বাবুর তখন আর কথা কহিবার ক্ষমতা রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত-পাও বাঁধা হইল। যুবকের আর নড়িবার-চড়িবার শক্তি রহিল না। রাস্তার ফুটপাতের গায়েই একখানি গাড়ী

প্রস্তুত ছিল, তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সেই গাড়ীর মধ্যে পোরা হইল। গাড়ী তৎক্ষণাৎ শ্যামবাজারের দিকে ছুটিল। টালার পোল পার হইয়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোডের উপর দিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে শেষে সেই রাস্তার ধারের একটা বাগানের মধ্যে সে গাড়ী প্রবেশ করিল। ফটক পার হইয়া গাড়ী যখন সেই বাগানের মধ্যস্থিত একটা গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সেই গাড়ী থামিল। তখন বাবুটিকে সেই গাড়ী হইতে ধরাধরি করিয়া নামান হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাবুটির চীৎকার করিবার কিম্বা নড়িবার-চড়িবার শক্তি ছিল না। ভয়েই তখন তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবিলম্বেই তাঁহাকে উপরে তোলা হইল।

ত্রিতলের একটা ঘরের মধ্যে বাবুকে আবদ্ধ করা হয়। সে বাগান-বাড়ীখানা সাজান ছিল না,—যেন পড়ো-বাড়ী। অন্ততঃ যে ঘরে বাবুকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, সে ঘরের মধ্যে আর কোন দ্রব্যাদি ছিল না; কেবল একখানা কম্বল বাবুর শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাবুর পরিধানে একখানি ধুতি আর একখানি চাদর মাত্র ছিল। সেদিন সমস্ত রাত্রি সেই কেরাণী বাবু সেই ঘরের মধ্যে রহিলেন। অবশ্য সেই ঘরের মধ্যে পুরিয়া তাঁহার হাত, পা ও মুখের কাপড় খুলিয়া দেওয়া হয়।

তাহার পর প্রভাত হইয়া গেল। তখন বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এক বাগান-বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কোথায় যে সে বাগানবাড়ী, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দিনের বেলায়ও সেই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন সে বাগানে যে অন্য

কেহ নাই,—এই কথা মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন। রাস্তা হইতে সে বাড়ী অনেক দূর, সুতরাং চীৎকার করিলেও কোন ফল হইবে না, তাহাও বুঝিলেন। তথাপি চীৎকার করিতে ছাড়িলেন না। যতদূর উচ্চকণ্ঠ সম্ভব হইতে পারে, ততদূর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এখানে কে আছ—এখানে কে আছ?"

প্রতিধ্বনি কেবল সেই কথার উত্তর দিল, অন্য কোন উত্তর আসিল না। তখন বাবু একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বেলা একটার সময় একটা তালার চাবি খোলার শব্দ তাঁহার কর্ণে গিয়া পৌছিল। তাহার পর মুহূর্ত্তেই ঝনাৎ করিয়া সেই গৃহের দরজা খুলিয়া গেল। ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তিনি সেই দরজার দিকে চাহিলেন—দেখিলেন, কালান্তক যমের তুল্য একজন দীর্ঘাকার হিন্দুস্থানী কতকগুলি খাবার ও একলোটা জল লইয়া উপস্থিত। গত রাত্রে তাঁহার আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই। স্ত্রী পীড়িত ও পুত্র মৃত, টেলিগ্রাফে এই সংবাদ পাইয়া দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার এই বিপদ। সুতরাং তাঁহার মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ক্ষুধায় উদরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। আহার্য্য সামগ্রী ও তৃষ্ণা নিবারণের জল সম্মুখে উপস্থিত, তথাপি সেদিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া বাবু সেই ভীষণাকার হিন্দুস্থানীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সে লোকটা কিন্তু কোন কথা কহিল না—কেবল খাবার ও জল ঘরের মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ঘরের দরজা চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

হতাশ হইয়া বাবু তখন সেই কম্বলের উপর শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ কাঁদিতে লাগিলেন, আর মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিলেন।

অনেকক্ষণ পরে আবার উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া বসিয়া ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। সে বাগান এত নির্জ্জন যে, দিনের বেলায়ও কোন জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। এখন এই রাত্রিকাল, কত নির্জ্জন হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তবে অদূরে ঝিল্লী পোকার রব শোনা যাইতেছিল। আর একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দও আসিতেছিল! বাবুটি এই সময় কি মনে করিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটা খড়্‌খড়ী খুলিয়া দেখিলেন যে, জানালার গরাদে নাই। তখন উপর হইতে নীচের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে একটা মৎলব স্থির করিলেন। সেই ঘরের মেঝেয় পাতা কম্বলখানি লম্বাদিক করিয়া তিনটুকরা করিলেন। তার পর তাহার মুখে মুখে খুব দৃঢ় করিয়া গেরো দিয়া উহা খুব লম্বা করিয়া লইলেন।

এইবার সেই কম্বলখানিকে খড়্‌খড়ী হইতে মাটির দিকে ঝুলাইয়া দেখিলেন; আবার তুলিয়া লইলেন। তুলিয়া লইয়া সেই চাদরখানি সেই কম্বলের এক খুঁটে বাঁধিলেন। তখন আশানুরূপ লম্বা হইল। এইবার সেই চাদরের এক খুঁট কাটা-খড়খড়ীর নিম্নাংশে বাঁধা হইল। পরে সেই লম্বা চাদর ও কম্বল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে নীচে নামিতে লাগিলেন। শেষে

যখন মাটিতে তাঁহার পা ঠেকিল, তখন তাঁহার ধড়েও প্রাণ আসিল। সেই বাগানের মধ্যে কিছুদূর গমন করিয়া একটী প্রাচীর দেখিতে পাইলেন। সেই প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। সম্মুখে যে রাস্তা পাইলেন, সেই রাস্তা ধরিয়াই দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কোন্‌দিকে চলিয়াছেন, কিছুই তাহার জ্ঞান ছিল না। দৌড়িতে দৌড়িতে তিনি কলিকাতা সহরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছেন বুঝিলেন বটে, কিন্তু সহরের কোন্ অংশে আসিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে যখন তিনি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের 'কমল কুটিরের' সন্নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার রাস্তা ঠাওর হইল। পরে তিনি হ্যারিসন রোডের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। তখন রাত্রি প্রায় ১টা। ভিতর দিক হইতে সে বাড়ীর দরজা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেক ক্ষণ কড়া নাড়ার পর বাসার একজন লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। বাবুর সাড়া পাইয়া বাসার অন্যান্য লোক তখন উঠিয়া পড়েন, এবং তাঁহার মুখে এই ছেলে ধরার ভয়ঙ্কর কাণ্ড সকল জানিতে পারেন। পরদিবস থানায় আসিয়া এই সংবাদ প্রদান করেন।

তৃতীয়টী চাঁপাতলার ঘটনা।—এবার ছেলে ধরা নয়—মেয়ে ধরা। সে এক অদ্ভুত ঘটনা—এমন বিস্ময়জনক ঘটনা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না। চাঁপাতলায় একটা গলির মধ্যে একটী খোলার ঘরে বেহারীলাল দাস নামক একজন লোক বাস করে। তাহার সেই বাড়ীতেই ছাতার বাঁটের এক কারখানা আছে। বিহারী নিজে সেই কাজ করে, আর কয়েক জন কারীকরও রাখিয়াছে। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া বেহারী চুলায় আগুন

দেয়, তার পর কারিকরগণ আসিয়া ভোরের সময় হইতে কার্য্য আরম্ভ করে। তাহাদের ফুরাণ কাজ—সুতরাং তাহাদের কাজের দিকে বিহারীকে আর দেখিতে শুনিতে হয় না। ভোরের সময় বাঁটের কঞ্চি গণিয়া দেয়, আর রাত্রে তৈয়ারী জিনিষ গণিয়া লয়। সপ্তাহ পরে কারিকরদিগের দাম চুকাইয়া দেয়। প্রতি সপ্তাহই বিহারী মহাজনকে মাল চালান দেয়। মহাজনের নিকট টাকা লইয়া, সেই টাকা হইতে অগ্রে কারিকরদের প্রাপ্য দিয়া থাকে, অবশিষ্ট টাকায় বিহারী কঞ্চি ক্রয় করে। এইরূপ করিয়া বিহারী ছাতির বাঁটের ব্যবসা চালায়।

এইবার আমরা বিহারীর সংসারের পরিবারদিগের কথা বলিব। পরিবারের মধ্যে বিহারীর স্ত্রী ও বৃদ্ধা জননী। বিহারীর বয়ঃক্রম ২৭।২৮ বৎসর হইলেও তাহার বিবাহ ২।৩ বৎসর মাত্র হইয়াছে। স্ত্রীর বয়ঃক্রম সাড়ে তের বৎসর মাত্র। নাম মঙ্গলা, দেখিতে সুশ্রী বটে, তবে আ-মরি গোছের নয়।

এক সময়ে বিহারীর কঞ্চি ক্রয় করা কলিকাতায় সুবিধা হয় নাই; এই কঞ্চি খরিদের জন্য তাহাকে দূর দেশে যাইতে হয়। তাহাতে তাহার বাড়ী ফিরিতে ৩।৪ দিন বিলম্ব ঘটে। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বিহারী শুনিল, তাহার স্ত্রীকে ছেলে ধরায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ভুবন নামে তাহার একজন কারিকর ছেলে ধরায় তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বিহারী কঞ্চি কিনিতে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় ছেলে ধরার ভয়ের কথা শুনিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, তাহার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই ছেলে ধরায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

সে থানায় আসিয়া উপরিলিখিতরূপ এজাহার করিল।

চতুর্থ ঘটনা—বাগবাজারে গিরীশচন্দ্র দাস নামক একজন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ নবীন সেন নামক একজন ১৬ বৎসর বয়স্ক বালককে থানায় আনিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আমার সুশীল নামক পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রটীকে ছেলে ধরায় কাল্ রাত্রে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই নবীন তাহার একজন বন্ধু। কিরূপে সুশীলকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, এই বালক তাহার সমস্তই অবগত আছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিবেন। গিরীশচন্দ্র দাসের কথা শুনিয়া কিরূপ অবস্থায় সুশীলকে ছেলে ধরায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। নবীন যে কথা বলিয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ।

নবীন কহিল, তিনি ও তাহার বন্ধু সুশীল স্কুল হইতে আসিয়া ফুটবল খেলিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিবার সময় পথি মধ্যে এক স্থানে তিন চারিজন লোক আপনা আপনি মারামারি করিতেছে দেখিতে পায়। পার্শ্বেই একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ঐ মারামারি দেখিয়া সুশীল ও নবীন যেমন সেই স্থানে দাঁড়াইল, অমনি যে কয় ব্যক্তি সেই স্থানে মারামারি করিতেছিল, তাহারা কহিল, ইহারাই এই মারামারি বাধাইয়া দিয়াছে, ইহাদিগকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাও। এই বলিয়া উহাদিগের মধ্যে দুই জন সুশীলকে ধরিল ও তাহাকে সেই গাড়ির ভিতর তুলিল। ইহা দেখিয়া নবীন সেই স্থান হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া আপন জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু সুশীলকে সেই গাড়ীতে করিয়া তাহারা কোথায় লইয়া গিয়াছে, সন্ধান নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যখন উহার সন্ধান পাইলাম না, তখন বাধ্য হইয়া থানায় সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

এইরূপে যে সকল বালক চুরির সংবাদ আসিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসন্ধানও হইতে লাগিল। প্রথম ঘটনার নায়ক যদুনাথ ঘোষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল যে, সালকিয়ার ঘাটে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যদুনাথ বর্ণিত কোন জাহাজ বা ষ্টিমার নাই, বা সেখানে বিগত এক সপ্তাহের মধ্যে কোন জাহাজাদি ছিল, এ কথাও কেহ বলিতে পারিল না। রেলওয়ে পুলিসের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াও এ কথা কেহ বলিল না যে, যদুনাথ ঘোষের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইয়াছিল বা কাহারও নিকট তিনি ঐ সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়ে। কোন দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়িয়া যদুনাথ কোন নিন্দনীয় স্থানে গমন করেন ও আমোদ আহ্লাদে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেই স্থানে অতিবাহিত করিতে হয়। সেই বাটী হইতে আসিবার সময় টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাঁহার নিকট কিছুমাত্র অর্থ না থাকায়, তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার পিতা সেই অঙ্গুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, ঐ অদ্ভুত উপাখ্যান রচনা করিয়া তাঁহার পিতার নিকট বর্ণন করেন ও ঐ গোলযোগে তিনি তাঁহার মূল্যবান অঙ্গুরিটী হারাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বুঝাইয়া দেন। পিতা মাতা সহজেই পুত্রের কথা বিশ্বাস করেন। এই অদ্ভুত উপাখ্যান ক্রমে প্রকাশিত হইয়া কলিকাতায় মহা অনিষ্টের সূত্রপাত করে। বলা বাহুল্য, অনুসন্ধানে পরিশেষে ঐ অঙ্গুরীয় পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই সকল কথা তখন সাধারণে সহজে বিশ্বাস করে নাই।

যে বালকের জন্য পুলিসের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী ষ্টীমলঞ্চে গমন করিয়া ট্রিনিদাদ অভিমুখী জাহাজের অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই ছেলের অনুসন্ধানের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর অবগত হইলাম যে, বিহারের একটী বালকের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ঐ বিহারী বালকের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে পাইলাম না, জানিতে পারিলাম, একই দিবস হইতে ঐ দুটী বালক নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যদি সেই বিহারী বালকের সহিত সে তাহার দেশে গমন করিয়া থাকে, এই বিবেচনা করিয়া, আমি তাহার দেশে গমন করিলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বকতিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে একটী ক্ষুদ্র লাইন মার্টিন কোম্পানি বাহির করিয়া বিহার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সুবে বিহার বলিয়া যে স্থান প্রসিদ্ধ ছিল, ইহা সেই বিহার। পুরাতন গড় ও ভগ্ন অট্টালিকা সকলের চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত এই স্থানে বর্ত্তমান আছে। মুসলমান রাজত্বের সময় ইহা একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। আমি ঐ স্থানে গমন করিয়া ঐ বিহারী বালকের বাড়ী পাইলাম, কিন্তু তাহারা কেহই সেই স্থানে গমন করে নাই।

এই স্থানে পুরাতন ঐতিহাসিক-বিষয়ের দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিহার হইতে ৭ মাইল মাত্র দূরে কুন্তলপুর নামক স্থান, উহা এখন বড়গাঁও নামে অভিহিত। এই স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর পিতার সেই প্রকাণ্ড অন্তঃপুর মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণী সকল এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। পুরাতন ভগ্ন গৃহের চিহ্ন সকল এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় একটী

প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। বুদ্ধদেবের প্রস্তরময় অত বড় মূর্ত্তি যে আর কোন স্থানে আছে, তাহা আমার বোধ হয় না।

এই স্থান হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে রাজগির নামক প্রসিদ্ধ স্থান। জরাসিন্ধু রাজার কারাগার এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐ স্থানে বালকদ্বয়ের কোনও সন্ধান করিতে না পারায়, আমাকে বাধ্য হইয়া এ স্থান ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তর পুরীতে গিয়া উহাদের উভয়কেই প্রাপ্ত হই। লেখা পড়ার ভয়ে উহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পুরীর একটী নিভৃত স্থানে লুকাইতভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার পর, সকলেই জানিতে পারিলেন যে, ছেলে ধরায় উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায় নাই।

হ্যারিসন রোডের যুবক কেরাণীবাবু ছেলে ধরার হাত হইতে পলায়ন করিয়া আপন বাসায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান আমাকে করিতে হয়। আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বহির্গত হই। যে রাস্তা দিয়া তিনি পলাইয়া আসিয়াছিলেন, সেই রাস্তা ধরিয়া গমন করিতে করিতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া উপস্থিত হই। সেই স্থানে একটী প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যস্থিত একটী বাড়ী দেখাইয়া দিয়া কহেন, ঐ বাটীতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। আমরা উভয়ে ঐ বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখি, ১০।১২ জন উড়িয়া মালি বসিয়া আছে। বাড়ীটী ত্রিতল নহে—দ্বিতল। তাহাদের সর্দ্দারের নিকট হইতে বাড়ীর চাবিকাটী লইয়া বাড়ীর দরজা খুলি, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, সমস্ত ঘরই উত্তমরূপে সাজান। ঘরের

অবস্থা দেখিয়া কেরাণীবাবু কহিলেন, মহাশয়, আমার ভুল হইয়াছে, এ সে বাড়ী নহে। অগত্যা আমরা তথা হইতে বহির্গত হইলাম ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোডের চারি ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক বাগানের বাড়ীগুলি তাঁহাকে দেখাইলাম; কিন্তু তিনি যে প্রকার বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই প্রকারের বাড়ী একখানিও দেখিতে পাওয়া গেল না। সুতরাং আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

ঐ কেরাণী বাবুর সঙ্গে আরও অনেক স্থান অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাঁহাকে লইয়া তাঁহার দেশে পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম। তথায় গিয়া জানিতে পারি যে, কেরাণী বাবু অনেক দিবস পূর্ব্বে একবার পাগল হইয়াছিলেন ও তাঁহার পিতা মাতার যত্ন ও চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার সেই পিতা মাতা কয়েক বৎসর হইল, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী শয্যাশায়িনী, একমাত্র পুত্র কাল-কবলে পতিত। এই সকল কারণে অনেকেই অনুমান করিলেন যে, তাঁহার বর্ণিত বিষয়টী তাঁহার বিকৃত-মস্তিষ্কের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিহারির স্ত্রী মঙ্গলার অনুসন্ধানের ভারও আমার উপর অর্পিত হয়। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যে সকল উপায় অবলম্বন ও যেরূপ ভাবে আমি তাহার অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিতে হইলে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত সেই সকল বিষয় বর্ণন না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মঙ্গলাকে কোন প্রসিদ্ধ বেশ্যা-পল্লীর মধ্যে প্রাপ্ত হই। সেই স্থানে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া সে অবস্থান করিতে-

ছিল। বিহারির ছাতার বাঁটের কারখানায় যে সকল কারিকর কার্য্য করিত, তাহাদিগের মধ্যে একজনকে আমি তথায় দেখিতেও পাইয়াছিলাম। বিহারিও এই সমস্ত অবস্থা পরে জানিতে পারিয়া, মঙ্গলার আর মুখ দর্শন করিল না, মঙ্গলাও আপন ইচ্ছা মত সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল।

আমার হস্তে যে কয়েকটী অনুসন্ধানের ভার পড়িয়াছিল, আমি তাহার সমস্তই শেষ করিয়া ফেলিলাম। সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, উহাদিগের মধ্যে কাহাকেও ছেলেধরায় ধরিয়া লইয়া যায় নাই। এই সকল কথা সংবাদ-পত্রেও বাহির হইল কিন্তু সকলের মনে যে ভয়ানক আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল, তাহা সহজে দূর হইল না। কোন কোন ব্যক্তি ছেলে ধরা সন্দেহে নানারূপে অবমানিত ও নিগৃহিত হইতে লাগিল। ছেলে ধরার গাড়ী বিবেচনা করিয়া দুই একস্থানে দুই একখানি গাড়ীও পুড়াইয়া নষ্ট করা হইয়াছিল। সহরের মধ্যে কোন বালকের সহিত কাহারও গমন করা একরূপ দায় হইয়া পড়িল। ক্রমে যতদিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, সকলের মনে আতঙ্ক ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানি দেশীয় সংবাদ-পত্র প্রতিদিন মিথ্যা ছেলে চুরির সংবাদ প্রকাশিত করিয়া ঐ আতঙ্ক ক্রমেই বাড়াইতে লাগিল।

এই সময় একজন "চা"র এজেন্টের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা এই স্থানে বর্ণনযোগ্য।

রাত্রি ১০টার পর একজন মুসলমান এজেন্ট একখানি গাড়ী ধৃত করেন। ঐ গাড়ীতে একটী খোঁড়া ঘোড়া জোতা ছিল। এজেন্ট গাড়োয়ানের নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,;

এরূপ সময় কে বলিয়া উঠিল, "ছেলে ধরা গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।" এই কথা বলিবামাত্র সেই স্থানে একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। ঐ এজেণ্ট যে ছেলেধরা ও যে গাড়ীর নিকট তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঐ গাড়ীতে করিয়া অপহৃত বালক লইয়া যাওয়া হয়, এই সন্দেহে, যে যেরূপে পারিল, সেইরূপে তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনা থানার অতি সন্নিকটে ঘটিয়াছিল বলিয়া, এজেণ্ট সাহেবকে ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তিনি এরূপ ভাবে প্রহৃত হইয়াছিলেন যে, কিছু দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে হাসপাতালে থাকিতে হয়। থানা হইতে অনেক লোক বাহির হইয়া কোন গতিকে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনে। জনতার মধ্যে কেহ কেহ ঐ গাড়ীতে অগ্নি প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে সেইস্থানে পুলিস উপস্থিত হওয়ায় সেই গাড়ীখানি রক্ষা পায়।

এই ঘটনাটি আরো বিস্ময়জনক। তিনটা জল-জীয়ন্ত ছেলে সমেত একজন ছেলেধরার ধরা-পড়া। তখন বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টা। সবে মাত্র শয্যাতাগ করিয়া আমি থানার অফিস গৃহে আসিয়া অফিসের কতক কাজ করিয়া সেদিনকার একখানি দৈনিক পত্রিকা পড়িবার জন্য খুলিতেছি, এমন সময় একজন পাহারা-ওয়ালা দৌড়িয়া আসিয়া আমায় সংবাদ দিল যে, সিয়ালদহের সন্নিকট ওল্ড বৈঠকখানা রোডে একজন ছেলে-ধরা ধরা পড়িয়াছে। লোকটা পাঞ্জাবী—তাহার সঙ্গে তিনটি বাঙ্গালীর ছেলেও আছে। অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে—আর সেই ছেলেধরাকে মারিতেছে—সে এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না সন্দেহ।

পাহারাওয়ালার কথা শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিধান করিয়া, ছয়জন পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া, সেই সিয়ালদহের দিকে দৌড়িলাম। আজ একেবারে বামাল সমেত ছেলেধরা ধরিতে পারিব, মনে করিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। বৌবাজার ষ্ট্রীট হইতে ওল্ড বৈঠকখানা রোডে প্রবেশ করিয়া দেখি, একবারে লোকে লোকারণ্য,—কাহার সাধ্য সে জনতা ঠেলিয়া যায়? আমার সঙ্গে ছয়জন পাহারাওয়ালা ছিল বলিয়াই, কোন রকমে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কেবলই ত লোক দেখিলাম, ছেলেধরা ত দেখিতে পাইলাম না। শেষে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম,—ঐ গলির মধ্যে যে একটা হোটেল আছে, ছেলেধরা প্রাণভয়ে সেই হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে সেই হোটেলের কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভয়ঙ্কর ভিড়,—কাহার সাধ্য বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে? ছেলেধরা ধরা পড়ায় সকলেরই আজ আনন্দ—আর মুখে কেবল "মার—মার" শব্দে।

আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সে উন্মত্ত জনতাকে স্থির রাখিতে পারিলাম না। তখন পাহারাওয়ালাদের লোক হটাইয়া দিতে বলিলাম। কিন্তু আমার ছয়জন মাত্র পাহারাওয়ালা, আর সেখানে হাজার হাজার লোক। সুতরাং তাহাদের কথাই বা কে শোনে? আর বিশেষতঃ, ছেলেধরার উপর তাহাদের ভয়ঙ্কর ক্রোধ জন্মিয়াছিল। আমার মনে হইতে লাগিল—সেই হোটেলের মধ্যে ছেলেধরা বুঝি জীবিত নাই। ছেলেধরাই হউক আর চোর-ডাকাত বা খুনী আসামীই হউক, পুলিস-কর্ম্মচারীর সম্মুখে

কাহাকেও খুন হইতে দেখিলে কোন পুলিস-কর্ম্মচারী স্থির থাকিতে পারেন না। আমি প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে সেই উন্মত্ত জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "দেখুন, আপনাদের মধ্যে অনেক ভদ্রলোককে দেখিতেছি। আমি ভদ্র ইতর সকলকে বলিতেছি—আপনারা এখানে আর থাকিবেন না, যথাস্থানে চলিয়া যাউন। আমি যখন আসিয়াছি—তখন সে ছেলে-ধরা ধরিবার ভার আমার। আপনারা এরূপ ভাবে বৃথা গণ্ডগোল কেন করিতেছেন? আমি যখন উপস্থিত, তখন সে ছেলে-ধরা আর পলাইবে কোথায়?"

আমার কথা শুনিয়া কোন কোন ভদ্র লোক ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অসংখ্য জনতার কিছুই হ্রাস দেখা গেল না। যেমন বিশ পঁচিশ জন লোক চলিয়া গেল, অমনি শত শত ব্যক্তি তাহার স্থান অধিকার করিল। লোকেরা ক্রোধে এরূপ উন্মত্ত যে, পুলিসের কথা তাহারা গ্রাহ্য করিল না। তখন আমি আর কি করিব? পাহারাওয়ালাদিগকে লোক হটাইয়া দিতে বলিলাম। অনেক কষ্টে আমি সেই হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, বাড়ীর মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভিড়। সেখানেও কেবল 'মার্ মার্' শব্দ—কিন্তু ছেলেধরাকে দেখিতে পাইলাম না।

অবশেষে একটা ঘরের মধ্যে ছেলেধরাকে দেখিতে পাইলাম। সে একজন প্রকাণ্ড পাঞ্জাবী জোয়ান। তাহার সঙ্গে তিনটী ছেলে। আমি তখন সেই পাঞ্জাবীর মাথার পাগড়ী খুলিয়া তাহা দ্বারা তাহাকে বাঁধিলাম। আর সেই ছেলে তিনটীকে একজন পাহারাওয়ালার জিম্মা করিয়া দিয়া অন্যজনকে এক-

খানা গাড়ী আনিতে বলিলাম। গাড়ী আসিলে সেই গাড়ীর মধ্যে ছেলে তিনটী আর সেই ছেলেধরাকে তুলিলাম; আমিও সেই গাড়ীর মধ্যে উঠিলাম। ২।৩জন পাহারাওয়ালা গাড়ীর ছাদে উঠিল। আমি তিনটী ছেলের সহিত ছেলেধরা ধরিয়াছি, এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। আমি যখন বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সে রাস্তাও লোকে লোকারণ্য! আমি গাড়ী করিয়া চলিয়াছি, আর শত সহস্রলোক আমার গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িতেছে। তাহাদের মুখে আজ যেন আর আনন্দ ধরে না। যথাসময়ে আমার গাড়ী থানার মধ্যে আসিয়া পৌছিল, জনতাও থানার সম্মুখের রাস্তায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমি তিনটী ছেলের সহিত একজন ছেলেধরা ধরিয়াছি—এই সংবাদ থানায় আসিয়া টেলিফোনের দ্বারা প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী সাহেবকে জানাইলাম। আমার টেলিফোন করিবার বিশ মিনিট পরে দেখি, স্বয়ং বড় কর্ত্তা এক মোটর-গাড়ীতে করিয়া উপস্থিত। থানার সম্মুখে এরূপ ভয়ঙ্কর জনতা দেখিয়া, তিনি অবাক হইলেন; তৎক্ষণাৎ জনতা সরাইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

তার পর সেই ছেলে চুরির তদন্ত আরম্ভ হইল। প্রথমেই বড় সাহেব সেই ছেলেধরাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। সে তাহার যথাসম্ভব উত্তর দিল।

সেই সকল উত্তর ও তাহার নিকট যে সকল চিঠিপত্র ছিল তাহা দেখিয়া স্পষ্টই জানিতে পারা গেল যে, ঐ পাঞ্জাবী বাস্তবিক ছেলেধরা নহে, পাঞ্জাব দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী যুবক। পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হইয়া অনেকে খাইতে পাইতেছে

না, এই সংবাদ পাইয়া পঞ্জাব প্রদেশীয় কয়েকজন প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, ঐ প্রদেশে যদি কোন অনাথ বালক থাকে, তাহাদিগের পিতামাতা যদি সম্মত হন, তাহা হইলে ঐ বালকগণকে তিনি পঞ্জাবে লইয়া গিয়া, অনাথ বালকদিগের আশ্রমে রাখিয়া প্রতিপালন ও বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। কেবল তিনি যে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন তাহা নহে, সেইস্থানের প্রধান প্রধান লোক, কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান লোককে এ বিষয়ে পত্রও লিখিয়া ছিলেন। ঐ পঞ্জাবী ভদ্রলোকটী পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া সেইস্থানের ভদ্রলোকের সাহায্যে কেবলমাত্র তিনটী বালক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, ও তাহাদিগের অভিভাবকের অনুমতি-ক্রমে তাহাদিগকে লইয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন; ইচ্ছা, এইস্থানে দুই-একদিবস অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে বালকগণকে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেল হইতে অবতরণ করিয়া ঐ বালকগণের সহিত যেমন তিনি সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হন, অমনি তিনি ছেলেধরা বলিয়া অভিহিত হইয়া এই মহাবিপদে পতিত হন। তিনি সহস্র সহস্র লোক কর্ত্তৃক যেরূপভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর পাঁচ মিনিট কাল যদি পুলিসের সাহায্য না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার দেহের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকিত না।

আমরা সকলেই তখন বুঝিতে পারিলাম যে, ইনি বাস্তবিক ছেলেধরা নহেন, বা বালক তিনটী অপহৃত বালক নহে। কিন্তু সেই সময় উহাদিগকে থানার ভিতর স্থান দেওয়া এক ভয়ানক বিপদ হইয়া পড়িল। সহস্র সহস্র লোক আসিয়া থানার সম্মুখ ও

ভিতর পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। আমরা সকলে উহাদিগকে নানা-প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, এই ব্যক্তি ছেলেধরা নহে, বা বালকগণ অপহৃত নহে। কিন্তু আমাদিগের সে কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। অধিকন্তু সেইসময়ে আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিল।

পঞ্জাবে একটী ফুটবল ক্লব আছে, ঐ ফুটবলের ক্রীড়কগণ সমস্তই পঞ্জাবী ও সেইস্থানের স্কুলের ছাত্র। ঐ ক্লবের ২০।২৫জন বালক তাহাদিগের কলেজের ইংরাজ প্রিন্সিপালের কর্ত্তৃত্বাধীনে এ দেশে ফুটবল খেলিতে আসে। কলিকাতায় দুই একদিবস থাকিয়া, নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে ফুটবল খেলিতে যায়। সেইস্থানে উভয় দলে খেলা হয় ও কৃষ্ণনগরের দল জয়লাভ করে। পঞ্জাবীরা পরাজিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিবস প্রাতঃকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া অবতরণ করে। পরে কলিকাতার নির্দ্দিষ্ট বাসায় আসিয়া আপনাপন দ্রব্যাদি রাখে, তন্মধ্যে কতকগুলি আহারীয় সংগ্রহার্থ পুনর্ব্বার বহির্গত হয়। যে থানার ভিতর পূর্ব্ববর্ণিত পঞ্জাবী যুবক বালক তিনটির সহিত আটক ছিলেন, সেই থানার সম্মুখে একটী হালুইকারের দোকান হইতে ইতিপূর্ব্বে তাহারা আহারীয় দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আজও আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহারা ৮।১০জন সেই দোকানে আগমন করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেই সময় থানার সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ঐ পঞ্জাবীগণ সেইস্থানে আগমন করিয়া যেমন হালুইকরের দোকানে আহারীয় সংগ্রহের নিমিত্ত প্রবেশ করিল, অমনি সেই ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল,

উঁহারা নিশ্চয়ই ঐ ছেলেধরা পঞ্জাবীর দলের লোক, নতুবা উঁহারা এ সময় এখানে আসিবে কেন ?

এই কথা বলিবামাত্র অনেক লোক সেই হালুইকরের দোকানে প্রবেশ করিল। হালুইকর দেখিল যে, তাহার দোকানে এক নূতন বিপদ উপস্থিত। সে অনন্যোপায় হইয়া উঁহাদিগকে দোকান হইতে বাহির করিয়া দিল; ও উঁহাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছিয়া দিবার নিমিত্ত একজন লোক সঙ্গে দিল। ঐ লোকটী উঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চাঁপাতলা অভিমুখে প্রস্থান করিল। যে সকল লোক সেই সময় তাহার দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ছিল, তাহারাও "ঐ ছেলেধরা যাইতেছে" বলিয়া জনতা বৃদ্ধি করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। দোকানদারের যে লোক তাহাদিগের সঙ্গে যাইতেছিল, সে এই অবস্থা দেখিয়া সেইস্থান হইতেই অন্তর্হিত হইল। পঞ্জাবী বালকগণও অনন্যোপায় হইয়া আপনাপন প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে গমন করিতে লাগিল।

সেই সময় এক রব উঠিল যে, ছেলেধরা পলাইতেছে। এই রব উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক ছুটিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। ইহার পরই যে যেরূপে পারিল, উঁহা-দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

ছেলেধরার দলের একজন ধরা পড়িয়াছে, ও অপরাপর সকলে পলায়ন করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের উপর কাহারও কিছুমাত্র দয়া নাই। কেহ ছাতি, কেহ জুতা, কেহ লাঠী, কেহ ইট, যাহার যেরূপ সুবিধা হইল, সে সেইরূপেই উঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। কেহ ভাবিল না, যে এইরূপ অবস্থায় উঁহারা

মরিয়া যাইতে পারে। পঞ্জাবী বালকগণ যতক্ষণ পারিল, ততক্ষণ দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিল। অবশেষে ভয়ানকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া গেল, কাহার মস্তক ভগ্ন হইয়া সেই রক্তে রাজবর্ত্ম রঞ্জিত হইতে লাগিল। কাহার হস্ত, কাহার পদ ভগ্ন হওয়ায় ধরাশায়ী হইল, তাহার উপর অবিরাম লাঠি পড়িতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পঞ্জাবী বালকগণ বিশেষরূপে আঘাতিত হইয়া হতচৈতন্য অবস্থায় যে যেখানে পাইল, সে সেইস্থানে শয়ন করিল। যাহারা উহাদিগকে প্রহার করিল, তাহারা একবারের নিমিত্তও অনুসন্ধান করিল না যে, উহারা কাহারা, কেনই বা এখানে আসিয়াছে, ও উহারা প্রকৃতই ছেলেধরা কি না?

কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ বণিকের একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী এই সময় গাড়ী করিয়া ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ঐ পঞ্জাবী বালকদিগের একজন পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, ঐ পতিত বালকের উপর সহস্রাধিক লোক লাঠি চালাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া ঐ ইংরাজ কর্ম্মচারী মৃতবৎ পাঞ্জাবীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেমন তাঁহার গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, অমনি ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, "এই বালক চোরদিগের সর্দ্দার।" এই কথা একজনের মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে না হইতে, সেই জনতা সেই পঞ্জাবীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপর পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দশাও সেই পঞ্জাবীর দশায় পরিণত হইল।

যখন এই ভয়ানক কাণ্ড আরম্ভ হয়, সেই সময় এই সংবাদ থানায় আসিয়া পৌঁছিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি থানায়

উপস্থিত সমস্ত কনষ্টবলের সহিত দ্রুতগতি ঘটনাস্থলে গিয়া সেই ভয়ানক জনতাকে তথা হইতে বিতাড়িত করিলাম ও সাংঘাতিকরূপে প্রহৃত পঞ্জাবী বালক সকল ও সেই সাহেবকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময় একজন ঠিকা গাড়োয়ান তাহার খালি গাড়ী রাস্তার উপর দাঁড় করাইয়া এই বিষম ব্যাপার সন্দর্শন করিতেছিল। ঐ গাড়ী দেখিয়া ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "এই গাড়ীতে কয়েকজন ছেলেধরা আসিয়াছে।" এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র কতকগুলি লোক নিকটবর্ত্তী একখানি কেরোসিনের দোকান হইতে কয়েক টিন কেরোসিন তৈল আনিয়া ঐ গাড়ীর উপর ঢালিয়া দিয়া, উহাতে অগ্নি লাগাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ঐ গাড়ী ভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

এই ঘটনার পরই যে ছেলেধরার গোলযোগ মিটিয়া গেল, তাহা নহে, সহরের চারিদিকেই এইরূপ গোলযোগ চলিতে লাগিল। পঞ্জাবী দেখিলেই ছেলেধরা স্থির করিয়া তাহাকে প্রহার করা হইত। নিকটে খালি গাড়ী থাকিলেই উহা ভস্মে পরিণত করা হইত।

এই দাঙ্গাকারীগণের মধ্যে কতকগুলি লোক—যাহাদিগের লাঠিতে ঐ সকল ব্যক্তি সাংঘাতিকরূপে আঘাতিত হইয়াছিল, তাহারা ধৃত হইল ও পরিশেষে বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইল। বিচারে উহাদিগের প্রত্যেককেই কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাগারে প্রেরিত হয়।

এইরূপে কতকগুলি লোক সহরের নানাস্থান হইতে ধৃত হইয়া ক্রমে কয়েদীর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। তখন সকলেই

বুঝিতে পারিল যে, ছেলেধরা একটা হুজুগ্‌মাত্র, প্রকৃত কিছুই নহে। ক্রমে ছেলেধরার গোলযোগ থামিয়া গেল; সহরে পুনর্ব্বার শান্তি বিরাজ করিল।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, No 188. দারোগার দপ্তর, ১৮৮ সংখ্যা

বিবাহ-সমস্যা

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [অগ্রহায়ণ।

বিবাহ-সমস্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে একজন কনষ্টেবল আসিয়া আমার হাতে একখানি কার্ড দিল। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে, একস্থানে একটা বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া, অফিসের কাজকর্ম্ম শীঘ্রই সমাপন করিয়াছিলাম। সহসা সেই কার্ডখানি পাইয়া মনে মনে বিরক্ত হইলাম। কার্ডখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইলাম।

কার্ডখানিতে সর্ব্বরঞ্জন রায়ের নাম লেখা ছিল। রায় মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব, বহুকাল হইতে তিনি আমার পরিচিত। তাঁহারই কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমি সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। কোথায় আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইব, না তিনিই সেই অসময়ে আমার নিকট কার্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন। ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলাম না।

আমার কোন উত্তর না পাইয়া কনষ্টেবল বলিল, "বাবু স্বয়ং কার্ড পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছেন।" আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, নিশ্চয়ই কোন বিপদ হইয়াছে। কন্যার বিবাহের সময় প্রায় নিকটবর্ত্তী, এমন সময়ে স্বয়ং কন্যাকর্ত্তার কোন ভয়ানক বিপদ না হইলে

পুলিসে আসিবে কেন? কিন্তু এ সকল চিন্তা করিবার সময় ছিল না। কার্ডখানির পশ্চাৎদিকে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার ধারণাই সত্য হইল। "শীঘ্র আসিবেন, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে" এই কয়টী কথা যেন কম্পিত হস্তে অতি ধীরে ধীরে লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

আমি আর বিলম্ব করিলাম না; তখনই সেই কনষ্টেবলের সহিত বাহিরে আসিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র সর্ব্বরঞ্জন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া পুনরায় গাড়ীর উপর আরোহণ করিলেন। আমরা গাড়ীতে উঠিবার পর তিনি কোচমানকে শকট চালনা করিতে আদেশ করিলেন। অশ্বে কশাঘাত করিয়া কোচমান গাড়ী চালাইয়া দিল।

আমার অফিস হইতে তাঁহার বাড়ী প্রায় দুই ক্রোশ। সেখানে পৌঁছিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সর্ব্বরঞ্জন বাবু কোন কথা বলেন নাই, মস্তক অবনত করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আত্মসংবরণ করিলেন। পরে বলিলেন, "ভায়া! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার ধন গেল, মান গেল, সর্ব্বস্ব গেল। আমার অদৃষ্টে এতও ছিল?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে আপনার সর্ব্বস্ব লইয়াছে? বিবাহ-বাড়ীতে কি চুরি হইয়াছে?"

সর্ব্বরঞ্জন বাবু সহসা উত্তেজিত হইলেন; বলিলেন, "সে নাই,—সে নাই, এই ছিল; কোথায় গেল, কেমন করিয়া গেল? কিছুই বলিতে পারি না। আপনি আগে সেখানে চলুন, তবে সব জানিতে পারিবেন।"

প্রকৃত কথা জানিতে না পারিয়া, আমি আন্তরিক বিরক্ত হইলাম। কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিলাম না। কোন কোন লোকে বিপদে পড়িলে একেবারে জ্ঞান হারাইয়া থাকেন। তাঁহারা মনের উদ্বেগে প্রকৃত কথা, দুঃখের প্রকৃত কারণ ভুলিয়া যান এবং আপন ইচ্ছামত কেবল নিজের শোক-প্রকাশক হা হুতাশ করিয়া সময়ক্ষেপ করেন।

সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে উন্মাদপ্রায় দেখিয়া আমি অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে নাই সর্ব্বরঞ্জনবাবু? কি হইয়াছে? সকল কথা পরিষ্কার করিয়া না বলিলে আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হইবে না।"

সর্ব্বরঞ্জন কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, সে কথা কি আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই? কল্যাণী নাই।—আজ তাহার বিবাহ, বিবাহ উপলক্ষে আমার বাড়ী লোকে লোকারণ্য। কল্যাণী—বিবাহের পাত্রী নাই। আমার মান গেল, ধন গেল, সকলই গেল।"

এইরূপে তিনি আরও কত কি বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু আমি বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন হইতে কল্যাণীকে দেখিতে পাইতেছেন না? আজ তাহার বিবাহ, প্রায় সমস্ত দিনই তাহার সহিত কেহ না কেহ আছে, আজ সে কোথায় যাইবে? আপনি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন?"

সর্ব্বরঞ্জন বাবু উত্তর করিলেন, "সমস্ত দিনই কল্যাণীর নিকট অন্যান্য রমণীগণ ছিলেন। রাত্রি নয়টার পর হইতে লগ্ন আছে। কিন্তু বর লগ্নের অনেক পূর্ব্বেই মহা সমারোহে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিবার জন্য সকলেই বাহিরে

আসিলেন। বাড়ীর ভিতর একা কল্যাণীই ছিল। রাত্রি প্রায় আটটার সময় অন্দরে আমার ডাক পড়িল। সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহাতেই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। শুনিলাম, কল্যাণী কিছুক্ষণ একা অন্দরে ছিল, তাহার পর যখন বর দেখিয়া রমণীগণ অন্দরে ফিরিয়া যান, তখন কল্যাণীকে দেখিতে পান নাই। তখনই চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলাম, তাহারা প্রাণপণে অন্বেষণ করিল; কল্যাণীকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। বাড়ীর খিড়কী দরজা খোলা রহিয়াছে। যে সকল অলঙ্কার তাহার গাত্রে ছিল, সেগুলি সমস্তই খুলিয়া, বাছা আমার রাখিয়া গিয়াছে। আর সকলই রহিয়াছে, কেবল সে নাই—কল্যাণী নাই। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, আমার স্ত্রী ও আর যে কয়েকজন মহিলা এ বিষয় জানেন, তাহাদিগকে এই কথা রাষ্ট্র করিতে নিষেধ করিয়া আমি আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি।"

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, এরূপ অদ্ভুত ঘটনা ত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। বিবাহ-রাত্রে কখন কখনও পাত্র পলায়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু পাত্রীর অন্তর্দ্ধানের কথা এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণগোচর হয় নাই। কল্যাণীকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তাহার বয়স প্রায় তের বৎসর। এই বয়সে তাহার এ কি বুদ্ধি হইল বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ ভাবিয়া বলিলাম, "কল্যাণী নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া আছে। নতুবা সে কোথায় যাইবে? আর আপনি তাহার অন্তর্দ্ধানের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বড় ভাল কাজই করিয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কল্যাণী কোথাও যায় নাই, আপনাদেরই বাড়ীর কোন স্থানে লুকাইয়া আছে।"

স। না মহাশয়! বাড়ী তোলপাড় করিয়া কল্যাণীর সন্ধান করা হইয়াছে। তাহাকে নিশ্চয়ই কোন লোক চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। হায়! যখন বরের পিতা এ কথা শুনিবেন, তখন কি বলিবেন? আপনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ, আজ যদি কল্যাণীর বিবাহ না হয়, তাহা হইলে আমাকে যে জাতিচ্যুত হইতে হইবে, তাহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন।

আ। কাহার সহিত কল্যাণীর বিবাহ হইতেছে?

স। হালদারদের একটী পুত্রের সহিত কল্যাণীর সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম, কল্যাণীর অদৃষ্ট ভাল, তাই অমন ঘরে তাহার বিবাহ হইতেছে।

আ। পাত্রের নাম কি?

স। মোহিনীকান্ত হালদার, নীলরতন হালদারের একমাত্র পুত্র। ছেলেটী এই বৎসরে এফ-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে। যেমন ঘর, তেমনই বরও মিলিয়াছিল, কিন্তু কি করিব, কল্যাণীর অদৃষ্টে অত সুখ নাই বোধ হয়।

আমি মোহিনীকান্তকে চিনিতাম। তাহার বাড়ীর নিকট আমার একজন বন্ধু বাস করেন। মধ্যে মধ্যে আমাকে সেখানে যাইতে হয়। ছেলেটী বাস্তবিকই অতি উত্তম। পাড়ার কোন বালকের সহিত তাহার সৌহার্দ্দ নাই। তাহার একমাত্র বন্ধুর নাম নলিনীকান্ত। নলিনীকান্তের স্বর্গীয় পিতা রমানাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সর্ব্বরঞ্জন বাবুর চির বিবাদ ছিল। সামান্য কারণে এই বিবাদ উপস্থিত হয়। একটা প্রকাণ্ড মাঠ লইয়াই এই উভয় পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। বহুকাল ধরিয়া মোকদ্দমায় উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও কেহ

শান্ত হন নাই। দুই তিন পুরুষ ধরিয়া এই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

যতক্ষণ আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, ততক্ষণ সর্ব্বরঞ্জন বাবু রোদন করিতেছিলেন। ক্রমে গাড়ী তাঁহার বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল দেখিয়া, আমি বলিলাম, "শুনুন সর্ব্বরঞ্জন বাবু! আপনি এত বিচলিত হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। এক কার্য্য করুন, আর একবার কল্যাণীর অন্বেষণের জন্য দুই তিনজন বিশ্বাসী লোককে নিযুক্ত করুন। বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রয়োজন নাই। কল্যাণীর সমবয়স্ক কোন বালিকা কি আপনার বাড়ীতে নাই? কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে, আপনার এক ভ্রাতুষ্কন্যা কল্যাণীর সমবয়স্কা এবং কল্যাণীর অবয়বের সহিত তাহার আকৃতির যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। যখন আপনার বাড়ীতে বিবাহ, তখন নিশ্চয়ই অনেক স্ত্রীলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ আপনার ভ্রাতুষ্কন্যাও এখন আপনার বাড়ীতে আছে।"

সর্ব্বরঞ্জনবাবু আমার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, গঙ্গা আমার বাড়ীতে আছে। সে তাহার পিতামাতার সহিত বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি কি প্রস্তাব করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না; গঙ্গার সহিত মোহিনীকান্তের বিবাহ হইতে পারে না। মোহিনীর কুষ্ঠির সহিত কল্যাণীর কুষ্ঠি মিলিয়া গিয়াছে। গঙ্গার পিতা মাতাই বা সম্মত হইবেন কেন?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "না না, আমি সে কথা বলিতেছি না। যতক্ষণ না কল্যাণীকে পাওয়া যায়, ততক্ষণ গঙ্গাকে

কল্যাণী সাজিতে হইবে। কল্যাণীর সন্ধান পাইলে তাহার সহিতই মোহিনীকান্তের বিবাহ হইবে। আপনার বাড়ীর যে সকল মহিলা কল্যাণীর অন্তর্দ্ধানের কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যদি কোন কথা প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আর কেহই এই বিষয় জানিতে পারিবেন না। কল্যাণী বিবাহের কাপড় ও গহনা রাখিয়া গিয়াছে। আপনি সেই বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা গঙ্গাকে সজ্জিতা করুন এবং তাহাকে কল্যাণীর আসনে বসাইয়া দিন। কুশণ্ডিকা না হইলে ব্রাহ্মণের বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। কুশণ্ডিকা কাল হইবে বলিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সময়ের মধ্যেই আমি কল্যাণীর সন্ধান পাইব।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে আমরা সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীর অনেকেই আমার পরিচিত, বিশেষ বিবাহে আমিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম সুতরাং আমাকে দেখিয়া কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয় নাই।

আমি গোপনে সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে বলিলাম, "এখন আমার পরামর্শ মত কার্য্য করুন। বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদি এখনও কল্যাণীকে না পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার ভ্রাতুষ্কন্যা গঙ্গাকেই কন্যারূপে সাজাইয়া আনুন। বিবাহের সময় উপস্থিত—আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। ইতিমধ্যে যে সামান্য বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন দেখিতেছি। কিন্তু আপনি তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। নাচ যেমন হইতেছে, তেমনই হউক। বরং নর্ত্তকীগণকে কিছু পারিতোষিক দিয়া উত্তেজিত করুন। উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে

পাঁচ টাকা করিয়া বিদায় দিন। যে সকল ভিক্ষুক আপনার বাড়ীর চারিদিকে বিবাহের অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী দিয়া সন্তুষ্ট করুন। এই সমস্ত করিতে আপনার কিছু অধিক ব্যয় হইবে বটে কিন্তু ইহাতে নিমন্ত্রিত লোকদিগের মনে কোনরূপ সন্দেহ হইবে না। কেবল আমাকে গোপনে সংবাদ দিবেন কল্যাণী ফিরিয়া আসিয়াছে কি না? আর এক কথা, যে ঘরে কল্যাণী একা বসিয়াছিল, সেই ঘরটী আমি একবার পরীক্ষা করিতে চাই। সুবিধামত আমাকে সে ঘরে লইয়া যাইবার উপায় করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার কথায় সর্ব্বরঞ্জন বাবু যেন অনেকটা শান্ত হইলেন। তিনি তখনই আমার আদেশ পালন করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আমি সেইস্থানে বসিয়া রহিলাম।

রায় পরিবার বহুদিন হইতে বিখ্যাত। বাড়ীখানি প্রকাণ্ড। আমি কখনও ভিতরে প্রবেশ করি নাই বটে কিন্তু শুনিয়াছি, বাড়ী-খানি তিন মহল। তিন মহলেই তিনটী প্রাঙ্গন আছে; তবে প্রথম মহলের উঠানই সকলের অপেক্ষা বড়। সেই উঠানে প্রকাণ্ড আটচালা বাঁধা হইয়াছে। তাহার ভিতরদিক নানা বর্ণের কাপড় দিয়া অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। চারিদিকে বেলোয়ারি ঝাড় ও দেয়ালগিরি। মেঝের সুকোমল গালিচার উপর দুগ্ধফেন-

নিভ শুভ্র চাদর পাতা রহিয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিয়া বাইনাচ দেখিতেছেন। সর্ব্বরঞ্জন বাবু বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য বাইনাচ দিয়াছিলেন। নিকটেই কিছু উচ্চ ও স্বর্ণখচিত মখমলের বিছানার উপর পাত্র স্বয়ং উপবিষ্ট।

আমি সে অঞ্চলে অনেকেরই পরিচিত ছিলাম। অনেকেই আমাকে সর্ব্বরঞ্জন বাবুর অকপট বন্ধু ও দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা বলিয়া সন্দেহ করেন।

অনেকেই আমার সহিত সাদর-সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহাদের কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, বিবাহে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন। মনে করিলাম, একবার সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাই; কিন্তু সাহস হইল না। পাছে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কিছু সন্দেহ করেন, এই ভয়ে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া একমনে বাইনাচ দেখিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই সর্ব্বরঞ্জন তিন চারিজন আত্মীয় লোকের সহিত বাহিরে আসিলেন এবং প্রথমতঃ নাচওয়ালীদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। তাহার পর তাঁহারা উপস্থিত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীকে যথোচিত অর্থদান করিলেন। বাহিরে যে সকল ভিক্ষুক জমা হইয়াছিল, তাহারাও আশাতিরিক্ত বিদায় পাইল।

এই সকল কার্য্যে প্রায় একঘণ্টা অতীত হইল। কিন্তু লোকে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক সকলেই একবাক্যে সর্ব্বরঞ্জনের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে আমার পরামর্শমত কল্যাণীকে আর একবার অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় সর্ব্বরঞ্জনবাবু আমাকে "গঙ্গার সহিত বিবাহ দিতে চলিলাম" এই কথা বলিয়া শুভকার্য্য সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সকলেই সানন্দে সে প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন সর্ব্বরঞ্জন বিবাহস্থানে পাত্র লইয়া গমন করিলেন।

সেই প্রাঙ্গনেরই একপার্শ্বে বিবাহের স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে পাত্রকে বেশ দেখিতে পাওয়া গেল।

এদিকে নিমন্ত্রিত লোক সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড ছাদে প্রায় সকলেই আহারে বসিলেন। অনেকেই ভাবিল, আমি সর্ব্বরঞ্জন বাবুর পরম বন্ধু; বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত নহি, এই কারণে এখন আহার করিতে যাইলাম না।

আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেইখানেই রহিলাম, কেবল মধ্যে মধ্যে পাত্রের দিকে দেখিতে লাগিলাম। প্রাথমিক ক্রিয়া শেষ করিয়া স্ত্রী-আচারের জন্য পাত্রকে অন্দরে লইয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সেখানে থাকিয়া বর কন্যার সহিত পুনরায় বিবাহস্থানে ফিরিয়া আসিল।

বর যখন পুনরায় আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল, আমি তখনই তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সন্দেহ হইল। পূর্ব্বে তাহাকে যেন বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহার মুখ বেশ প্রফুল্ল। এখন আর সে পূর্ব্বের মত নিশ্চল নিস্পন্দ জড় নহে, হস্ত-পদবিশিষ্ট সৃষ্টির প্রধান জীব মানব বলিয়াই বোধ হইল। কেন এ পরিবর্ত্তন ? স্ত্রী-আচারের সময় রমণীগণ নানা প্রকার কৌতুক ও উপহাস করিয়া

থাকেন, এমন কি, বরকে প্রহার পর্য্যন্ত নীরবে সহ্য করিতে হয়। সেই জন্যই কি সে এখন এত প্রফুল্ল—এত চঞ্চল। তাহাও সম্ভব নহে। মোহিনীকান্তের চরিত্রের বিষয় যতদুর জানি, তাহাতে তাহাকে অতি সৎস্বভাবাপন্ন বলিয়াই বোধ হয়। সে মূর্খ নয়। এফ-এ পাশ করিয়া যখন বি-এ পড়িতেছে, তখন তাহার অনেকটা হিতাহিত জ্ঞান জন্মিয়াছে। সে যে সামান্য আমোদে এত পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা বোধ হয় না। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে।

এই চিন্তা করিয়া আমি সাবধান হইয়া কেবল মোহিনীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। সর্ব্বরঞ্জন নিজ কন্যার পরিবর্ত্তে ভ্রাতুষ্কন্যা গঙ্গাকে মন্ত্রপাঠ করিয়া দান করিলেন। মোহিনীও মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই দান গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, আমার আদেশ মত কল্যাণীর কাপড় ও গহনা সমস্তই গঙ্গার অঙ্গে ছিল।

ক্রমে শুভদৃষ্টির সময় আসিল। পাত্র ও পাত্রীর মস্তকের উপর একখানা মূল্যবান চাঁদোয়া ধরা হইল। আমি যেখানে বসিয়া ছিলাম, সেখান হইতে আর বরের মুখ দেখা গেল না। কাজেই কনের মুখ দেখিবার ভাণ করিয়া চাঁদোয়ার কিছু নিকটে গমন করিলাম।

যখন চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল, যখন মোহিনীকান্ত গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনই আমি মোহিনীর প্রফুল্লতার কারণ বুঝিতে পারিলাম। জানিলাম, কল্যাণীকে বিবাহ করিতে তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। কেবল পিতামাতার কথায় এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছিল। এখন গঙ্গা তাহার মনোমত হওয়ায় তাহার এত আনন্দ। গঙ্গাকে আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। গঙ্গার পিতা

সর্ব্বরঞ্জনের সহোদর ভ্রাতা নহেন। সুতরাং তিনি অন্যত্র বাস করিতেন; কাজে-কর্ম্মে কখনও কখনও আসিয়া থাকেন। আমার সহিত তাঁহার আলাপ নাই, সুতরাং গঙ্গা যে কে তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু এখন দেখিলাম, গঙ্গা পরমাসুন্দরী, কল্যাণীর মত লাবণ্য না থাকিলেও গঙ্গার সৌন্দর্য্য সামান্য নহে। কিন্তু মোহিনী কেন যে কল্যাণীকে বিবাহ করিতে নারাজ ছিল, তখন বুঝিতে পারিলাম না।

মোহিনীকান্ত কল্যাণীকে চিনিত। সে জানিত, কল্যাণীর সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে, কিন্তু বিবাহের সময় দেখিল, সে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা ভ্রম। তাহার স্ত্রী যখন মনোমত হইয়াছে, তখন যাহাই হউক না কেন, মোহিনী কোন কথা বলিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে ঘর হইতে কল্যাণী চুরি গিয়াছে, সেটী বাড়ীর তৃতীয় মহল। বিবাহের পর বরের বসিবার স্থান হইয়াছে দ্বিতীয় মহলে। বরকে সেই ঘরে লইয়া যাইবার পরই সর্ব্বরঞ্জন বাবু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভায়া! যদি সেই ঘরটা দেখা বিশেষ আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে এই উপযুক্ত সময়। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি, এইবার দ্বিতীয় মহলের দোতলার বড় ঘরে বরের বসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। তৃতীয় মহলের কেন, বাড়ীর যে যেখানে রমণী আছেন, সকল স্থান হইতেই আসিয়া তাঁহারা ঐ ঘরে

আশ্রয় লইবেন। তাই বলিতেছিলাম, এই উপযুক্ত সুযোগ। আমি কিন্তু আপনাকে এদিক দিয়া সেখানে লইয়া যাইতে পরিব না। আপনাকে খিড়্‌কী দিয়া যাইতে হইবে। সেই পথ দিয়াই কল্যাণীকে লইয়া গিয়াছে।

আমি সম্মত হইলাম। সর্ব্বরঞ্জন বাবু তাঁহার বিশ্বাসী চাকরকে আমার সঙ্গে দিলেন। সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। চাকরের কথামত আমি সহজেই খিড়্‌কী দিয়া বাড়ীর তৃতীয় মহলে প্রবেশ করিলাম। কি প্রকাণ্ড বাড়ী! এক একটা ঘর যেন এক একটা দালান।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভৃত্য একবার চারিদিক দেখিয়া আসিল। কেহ নাই দেখিয়া, সে আমাকে সেই ঘরে লইয়া গেল। যদিও সে সময়ে কোন লোক সে মহলে ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই আসিবার সম্ভাবনা জানিয়া, আমি ভৃত্যকে সেই মহলে প্রবেশ করিবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে বলিলাম। ভৃত্য অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল, সে পূর্ব্বেই সে কাজ সম্পন্ন করিয়াছে।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমি একবার চারিদিকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না, ঘরের ভিতর হইতে কোন সূত্র পাইলাম না।

আমি তখন খিড়্‌কী দরজার নিকট আসিলাম। ভৃত্যকে একটা আলোক আনিতে বলিয়া আমি সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ভৃত্য তখনই একটা আলোক আনিল। আমি সেই আলোকের সাহায্যে দেখিলাম, দরজাটী ভিতর হইতেই খোলা হইয়াছিল। বাহিরে যে শিকল ছিল, তাহা খোলাই থাকে, কেবল ভিতর দিকের হুড়কো বন্ধ হয়। ভিতর দিক হইতে কে

সেই দরজা খুলিল ? কল্যাণী তখন একা ছিল, তাহার নিকটে আর কোন লোক ছিল না। সম্ভবতঃ সে স্বয়ং দরজা খুলিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কল্যাণী স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে। অপর কোন লোক যে বলপূর্ব্বক তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, একথা মনে স্থান পাইল না। কিন্তু এ সকল কথা সর্ব্বরঞ্জন বাবুর নিকট প্রকাশ করিলাম না।

খিড়্‌কী দরজাটী পরীক্ষা করিয়া আমি সেই স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম, দরজা হইতে অতি সামান্য দূরে দুইখানি ক্ষুদ্র পায়ের চিহ্ন; শেষ চিহ্নের নিকট একজনের জুতার চিহ্ন রহিয়াছে। কিন্তু তাহার পর আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কেবল যেখানে সেই জুতার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, সেইখান হইতে একখানি গাড়ীর চাকার দাগ দেখা গেল।

এই সকল চিহ্ন দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, কল্যাণী স্ব ইচ্ছায় কোন যুবকের সহিত পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু সে যুবক কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, কল্যাণীর বয়স তের বৎসর। এ বয়সে আজকাল কলিকাতায় অনেকেই অবিবাহিতা থাকে। কল্যাণীকে দেখিয়া বড় শান্ত বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু এখন তাহার কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

প্রায় এক কোয়াটার নানা প্রকার চিন্তার পরও আমি কল্যাণীর প্রণয়ী কে জানিতে পারিলাম না। পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। দরজা অতিক্রম করিয়া দশ পনের হাত দূরে যেখানে সেই পুরুষের পদচিহ্ন দেখিয়াছিলাম, সেইখানে একখানা কাচ কুড়াইয়া পাইলাম। কাচখানি তখন পকেটে রাখিয়া আমি আরও

কিছুক্ষণ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছু করিতে পারিলাম না। এক প্রকার হতাশ হইয়া আমি সেখান হইতে বাহির হইলাম। ভৃত্যকে সেই মহলে আসিবার দরজা খুলিতে আদেশ করিয়া আমি পুনরায় সর্ব্বরঞ্জন বাবুর ঘহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিয়া সর্ব্বরঞ্জন নিকটে আসিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। আমি সঙ্কেত করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, তখনও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

সর্ব্বরঞ্জন বিমর্ষ হইলেন। আমি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলাম এবং কিছুক্ষণ এক নিভৃতস্থানে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম।

কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। আমি পকেট হইতে সেই কাচখানি বাহির করিয়া বারম্বার দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, কাচখানি কাহারও চশমা হইতে খুলিয়া পড়িয়াছে। কাচখানির রং ফিকে নীল, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য লোকে এ প্রকার কাচের চশমা ব্যবহার করে না। চক্ষুকে শীতল রাখিবার উদ্দেশেই এই প্রকার চশমা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার বোধ হইল, সেইদিন প্রাতে কোন লোককে ঐ প্রকার চশমা চক্ষে দিতে দেখিয়াছি। কিন্তু কাহার চক্ষে যে সেই চশমা ছিল, তাহা সহজে মনে আসিল না।

আরও কিছুক্ষণ অতীত হইল। নিমন্ত্রিত লোক সকল আহারাদি সমাপন করতঃ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নর্ত্তকী সকল পুরস্কার পাইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছিল, দর্শকবৃন্দ প্রস্থান করিল দেখিয়া তাহারাও নৃত্য স্থগিত রাখিল। বাহির-বাড়ীটা কিয়ৎ পরিমাণে নিস্তব্ধ হইল বটে,

কিন্তু অন্দর হইতে মধ্যে মধ্যে এমন হাসির রোল উঠিতে লাগিল যে, সেই শব্দে আমি চমকিত হইলাম।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমার মনে হইল, সেইদিন প্রাতে যখন সর্ব্বরঞ্জনের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, সেই সময়ে একজন মুসলমানকে এই প্রকার কাচযুক্ত চশমা পরিতে দেখিয়াছি। এখন একে একে সকল কথা মনে পড়িল।

আমি যখন ঐ বিবাহ-বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। যে কার্য্যে আসিয়াছিলাম, তাহাতে অধিক সময় অতীত হওয়ায়, আমার গাড়ী অতি দ্রুত-বেগেই যাইতেছিল। হঠাৎ সর্ব্বরঞ্জনের বাড়ী হইতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড জনতা দেখিয়া কোচমান অশ্বের গতি সংযত করিলে আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, একজন গণৎকার সকলের হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলিয়া দিতেছে। সেইজন্য পথে এত ভিড় যে, গাড়ী চালাইতে পারিতেছি না।

গণৎকারের নাম শুনিয়া আমারও কৌতূহল জন্মিল এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তজ্জন্য আমায় গাড়ী হইতে নামিতে হইল না। কণ্ঠস্বর শুনিয়া গণৎকার স্বয়ং আমার গাড়ীর নিকট আসিল। বলিল, "দারোগা বাবু! এদিকে আসিয়াছিলেন? দেখুন, এখানকার লোকে আমায় যেন পাগল পাইয়াছে। আমি যেখানে যাইতেছি, উহারাও আমার অনুসরণ করিতেছে। সেইজন্যই পথে এত ভিড়।"

গণৎকারের কথা শুনিয়া, আমার স্পষ্টই বোধ হইল, সে আমাকে চেনে; কিন্তু আমার ত-কিছুই মনে পড়িল না।

আমি যে তাহাকে কোথা দেখিয়াছি, অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা মনে পড়িল না। কিন্তু গণৎকারকে সেকথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। তাঁহার কথায় হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি যখন লোকের ভূত, ভবিষ্যৎ বলিতে পার, তখন উহারা তোমায় ছাড়িবে কেন?"

গণৎকারও হাস্য করিল; "বলিল,—আপনার আশীর্ব্বাদে আমি জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি। আমার নাম ইব্রাহিম খাঁ, আপনাকে আমি বেশ জানি। সেদিন যে ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে, যাহার সন্ধানের ভার আপনার হস্তে পড়িয়াছে, তাহার আসামীদিগকে শীঘ্রই ধরিতে পারিবেন। যদি দয়া করিয়া আপনার হস্তপ্রসারণ করেন, তাহা হইলে ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আমি বড় ব্যস্ত। তুমি যখন আমায় চেন, তখন নিশ্চয়ই আমার বাসা জান। কাল প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। সেই সময়ে আমার হাত দেখিয়া যাহা গণনা করিতে হয় করিও।"

ইব্রাহিম খাঁ আমার কথায় সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "আপনি বেশ বলিয়াছেন। কালই আপনার হাত দেখিব। আপনি কোথায় থাকেন তাহা বেশ জানি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি হাত দেখিবার জন্য কত পারিশ্রমিক লইয়া থাক?"

ইব্রাহিম খাঁ হাত নাড়িয়া বলিল,—"এমন কথা বলিবেন না। পয়সা লইয়া হাত দেখিবার হুকুম নাই। আমার গুরুর আদেশ যে, বিনা পয়সায় সকলের অদৃষ্ট-ফলাফল বলিয়া দিব। তবে যদি কেহ সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সে

টাকা গ্রহণে বাধা নাই। আমি এইমাত্র এই বিবাহ-বাড়ী হইতে আসিতেছি। কন্যাকর্ত্তা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পাঁচটাকা পুরস্কার দিয়াছেন।” এই বলিয়া ইব্রাহিম খাঁ আমাকে পাঁচটা টাকা দেখাইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কিজন্য তোমায় পুরস্কার দিলেন? তুমি কি করিয়াছিলে?

ইব্রাহিম খাঁ হাসিতে হাসিতে বলিল,—“তাঁহার কন্যার হাত দেখিয়া তাঁহার ভাবী সুখ-স্বচ্ছন্দের কথা গণনা করিয়া বলিয়াছিলাম, এই বিবাহ এত সমারোহে সম্পন্ন হইবে যে, গ্রামের সমস্ত লোকের অনেকদিন যাবৎ একথা স্মরণ থাকিবে। এই বিবাহ দ্বারা এক ভয়ানক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। অবশ্য সে পরিবর্ত্তনে উভয় পক্ষেরই সাতিশয় মঙ্গলের সম্ভাবনা।”

আমি আর কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া, ইব্রাহিম সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। আমিও কোচমানকে গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলাম। দেখিলাম, সেই লোকসকল আবার ইব্রাহিম খাঁকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইব্রাহিম খাঁর বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। কিন্তু তাহাকে দেখিতে যেন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। যদিও সে নিতান্ত

কৃশ বা দুর্ব্বল নহে, তথাপি তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হয়, তাহার যৌবন অতীত হইয়াছে। মুখে একপুরু ময়লা জমিয়া গিয়াছে। কতকাল যে ইব্রাহিম স্নান করে নাই তাহা বলা যায় না। তাহার পরিধানে একটা সাদা পায়জামা, একটা ফতুয়া, তাহার উপর একটি টুপী, তাহার চারিদিকে একটা চাদর জড়ান। পায়ে লাহোরের চটী, চক্ষে চশমা। এই চশমার কাচের মত একখানি কাচ আমার নিকট ছিল। কাচখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বোধ হইল, সেখানি ইব্রাহিমের চশমা খুলিয়া পড়িয়াছে। ইব্রাহিম নিশ্চয়ই এখানে অনেকবার আসিয়াছিল। প্রথমবারে যখন সে কল্যাণীর হাত দেখিয়া গণনা করিয়াছিল, তখন তাহার চশমার দুইখানি কাচই ছিল। নিশ্চয়ই সে তাহার পর আবার এখানে আসিয়াছিল।

ইব্রাহিম কে? লোকটাকে দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল, যেন সে আমার পরিচিত। কিন্তু আর কোথায় যে তাহাকে দেখিয়াছি, তাহা তখন স্থির করিতে পারি নাই। ইব্রাহিম নিশ্চয়ই একজন ছদ্মবেশী। তাহার সর্ব্বাঙ্গে রং-মাখান বলিয়া বোধ হয়। নতুবা মানুষের গাত্রে তত ময়লা সম্ভবে না। সে আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য গাত্রে রং মাখিয়াছিল। কে সে?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ এক-জনের উপর সন্দেহের উদয় হইল। সন্দেহ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন বোধ হইল যে, সেই কল্যাণীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

যাহার উপর সন্দেহ হইল, তাহার নাম নলিনীকান্ত। তাহার বাড়ী সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাড়ী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে। নলিনীকান্তের পিতা মাতা উভয়েই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সেই এখন সমস্ত

সম্পত্তির মালিক। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা দেয় নাই। তবে সে ইংরাজীতে বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত। ইহাঁরা মুখুর্য্যে নামে খ্যাত।

বহুদিন হইতে এই মুখুর্য্যে পরিবারের সহিত রায়-পরিবারের বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। একটা প্রকাণ্ড মাঠ লইয়াই এই বিবাদ আরম্ভ হয়। নলিনীকান্তের পিতামহ এই বিবাদের সূত্রপাত করেন, এখনও সম্পূর্ণ মিটিয়া যায় নাই। এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের কত অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

সর্ব্বরঞ্জন বাবুই ন্যায়সঙ্গত সেই মাঠের অধিকারী। বিচারকও সেই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত সংবাদ আমি সর্ব্বরঞ্জন বাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। নলিনীকান্তকেও আমি বেশ চিনিতাম। যদিও তাহার পিতা ও পিতামহের সহিত সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বিবাদ চলিতেছিল, তত্রাপি নলিনীকান্ত মধ্যে মধ্যে সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে আসিত এবং সামান্য দুই একটা কথা কহিয়া চলিয়া যাইত। তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যাহাতে তাহার পৈতৃক বিবাদ মিটিয়া যায়।

যে যুবকের সহিত কল্যাণীর বিবাহের কথা ছিল, তাহার সহিত নলিনীকান্তের বড়ই সদ্ভাব। মোহিনী বিদ্যান, নলিন মূর্খ, মোহিনী দুর্ব্বল ও কৃশ, নলিনী সবল ও হৃষ্টপুষ্ট, মোহিনী কেবল পুস্তক লইয়াই থাকিত, নলিনী কেবল বনে বনে পক্ষী শীকার করিয়া বেড়াইত; উভয়ের চরিত্রতে এই প্রকার বৈষম্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে কেন যে এত সদ্ভাব হইল, তাহা বলিতে পারিলাম না। দিনের মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎ

হইত। সেই সময়ে তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিত।

একদিন আমি নলিনীকে ঐ প্রকার কথা কহিতে দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "নলিনীকান্ত! তোমার সহিত মোহিনীর এত সদ্ভাব কিরূপে হইল? তোমাদের উভয়ের চরিত্র একপ্রকার না হইলেও তোমাদের মধ্যে যত সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না।"

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। বলিল, "মোহিনী আমা অপেক্ষা অনেক বিষয় ভালরূপ জানে। আমি তাহাকে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করি, সে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া অতি সরল কথায় আমাকে তাহা বুঝাইয়া দেয়। অথচ তাহার জন্য সে কখন অহঙ্কার করে না। তাহার মত সচ্চরিত্র বালক এ অঞ্চলে নাই। সেই জন্যই আমাদের উভয়ের এত সদ্ভাব দেখিতে পান। বিশেষতঃ, মোহিনী দুর্ব্বল, আমি সবল, সে যেমন একবিষয়ে আমায় সাহায্য করে, আমিও তেমনই অপরাপর অনেক বিষয়ে তাহার সাহায্য করিয়া থাকি।"

আমি আর কোন উত্তর করি নাই। এখন সেই চশমার কাচ-খানি পাইয়া আমার একে একে সমস্ত কথা মনে পড়িল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, এই নলিনীকান্তই কল্যাণীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ চিন্তায় রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিল। আর সময় নষ্ট করা উচিৎ নহে বিবেচনা করিয়া, আমি তখনই নলিনীকান্তের বাড়ী গেলাম এবং বাহির হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল, "নলিনী বাবু বাড়ীতে নাই।" যদিও নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না, তত্রাপি সে বাড়ী নাই শুনিয়া আন্তরিক আনন্দিত হইলাম। ভাবিলাম, আমার সন্দেহ বুঝি সত্যে পরিণত হইল। কিন্তু আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তিনি গেলেন কোথায়? রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও বাড়ীতে ফিরেন নাই?"

ভৃত্য আমার কর্কশ গম্ভীরস্বর শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। পরে সে কাঁদ কাঁদস্বরে উত্তর করিল,—"বাবু বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি তিন চারি দিন এখানে আসিবেন না।"

আ। কোথায় গিয়াছেন?

ভৃ। আজ্ঞে আমি চাকর, সেকথা কেমন করিয়া বলিব?

আ। কেমন করিয়া বলিবে জানি না। কোথায় গিয়াছেন, জান।

ভৃত্য সহসা কোন উত্তর করিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিল,— "ঠিক জানি না।"

আমি আরও কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"যাহা জান বল?

ঠিক হউক আর নাই হউক, সে বিষয়ে তোমায় কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে না।”

ভৃত্য ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—“তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছেন শুনিয়াছি। সত্য মিথ্যা কিছুই জানি না।”

আ। সেই বন্ধুর বাড়ী কোথায় ?

ভৃ। শুনিয়াছি শিবপুরে।

আ। শিবপুরে ত তাঁহার নিজের একটী বাগান আছে। তিনি ত সেই বাগানে যান নাই ?

ভৃ। আজ্ঞে সে কথা ত আমাদের বলেন নাই। যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আপনাকে জানাইয়াছি।

আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম এবং তখনই কোচমানকে শিবপুরের দিকে যাইতে বলিলাম। সর্ব্বরঞ্জন বাবু আমার যে বিশেষ বন্ধু সে কথা পাঠক মহাশয় অবগত আছেন। তিনিই আমাকে নলিনী বাবুর শিবপুরের বাগানের কথা বলিয়াছিলেন। যখন শিবপুরে পঁহুছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষীণজ্যোতি প্রকাশ করিতেছে। মৃদুমন্দ বাতাস থাকিয়া থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময় আমি বাগানের ফটকের নিকট অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, দ্বার খোলা। যদি বাগানে কোন লোক না থাকিত, তাহা হইলে ফটক বন্ধ হইত। বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। বাড়ীখানি দ্বিতল। উপরতলার একটী ঘরে আলোক জ্বলিতেছিল,

তদ্ভিন্ন সেই প্রকাণ্ড বাটী অন্ধকারময়। আমি উপরে উঠিতে যাই-তেছি, এমন সময় একজন মালি আলোকহস্তে আমায় বাধা দিল। মালিকে দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। লোকটা অসভ্য, ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে জানে না। এরূপ কর্কশভাবে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল যে, আমার ভয়ানক রাগ হইল। আমি কোন উত্তর না করিয়া বাগানের মালিক নলিনীকান্ত সেখানে আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। সে প্রথমে কোন কথা বলিতে স্বীকার করিল না; অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর পথ ছাড়িয়া দিল।

উপরে উঠিয়া দেখিলাম, সকল ঘরেরই দরজা বাহিরদিকে চাবি বন্ধ। কেবল একটীর ভিতরদিক হইতে বন্ধ। ভিতরদিক হইতে আবদ্ধ গৃহের দরজার সম্মুখে গিয়া সজোরে এক ধাক্কা মারিলাম। একটা ভয়ানক শব্দ হইল। ভিতরদিক হইতে শব্দ আসিল, "কে তুমি?"

বজ্রগম্ভীর স্বরে আমি বলিলাম, "শীঘ্র দরজা খোল নলিনীবাবু! তোমার চুরিবিদ্যা ধরা পড়িয়াছে। যদি ভাল চাও, শীঘ্র দরজা খোল। নতুবা এখনই দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" আমার কণ্ঠস্বরে বোধ হয় আমার পরিচয় পাইয়াছে।

ভিতর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর আসিল, "কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি দরজা খুলিয়া দিতেছি।"

শীঘ্রই দরজা খুলিয়া নলিনীকান্ত বাহির হইল। আমি তখন বলিলাম, "নলিনী বাবু! দেখ, তোমার জন্য আমার এইরাত্রে কত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। এক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া এত লাঞ্ছনা, কেবল তোমারই জন্য। যাহা হইক, এখন কল্যাণীকে

লইয়া আইস, আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আমাকে তুমি বেশ চেন, বেশী কথার লোক আমি নয়।"

নলিনীকান্ত সহসা আমার পদতলে পড়িয়া দুইহস্তে আমার দুটী পা জড়াইয়া ধরিল। পরে মস্তক অবনত করিয়া আমার পদদ্বয় স্পর্শ করিল এবং তখনই এমনভাবে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল যে, তাহাকে তখন অপরাধী বলিয়া বোধ হইল না।

এইরূপে দণ্ডায়মান হইয়া নলিনীকান্ত বলিল,—"আমার আর যতই দোষ বা পাপ থাকুক না কেন, আজ আমি কোন দোষে দোষী নহি। আমি কল্যাণীকে ভালবাসি, কল্যাণী আমাকে ভালবাসে। সেই আমার সহিত পলায়ন করিয়া আসিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। আমি তাহাকে এই পরামর্শ দিতে সাহস করি নাই। সে স্ত্রীলোক হইয়া যখন আমার সহিত পলায়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন আমি তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া, কোন্ লজ্জায় না তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইব?"

আ। তোমাদের উভয় বংশের মধ্যে অনেকদিন হইতে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। তুমি কল্যাণীকে লইয়া কি করিবে? বিবাহ করিবে কি প্রকারে?

ন। আপাতত বিবাহ করিতে পারিব না বটে কিন্তু যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন কল্যাণী এই বাগানে থাকিবে।

আ। মোহিনীকান্ত তোমার পরম বন্ধু, বন্ধুর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ?

ন। সত্যসত্যই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছি। মোহিনী কল্যাণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী নহে। কল্যাণীকে বিবাহ করিতে হইবে বলিয়া সে আমার কাছে কত দুঃখ করিয়াছে।

"বিবাহের সময় মোহিনীর মুখ দেখিয়া সেকথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।" আমি পুনঃ দৃঢ়ভাবে বলিলাম, "যে গাড়ীতে আসিয়াছি, সেই গাড়ীতে কল্যাণীকে লইয়া যাইব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। তবে এই পর্য্যন্ত করিতে পারি, তুমিও সেই গাড়ীতে সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বড়ীতে যাইতে পার। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সেখানে গিয়া সর্ব্বরঞ্জন বাবুর অনুমতিক্রমে তোমাদের বিবাহ দিতে পারিব।"

নলিনীকান্ত আমার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু মুখে কোন কথা কহিল না। আমি বলিলাম, "বোধ হয় তুমি জান যে, আমি কথায় যাহা বলি, কাজেও তাহা করি।"

নলিনীকান্ত আর কোন কথা কহিল না; ঘরের ভিতরে গিয়া তখনই কল্যাণীকে লইয়া আসিল। কল্যাণী আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং একবার হাসিয়া মুখ নত করিল। পরে সকলে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাটীর দিকে ছুটিল।

কিছুদূর গমন করিলে পর, নলিনীকান্ত কহিল, "মহাশয়, একটা কথা জানিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, আমিই কল্যাণীকে এই বাগানে আনিয়াছি। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি এই বিষয় চিন্তা করিতেছি, কিন্তু কেমন করিয়া আপনি আমাকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আমার সহিত কোন প্রকার চাতুরী করিতে চেষ্টা করা বৃথা। তুমি মনে করিয়াছিলে, তোমার মত চতুর আর কেহ নাই। কিন্তু এখন দেখিলে তোমার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

নলিনীকান্ত নাছোড়বান্দা। সে কিছুতেই আমার কথায় শান্ত হইল না। বলিল, "কি কৌশলে আপনি আমায় গ্রেপ্তার করিলেন, তাহা আমার জানিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আমি এই বয়সে অনেক চাতুরী করিয়াছি, কিন্তু একবারও ধরা পড়ি নাই।"

আ। কেন না, সে সকল ব্যাপারের সন্ধানের ভার আমার হাতে পড়ে নাই। যদি আমার উপর তাহাদের সন্ধানের ভার পড়িত, তাহা হইলে তুমি তখনও নিশ্চয়ই ধরা পড়িতে। তুমি মনে করিয়াছিলে, আমি ইব্রাহিম খাঁকে চিনিতে পারি নাই, কেমন?

ন। ইব্রাহিম খাঁ! সে আবার কে?

আ। জান না? একজন গণৎকার বেশে নলিনীকান্ত—তুমি।

নলিনী হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে আপনি তখন কেন আমাকে ধরিতে পারিলেন না?"

আ। তখন ধরিলে আমার উদ্দেশ্য সফল হইত না। গণৎকার সাজিবার উদ্দেশ্য কি জানিতে পারিতাম না। যখন আমি শুনিলাম যে, তুমি সর্ব্বরঞ্জন বাবুর চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করতঃ পাঁচ টাকা পুরস্কার লইয়া আসিয়াছ, তখনই তোমার উপর আমার সন্দেহ হয়। তোমার সহিত সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বহুদিন হইতে শত্রুতা। তুমি সহজে তাঁহার বাড়ীর নিকট যাইতে পারিবে না জানিয়া, ঐ প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলে। তাহার পর যখন শুনিলাম, কল্যাণী চুরি গিয়াছে, তখনই তোমার উপর আমার সন্দেহ হয়। যখন বর মহা সমারোহে সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাটীতে উপস্থিত হয়, সেই সময় সমস্ত মহিলা কল্যাণীকে ত্যাগ করিয়া বর দেখিবার জন্য বহির্বাটীতে আসিয়াছিল। তুমিও সেই সুযোগে

কল্যাণীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলে। কেমন, আমার কথা সত্য কি না?

ন। সম্পূর্ণ সত্য। যখন কল্যাণীর হাত দেখিয়াছিলাম, সেই সময়ে কৌশলে তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। পত্রে ঐ কথাই লেখা ছিল। মোহিনী আমার পরম বন্ধু। সে যে মহা সমারোহে কন্যার বাটীতে আসিবে, তাহা আমি বেশ জানিতাম। স্ত্রীলোকেরা বর দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া থাকে, তাহা ত আমার অজ্ঞাত নহে। পত্রে ঐ সময়ে খিড়কী দরজা খুলিয়া রাখিতে কল্যাণীকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সে আমায় আন্তরিক ভালবাসে। আমার কথা অবহেলা করে নাই। কল্যাণী যেমন খিড়কী দরজা খুলিয়া দরজা দিয়া উঁকি মারিল, অমনি আমি তাহাকে কোলে করিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া লইলাম। গাড়ী বেগে ছুটিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাগানের সর্দ্দার মালীকে আমি ইতিপূর্ব্বে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম। আমরা বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সে আমাদিগকে দ্বিতলের একটী ঘরে লইয়া গেল। তাহার পর আপনি সমস্তই জানেন।

আ। তোমার ও কল্যাণীর পায়ের দাগ দেখিয়া, গাড়ীর চাকার চিহ্ন দেখিয়া এবং অবশেষে তোমার চশমার একখানি কাচ পাইয়া তোমারই উপর আমার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। আমি আর কোথাও চেষ্টা না করিয়া একেবারে তোমার বাড়ী গিয়া তোমার সন্ধান লই। কিন্তু সেখানে তুমি না থাকায় আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। বাড়ীর চাকরের মুখে শুনিলাম, তুমি কিছুদিন বাড়ী ফিরিবে না। তোমার যে শিবপুরে একখানি বাগান আছে তাহা আমি জানি-

তাম। তখনই গাড়ী ভাড়া করিয়া তোমার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

নলিনীকান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার চশমার কাচ পাইয়াছেন? সত্য না কি? আমি তাহা আদৌ জানিতাম না।"

এই বলিয়া নলিনীকান্ত তাহার চশমা বাহির করিল। দেখিল, সত্যসত্যই তাহার একখানি কাচ নাই; কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে। তখন সে বিরক্ত হইয়া বলিল,—"এই চশমাই যত অনিষ্টের মূল। ইহাকে আর নিজের কাছে রাখা উচিত হয় না।" এই বলিয়া সে চশমাখানিকে দূরে নিক্ষেপ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন আমরা সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে আসিলাম, তখন সর্ব্বরঞ্জন বাবু অতি বিমর্ষভাবে বাহিরে বসিয়াছিলেন। আমি গাড়ী হইতে একা নামিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলাম দেখিয়া, তিনি হতাশ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভায়া, কল্যাণীর কোন সন্ধান পাইলে?"

আমি তাঁহার মুখ দেখিয়া অত্যন্ত-দুঃখিত হইলাম, কোন কথা গোপন করিবার ইচ্ছা হইল না, সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

কল্যাণীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলে। কেমন, আমার কথা সত্য কি না?

ন। সম্পূর্ণ সত্য। যখন কল্যাণীর হাত দেখিয়াছিলাম, সেই সময়ে কৌশলে তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। পত্রে ঐ কথাই লেখা ছিল। মোহিনী আমার পরম বন্ধু। সে যে মহা সমারোহে কন্যার বাটীতে আসিবে, তাহা আমি বেশ জানিতাম। স্ত্রীলোকেরা বর দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া থাকে, তাহা ত আমার অজ্ঞাত নহে। পত্রে ঐ সময়ে খিড়্‌কী দরজা খুলিয়া রাখিতে কল্যাণীকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সে আমায় আন্তরিক ভালবাসে। আমার কথা অবহেলা করে নাই। কল্যাণী যেমন খিড়্‌কী দরজা খুলিয়া দরজা দিয়া উঁকি মারিল, অমনি আমি তাহাকে কোলে করিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া লইলাম। গাড়ী বেগে ছুটিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাগানের সর্দ্দার মালীকে আমি ইতিপূর্ব্বে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলাম। আমরা বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সে আমাদিগকে দ্বিতলের একটী ঘরে লইয়া গেল। তাহার পর আপনি সমস্তই জানেন।

আ। তোমার ও কল্যাণীর পায়ের দাগ দেখিয়া, গাড়ীর চাকার চিহ্ন দেখিয়া এবং অবশেষে তোমার চশমার একখানি কাচ পাইয়া তোমারই উপর আমার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। আমি আর কোথাও চেষ্টা না করিয়া একেবারে তোমার বাড়ী গিয়া তোমার সন্ধান লই। কিন্তু সেখানে তুমি না থাকায় আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইল। বাড়ীর চাকরের মুখে শুনিলাম, তুমি কিছুদিন বাড়ী ফিরিবে না। তোমার যে শিবপুরে একখানি বাগান আছে তাহা আমি জানি-

তাম। তখনই গাড়ী ভাড়া করিয়া তোমার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

নলিনীকান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার চশমার কাচ পাইয়াছেন? সত্য না কি? আমি তাহা আদৌ জানিতাম না।"

এই বলিয়া নলিনীকান্ত তাহার চশমা বাহির করিল। দেখিল, সত্যসত্যই তাহার একখানি কাচ নাই; কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে। তখন সে বিরক্ত হইয়া বলিল,—"এই চশমাই যত অনিষ্টের মূল। ইহাকে আর নিজের কাছে রাখা উচিত হয় না।" এই বলিয়া সে চশমাখানিকে দূরে নিক্ষেপ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন আমরা সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে আসিলাম, তখন সর্ব্বরঞ্জন বাবু অতি বিমর্ষভাবে বাহিরে বসিয়াছিলেন। আমি গাড়ী হইতে একা নামিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলাম দেখিয়া, তিনি হতাশ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভায়া, কল্যাণীর কোন সন্ধান পাইলে?"

আমি তাঁহার মুখ দেখিয়া অত্যন্ত-দুঃখিত হইলাম, কোন কথা গোপন করিবার ইচ্ছা হইল না, সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

কল্যাণীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি শুনিয়া তিনি তখনই গাড়ীর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে বাধা দিলাম। বলিলাম,—"সর্ব্বরঞ্জন বাবু! আমি যাহা বলি শুনুন। যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে আপনারা সকলেই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। আমি কল্যাণীকে আনিয়াছি সত্য, কিন্তু সে মোহিনীকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। আপনার পুত্র নাই, কল্যাণীই আপনার একমাত্র সন্তান। তাহার সুখ-দুঃখের প্রতি আপনার বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সে যখন মোহিনীকে বিবাহ করিতে নারাজ, তখন জোর করিয়া তাহার সহিত কল্যাণীর বিবাহ দিলে ভবিষ্যতে উভয়েরই কষ্ট হইবে, আপনাকেও যাবজ্জীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।"

এই বলিয়া আমি চুপ করিলাম। সর্ব্বরঞ্জন বাবু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন,—"আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু কল্যাণীর যদি মোহিনীকে বিবাহ করিবার এতই অনিচ্ছা ছিল, তবে সে কেন পূর্ব্বে আমাকে এ সকল কথা জানায় নাই; তাহা হইলে ত কোন গোলযোগ হইত না। এখন অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছি, কি করিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইব বুঝিতে পারিতেছি না। কল্যাণীর গাত্র-হরিদ্রাদি বিবাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ শেষ হইয়াছে। যদি এই লগ্নে কল্যাণীর বিবাহ না হয়, তাহা হইলে আমায় জাতিচ্যুত হইতে হইবে। বিশেষতঃ কল্যাণীর মনোমত পাত্রই বা এই রাত্রে কোথা হইতে সংগ্রহ করিব?"

আ। সকল কথা না শুনিয়া আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? যাহাতে আপনাকে জাতিচ্যুত হইতে না হয়, তাহার উপায় আমি করিব। কল্যাণী নিজেই তাহার মনোমত পতি সংগ্রহ করিয়াছে।

ম। কে সে পাত্র ?

আ। ক্রমে বলিতেছি, ব্যস্ত হইবেন না।

ম। তাহার বাড়ী এখান হইতে কতদূর ?

আ। অধিকদূর নহে, আপনার বাটীর নিকটেই।

ম। নাম বলুন—এখনই সেখানে সংবাদ পাঠাইতে হইবে। আর এক কথা, পাত্র বা তাহার পিতা মাতা এরূপ হঠাৎ বিবাহে সম্মত হইবেন কেন ?

আ। পাত্রের পিতা মাতা নাই—সে নিজেই নিজের অভি-ভাবক।

ম। পাত্র স্বয়ং সম্মত আছে ?

আ। উভয়ের মত না থাকিলে কি কল্যাণী এইস্থান হইতে পলায়ন করে ?

ম। তবে কি কল্যাণীকে কেহ চুরি করে নাই ? সে কি স্ব-ইচ্ছায় আমার গৃহত্যাগ করিয়াছিল ?

আ। না, কল্যাণীকে কেহ চুরি করে নাই—সে নিজের ইচ্ছায় তাহার প্রণয়ীর সহিত পলায়ন করিয়াছিল।

ম। মোহিনীর কি দশা হইবে ? সে যে কল্যাণীকে না পাইলে মহা গোলযোগ করিবে।

আ। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। মোহিনী কল্যা-ণীকে চেনে। যদি সে কোন গোলযোগ করিতে ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে শুভদৃষ্টির সময়ই করিত। তখনই সে জানিতে পারিয়া-ছিল যে, তাহার সহিত কল্যাণীর বিবাহ হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, মোহিনী যেমন আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, কল্যাণীও তেমনি তাহাকে বিবাহ করিতে নারাজ।

ম। কেমন করিয়া আপনি একথা জানিতে পারিলেন?

আ। শুভদৃষ্টির সময় যদি বরের মুখের দিকে একবার নজর করিতেন, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন। পাত্র যখন বিবাহ-সভায় বসিয়াছিল, তখন তাহাকে যত বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিয়াছিলাম, শুভদৃষ্টির পর তাহাকে তত প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট দেখিয়াছি। আর এক কথা, যদি তাহার কল্যাণীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে সে তখনই একটা গোলযোগ করিয়া বসিত। সে সম্বন্ধে আপনার কোন চিন্তা নাই। মোহিনী যে এই বিবাহে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

সর্ব্বরঞ্জন অনেকটা শান্ত হইলেন। বলিলেন,—"ভাল, একদিকের গোল মিটিল, এখন পাত্র কে বলুন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"সেজন্যও আপনাকে ভাবিতে হইবে না। পাত্র আমার সঙ্গেই আছে।"

সর্ব্বরঞ্জন ব্যগ্রভাবে আমার দুটী হাত ধরিলেন। বলিলেন,—"যদি আমার জন্য এতই করিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া পাত্রের পরিচয় দিয়া আমার চিন্তা দূর করুন।"

যেভাবে সর্ব্বরঞ্জন ঐ কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আমার বড় দয়া হইল। আমি তখনই পাত্রের পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইলাম। কিন্তু আমার সাহসে কুলাইল না। যাহাদের সহিত তিনপুরুষ ধরিয়া বিবাদ চলিতেছে, সেই বংশের বংশধরের সহিত কেমন করিয়া নিজের একমাত্র কন্যার বিবাহ দিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যখন সেই একমাত্র উপায় ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই, তখন আমায় বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। বিশেষতঃ নলিনীকান্তের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পূরণের

জন্য আমায় সে কথা বলিতে হইবে। এই মনে করিয়া বলিলাম, "সর্ব্বরঞ্জন বাবু! পাত্রের জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। পাত্র আপনার সম্পূর্ণ পরিচিত—নলিনীকান্ত বন্দোপাধ্যায়।"

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলে লোকে যেমন চমকিত হয়, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অজগর সর্প দেখিলে পথিক যেমন সশঙ্কিত হইয়া স্তম্ভিত হয়, নিদ্রাভঙ্গে ক্রোড়স্থ শিশুকে মৃত অবলোকন করিলে তাহার গর্ভধারিণী যেমন হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে, আমার মুখে নলিনীর নাম শুনিয়া সর্ব্বরঞ্জন ততোধিক স্তম্ভিত ভীত ও চমকিত হইলেন। বলিলেন, "কল্যাণী যদি মরিয়া যায়, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই, কল্যাণীর জন্য যদি আমার জাতিচ্যুত হইতে হয়, সেও ভাল, কল্যাণীকে না পাইলে যদি আমাকে যাবজ্জীবন অনুতাপ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমার শত্রুর হস্তে আমার জীবনসর্ব্বস্ব কল্যাণীকে উৎসর্গ করিতে পারিব না।"

আমি সর্ব্বরঞ্জনের কথায় স্তম্ভিত হইলাম। বলিলাম,—"সর্ব্বরঞ্জন বাবু! আপনি জ্ঞানবান হইয়া এমন মূর্খের মত কথা বলিতেছেন কেন? যাহাদের সহিত তিনপুরুষ ধরিয়া আপনাদের বিবাদ চলিতেছে, যাহাদের সহিত মোকদ্দমায় আপনারা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন, তাহাদের বংশধর যদি ইচ্ছা করিয়া এই বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তবে আপনি তাহাতে বাধা দেন কেন? আপনি কিছু উপযাচক হইয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহিতেছেন না। পাত্র স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে আপনার ক্ষতিবৃদ্ধি কি?"

[সর্ব্ব]রঞ্জন বলিলেন,—"লোকে কি বলিবে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"প্রথমে অবশ্যই তাহারা নানা কথা কহিবে বটে কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্তই মিটিয়া যাইবে। প্রায় আশী বৎসর ধরিয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, এই বিবাহদ্বারা সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে। যে মাঠ লইয়া এতকাল লাঠালাঠি চলিতেছিল, এখন সেই মাঠে উভয় পরিবারের লোকই খেলা করিতে পাইবে। আপনার বয়স হইয়াছে, আর কতদিন এ সংসারে থাকিবেন? এখন যাহাতে আপনার কন্যা কল্যাণী সুখে থাকে তাহাই করুন।"

আমার কথায় সর্ব্বরঞ্জন বাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। বলিলেন,—"তবে তাহাই হউক। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করি এমন ক্ষমতা আমার নাই।"

এই বলিয়া সর্ব্বরঞ্জন বাবু তখনই সেই গাড়ীর নিকটে গেলেন এবং দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, কল্যাণী লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বসিয়া রহিয়াছে। তাহারই ঠিক সম্মুখে নলিনীকান্ত গম্ভীরভাবে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে গাড়ীর দরজা খুলিতে দেখিয়া নলিনীকান্ত গাড়ী হইতে অবতরণ করিল এবং ভাবী শ্বশুরের পদদ্বয় দুইহস্তে ধারণ করিয়া বলিল,—"আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি না বুঝিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। কল্যাণী যখন আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল, সেই সময়ে সেকথা আপনার গোচর করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তখন আমার চিত্ত এত চঞ্চল ছিল যে, আমার হিতাহিতজ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল।"

সর্ব্বরঞ্জন দুইহস্তে ভাবী জামাতাকে তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "বাবা, আর ও সকল কথার প্রয়োজন নাই। ও সকল কথা

ভুলিয়া যাও। আজ হইতে দুই পরিবারের মিলন হইল। জগদী-শ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার।"

রাত্রি নয়টার পর হইতে সমস্ত রাত্রিই লগ্ন ছিল। সুতরাং নলিনীর সহিত কল্যাণীর বিবাহ সেই রাত্রেই সম্পন্ন হইল। পুরো-হিত মহাশয়গণ ইতিপূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহা-দিগের বাড়ী নিকটেই ছিল। সুতরাং সত্বর সেখানে সংবাদ গেল। তাঁহারাও যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে যখন এই বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল, আমি তখন মোহিনীকে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মোহিনী নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মোহিনীকান্ত! আমায় সত্য করিয়া বল দেখি, এ বিবাহে তুমি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইয়াছ?"

মোহিনী ঈষৎ হাসিল। বলিল,—"আপনি যদি সেকথা না জানিতেন, তাহা হইলে এ প্রশ্ন করিতেন না। কল্যাণীকে বিবাহ করিবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না, কেবল পিতামাতার কথায় আমি সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু কে জানিত যে, ভগবান আমার আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন?"

আমি বলিলাম, "তোমার অভিভাবকগণ এখনও একথা অবগত নহেন। যখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন, তখন তুমি কি বলিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিবে? তাঁহারা হয়ত সর্ব্বরঞ্জন বাবুর উপর ভয়ানক রাগান্বিত হইবেন এবং তাঁহার চাতুরীর জন্য কতই নিন্দা করিবেন।"

মো। আমি তাহার উপায় করিব। আমিও পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমার কথা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন

না। বিশেষতঃ যখন তাঁহারা জানিবেন যে, আমি এই বিবাহে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তখন তাঁহারাও আর দ্বিরুক্তি করিবেন না।

আ। তোমার যৌতুকের কি হইবে? গঙ্গার পিতা ধনবান নহেন। তিনি যে তোমায় যথেষ্ট যৌতুক দিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না।

মোহিনী আমার কথায় চিন্তিত হইল। সে সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় সর্ব্বরঞ্জন বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূরে থাকিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। মোহিনীকে নীরব দেখিয়া উত্তর করিলেন,—"যৌতুকের জন্য কোন চিন্তা নাই। যদি তুমি তোমার পিতামাতাকে শান্ত করিতে পার, তাহা হইলে কল্যাণীর সহিত তোমার বিবাহে যে যৌতুক পাইতে, গঙ্গার সহিত বিবাহ হইলেও আমি তোমার সেই পরিমাণেই যৌতুক দিব। গঙ্গার পিতা দরিদ্র বটে, ঐ পরিমাণ যৌতুক দিবার ক্ষমতা তাহার নাই বটে, কিন্তু তোমার সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই; আমিই সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিব।"

মোহিনী আন্তরিক আনন্দিত হইল। সেইরাত্রেই কল্যাণীর সহিত নলিনীকান্তের বিবাহ হইয়া গেল।

সমাপ্ত।

পূজারি বামুন

বা

পুরোহিত।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [পৌষ।

পূজারি বামুন

বা

পুরোহিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটা চুরির মামলায় সমস্তদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া যখন থানায় ফিরিয়া আসিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে একজন কনষ্টেবলের সহিত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

ভয়ানক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিশ্রাম-সুখ-লাভ করিতেছিলাম, সহসা গৃহমধ্যে কাহার পদশব্দ শুনিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলাম। দেখিলাম, এক ব্রাহ্মণ, বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ ও হৃষ্টপুষ্ট। কিন্তু তাঁহার দেহের মাংস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার নিম্নে কালিমা-রেখা পড়িয়াছে, ললাট প্রশস্ত কুঞ্চিত ও চিন্তারেখা-সমন্বিত, মস্তক মুণ্ডিত, কেবল মধ্যে একগুচ্ছ কেশ শিখাকারে বৃদ্ধের পৃষ্ঠে লম্বমান। নাসিকা ও ললাটে সিন্দুর-রেখা। গলে ও হস্তে রুদ্রাক্ষ-মালা! পরিধানে কাশের বস্ত্র—লাল চেলি। সর্ব্বাঙ্গ এক পট্টবস্ত্রে আবৃত।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ "বাবু" "বাবু" বলিয়া আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন এবং আমি চক্ষু উন্মীলন করিবা মাত্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"মহাশয়! আমার কোন গোপনীয় কথা আছে। এখানে এই সমস্ত লোকের সাক্ষাতে সেকথা বলিতে পারিব না। যদি দয়া করিয়া আমার সহিত একবার বাহিরে আসেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই।"

সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেছিলাম; বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আন্তরিক বিরক্ত হইলাম। ভাবিলাম, জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে আজ বিশ্রামসুখ লিখেন নাই। প্রকাশ্যে বলিলাম, "বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি? আমি ইহাদিগকে এখান হইতে বিদায় করিয়া দিতেছি। সকলে প্রস্থান করিলে পর তোমার কি কথা তাহা বলিতে কোন আপত্তি আছে?"

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"যদি নিতান্ত না আসিতে পারেন, তবে তাহাই হউক। কিন্তু বাহিরে আসিলে ভাল হইত। বড় গোপনীয় কথা, অপরের কর্ণগোচর হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া অপর একটী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলাম। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে বলিতে কোন আপত্তি আছে কি না?"

ঘরটী সত্য সত্যই অতি নির্জ্জন; সেদিকে অপর কোন লোকের যাইবার প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণ ঐস্থানে তাঁহার মনের কথা বলিতে সম্মত হইলেন।

উভয়ে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণ পুনরায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অতি নম্রস্বরে বলিলেন,—"অসময়ে আপনার

বিশ্রামে বাধা দিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি; তজ্জন্য অধীনকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ হয় বলিয়াই আমি এসময়ে আসিতে সাহস করিয়াছি। আমার নাম রামচন্দ্র; আমি—স্থানের কালীমন্দিরের প্রধান পুরোহিত।"

আমি সেই মন্দিরের সম্বন্ধে অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম। প্রবাদ আছে, মন্দিরের কালী জাগ্রত। সেখানকার পুরোহিতের দোর্দ্দিণ্ড প্রতাপ। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, এবং তাঁহাকে সেখানকার প্রধান পুরোহিত জানিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বলিলাম, "আমি সেই মন্দিরের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও চক্ষে দেখি নাই। আপনি যদি সেখানকার প্রধান পুরোহিত, তবে সেইমত পোষাক পরিধান করেন নাই কেন? শুনিয়াছি, মায়ের পুরোহিতগণের পোষাক সন্ন্যাসীর মত।"

ব্রাহ্মণ সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন,—"আপনি একথা শুনিলেন কোথা হইতে? যাহাই হউক, আমরা যতক্ষণ মন্দিরে থাকি, তত-ক্ষণই আমাদের বেশ সন্ন্যাসীর মত থাকে। কিন্তু যখন কোন কার্য্যের জন্য বাহিরে যাইতে বাধ্য হই, তখন কাশেয়বস্ত্র ও উত্তরীয় লইয়া থাকি।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ পদ্ধতি কে প্রচলন করিল? আপনি কতকাল ঐ মন্দিরে পুরোহিতের কার্য্য করিতে-ছেন?"

ব্রা। প্রায় সাত বৎসর। কে যে এই নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

আ। এখন আপনি যে জন্য আসিয়াছেন, তাহা বলুন?

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আজ হউক, কাল হউক কিম্বা দুইদিন পরেই হউক, শীঘ্রই আমার মৃত্যু হইবে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন, আপনি এমন হতাশ হইয়াছেন কিজন্য? কি হইয়াছে, পরিষ্কার করিয়া বলুন? সকল কথা জানিতে না পারিলে আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারিব না।"

ব্রাহ্মণ একখানি পত্র বাহির করিলেন এবং উহা আমার হস্তে দিলেন। বলিলেন,—"আজ প্রাতে আমি এই পত্রখানি একখানি চাপাটীর ভিতর পাইয়াছি। আপনি একবার পড়িয়া দেখুন, তাহা হইলেই আমার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে জানিতে পারিবেন।"

পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমি পাঠ করিলাম। উহাতে লেখাছিল,—"কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেই পার্চমেণ্ট কাগজখানি লইয়া সতী পাথরের নিকট আসিতে চাও। সাবধান, যেন সঙ্গে অপর কোন লোক না থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময় যেন স্মরণ থাকে, নতুবা তুমি স্বয়ং বিপদে পড়িবে।"

কাগজখানি পাঠ করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে এই পত্র পাঠাইয়াছে বলিতে পারেন?"

ব্রা। আজ্ঞে না, পত্রের নিম্নে কোন স্বাক্ষর নাই। আর হস্তলিপিও আমার পরিচিত নহে।

আ। পত্রে যে পার্চমেণ্ট কাগজের কথা লেখা আছে সেই পার্চমেণ্টখানিই বা কি? আপনি সে সম্বন্ধে যাহা জানেন, আমায় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিন।

ব্রাহ্মণ অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে হইলে আমাকে প্রথম হইতে বলিতে হয়। যদি তাহাতে আপনার সময় নষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে যে অংশ আপনার শুনিতে বাসনা হইয়াছে, আমি সেই অংশই বলিতে পারি।"

আমি প্রথম হইতে সমস্ত কথা অন্তোপান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলাম। তাহাতে আগন্তুক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইল, একজন প্রধান জমীদার মায়ের মুর্ত্তি স্থাপনার জন্য অনেক অর্থ দিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই মন্দির নির্ম্মিত ও মহামায়ার মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। যতকাল এখানে হিন্দুদিগের প্রাধান্য ছিল, ততকাল এই মন্দিরের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। কিন্তু মুসলমানদিগের আমলে ইহার ধ্বংসের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় মুসলমান শাসন-কর্ত্তা মন্দিরের সুখ্যাতি শুনিয়া সদলবলে আক্রমণ করেন এবং নগদ ও অনেক মূল্যবান সামগ্রী লইয়া যান। কেবল অর্থ লইয়াই যে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি মায়ের অনেক সেবককে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যখন এই ঘটনা হয়, তখন আমারই বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাসুদেব সেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তিনি মন্দিরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং আপনার পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হন।"

এই সময় আমি ব্রাহ্মণকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরোহিত নির্ব্বাচনের ভার কাহার উপর ছিল?"

ব্রা। প্রধান পুরোহিতই আপনার উত্তরাধিকারী স্থির করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। এখন অপরাপর পুরোহিতদিগের মধ্যে কোন লোক প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হইবা মাত্র অনেকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া থাকেন। কারণ যদি সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কে তাঁহার পদে উন্নীত হইবেন, এই লইয়া মহা আন্দোলন হইয়া থাকে। সেই কারণেই তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতেন। প্রধান পুরোহিতের মৃত্যু হইলে, উত্তরাধিকারী স্বয়ং সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সত্বর আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ পর্য্যন্ত অন্য কোন লোক এই পদের জন্য গোলযোগ করেন নাই। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাসুদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে নিকটে আহ্বান করিয়া ঐ পার্চমেণ্ট কাগজের কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়া যান যে, মন্দিরের নিম্নে এক সুড়ঙ্গ আছে। সেই সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইবে। তাহার ভিতরে এক লৌহনির্ম্মিত সিন্দুকে একখানি পার্চমেণ্ট কাগজ আছে। এই কাগজ সহসা পাঠ করিবার আদেশ নাই। যখন হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইবে, তখন পাঠ করিতে পারিবেন। সেই দিন হইতে দুইজন করিয়া পুরোহিত এই পার্চমেণ্ট কাগজের বিষয় অবগত আছেন;—প্রধান পুরোহিত ও তাঁহার উত্তরাধিকারী। এই দুইজন ব্যতীত আর কেহই এ বিষয় অবগত নহেন। কিন্তু আবার যে দুইজন ইহার বিষয় জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাও কাগজখানি দৃষ্টিগোচর করেন নাই, কেবল উহার সত্তা অবগত আছেন মাত্র।

বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরোহিতগণের মধ্যে

কি এমন কোন লোক ছিলেন না, যিনি ঐ কাগজখানির সন্ধান লন?"

ব্রা। আজ্ঞে না। সকলেরই বিশ্বাস, উহা সেই সিন্দুকের ভিতরে আছে। ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারিতেন কিন্তু সম্ভবতঃ সে বিষয়েও নিষেধ ছিল। আমি সে কথা ঠিক বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, বসুদেবের মৃত্যুর পর হইতে সাত জন প্রধান পুরোহিত ক্রমান্বয়ে পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আমি অষ্টম। পূর্ব্বোক্ত সাতজনের মধ্যে শেষের তিনজন চাপাটীর ভিতর এইপ্রকার পত্র পাইয়াছিলেন। কেহই পত্রের কথামত কাগজখানি বাহির করিতে কিম্বা লেখকের হস্তে প্রদান করিতে সাহস করেন নাই। এমন কি, তাঁহারা পত্রের কথা গ্রাহ্যও করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন জনেই অতি অদ্ভুতরূপে মারা পড়েন।

আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পত্র পাইবার কতদিন পরে তাঁহারা মারা যান?"

ব্রা। একমাসের মধ্যেই।

আ। কি রকমে তাঁহারা মারা যান?

ব্রা। একজন পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কোথা হইতে একখানি প্রকাণ্ড পাথর তাঁহার মস্তকে পড়িল। তাঁহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি তখনই মারা পড়িলেন।

আ। আর একজন?

ব্রা। একদিন তিনি রাত্রিকালে মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটী ভয়ানক কেউটে তাঁহাকে দংশন করিল। তিনিও তখনই ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন এবং সত্বর প্রাণত্যাগ করিলেন।

আ। তৃতীয়?

ব্রা। মন্দির মেরামতের জন্য কতকগুলি প্রস্তর আনা হইয়াছিল। তৃতীয় পুরোহিতকে একদিন প্রাতঃকালে সেই প্রস্তরগুলির নিকটে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই পত্র পাইয়া আমার বড় ভয় হইয়াছে। বোধ হয়, একমাসের মধ্যে আমারও ঐরূপ কোন প্রকার অপঘাত মৃত্যু ঘটিবে। এখন আপনিই আমার ভরসা।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এরূপ অদ্ভুত রহস্য পূর্ব্বে আর কখনও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। কিছুক্ষণ ভাবিয়া আমার বোধ হইলে যে, পুরোহিতদিগের মধ্যে দুইজন ভিন্ন আর কোন লোক সেই পার্চমেণ্ট কাগজের কথা না জানিলেও পত্রলেখকগণ যে বংশপরম্পরায় ঐ কাগজের বিষয় অবগত আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের তিনজন পুরোহিতের মৃত্যুর কথা শুনিয়া স্পষ্টই বোধ হইল যে, এই ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র যদি পত্রের কথামত কার্য্য না করেন, তাহা হইলে ইঁহারও একমাসের মধ্যেই মৃত্যুর সম্ভাবনা। যদি ইনি মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোনরূপে কাগজখানি বাহির করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করতঃ উহা পত্রলেখকের হস্তে প্রদান করেন, তাহা হইলেই যে ইনি প্রাণে রক্ষা পাইবেন, তাহাও নহে। রামচন্দ্রের জীবন বাস্তবিকই সঙ্কটাপন্ন।

কিছুক্ষণ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া আমি ব্রাহ্মণকে বলিলাম, "পত্রে লেখা আছে, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে আপনাকে সেখানে যাইতে হইবে। আজ তৃতীয়া, সুতরাং এখনও চারিদিন সময় আছে। আপনি এক কার্য্য করুন। কাগজ-

খানা কাল ঠিক সন্ধ্যার সময় আমার কাছে আনিবেন. তাহাতে কি লেখা আছে জানিতে না পারিলে, আমি পত্র-লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব না। যখন ঐ কাগজের জন্য তিনটী জীবন নষ্ট হইয়াছে এবং আর একটী যাইবার সম্ভাবনা, তখন উহাতে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কথা লেখা আছে।"

আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ মলিন হইয়া গেল। এতক্ষণ তাঁহার যাহা কিছু আশা ছিল, তাহাও যেন শেষ হইল। তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে অতি কষ্টে বলিলেন,—"আমি ত কাগজখানি আর কাহাকেও দেখাইতে পারি না। গুরুদেবের নিকট শপথ করিয়াছি যে, উহার বিষয় আর কাহাকেও জানাইব না। কাগজখানি আপনাকে দেখাইলে কি জানি মার যদি ক্রোধ হয়।"

আমি বলিলাম,—"আপনি ত পূর্ব্বেই সে শপথ ভঙ্গ করিয়াছেন? কাগজের কথা ত আপনি আমাকে অগ্রেই বলিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন। বলিলেন, "সত্য! কিন্তু কাগজের উল্লেখ না করিয়া, আমি আপনার নিকট কিরূপে সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি। মহামায়া কি সেজন্য এ গরিব ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করিবেন না?"

বাধা দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম,—"নিশ্চয়ই করিবেন। তিনি আদ্যাশক্তি, কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই; সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না। তাঁহার এমন ইচ্ছা নহে যে, তাঁহার উপাসকের অপঘাত মৃত্যু হয়! সেই মৃত্যু নিবারণ করিবার কোন উপায় অন্বেষণের জন্য যদি সেই কাগজের কথা উল্লেখ করিতে হয় কিম্বা তাহার মর্ম্ম জানাইতে হয়, তবে তিনি কখনও রাগ করিবেন না।"

আমার কথায় ব্রাহ্মণের প্রত্যয় জন্মিল, তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"তবে তাহাই হউক, কাল এমন সময়ে আমি কাগজ লইয়া আসিব। দিবাভাগে সে জিনিষ আনিতে সাহস হয় না।"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমার নিকট বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন রাত্রি নয়টার পর রামচন্দ্র আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমার ঘরে আর কোন লোককে দেখিতে না পাইয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"এই দেখুন মহাশয়! সেই কাগজ আনিয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি একখানি পার্চমেণ্ট কাগজ আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি সেখানি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাগজখানি বাহির করিতে কি কোন কষ্ট হইয়াছিল?"

রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে কিছুমাত্র না। যেখানে লেখা ছিল, ঠিক সেইখানেই উহা রক্ষিত ছিল। কিন্তু পাছে অন্য কোন পুরোহিত বা মায়ের কোন সেবক জানিতে পারেন, এই ভয়ে আমাকে মধ্যরাত্রে সেই সুড়ঙ্গমধ্যে নামিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, সেই লোহার সিন্দুকটী খোলাই ছিল।"

আ। আর কোন লোক সেই সুড়ঙ্গের কথা জানে?

রা। বোধ হয় না।

আ। কেন, সুড়ঙ্গের দরজা কি আর কেহই জানে না?

রা। দরজাটী এমন স্থানে আছে যে, সেখানে সচরাচর কোন লোকের যাইবার প্রয়োজন হয় না।

আ। আজ রাত্রিকালে যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাও কি কেহ জানে না?

রা। আজ্ঞে না। আমি অতি গোপনেই এখানে আসিয়াছি।

আ। আর সেই চাপাটী মধ্যস্থ পত্রের কথা? সে কথা কি কাহাকেও বলিয়াছিলেন?

রা। আজ্ঞে না। এখনও কেহ সে সকল কথা জানে না।

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। বলিলাম, "আপনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। যিনি গোপনে এই সকল কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহার কখনও বিপদ হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কোন কষ্ট হইবে না।"

এই বলিয়া কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, উহা সংস্কৃত বা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। বাল্যকালে যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করিতাম, তখন আমি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম বটে কিন্তু সে অতি সামান্য। ঐ কাগজের লিখিত সমুদায় বিষয়ের অর্থবোধ করা দূরে থাক, আমি পড়িতেই পারিলাম না। বিদ্যালয়ে যতটুকু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম, অভ্যাস না থাকায় তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

দুই একবার কাগজখানি এদিক ওদিক করিয়া আমি কিছু লজ্জিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ইহা পড়িয়াছেন কি?"

রামচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"পড়িয়াছি, কিন্তু মর্ম্মবোধ করিতে পারি নাই।"

আ। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আপনারা মায়ের সেবক, দেবভাষা আপনাদের বিলক্ষণ জানা আছে। তবে এই সামান্য কয়েক পংক্তির অর্থবোধ করিতে পারিলেন না কেন, তাহা আমি বুঝিলাম না ?"

রা। অর্থবোধ করিয়াছি বই কি। লেখা অতি সরল—অর্থও সামান্য। কিন্তু উহার মর্ম্ম কি বুঝিতে পারিলাম না।

আমি কাগজখানি ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, "আমাকে ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিন। দেখি, আমি কিছু করিতে পারি কি না ?"

রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কাগজখানি আপনার কাছেই থাক। কয়েকবার পাঠ করিয়া ঐ কয় পংক্তি আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। উহাতে লেখা আছে—

গচ্ছোত্তরঃ প্রাচর্দিশদক্ষিণস্যাং।
দশমস্যার্দ্ধং সমাহিতঃ চিত্তঃ ॥
প্রাচীতরর্দক্ষিণস্যাং গতির্দ্বয়োদ্বিগুণস্য।
গৃহাণ দ্বাদশং নিম্নাদূর্দ্ধস্যহি ষষ্ঠং ॥
প্রোজ্জ্বলং নক্ষত্রং তথা চ দ্রষ্টব্যং।
রক্ষেতদ্ধনং সর্ব্বং প্রফুল্লং সযত্নং ॥

এই শ্লোকটী তিনি আবৃত্তি করিবার পর, আমি তাঁহাকে উহার বাঙ্গলা অর্থ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিতে বলিলাম। তিনি আমাকে ঐ শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়া বুঝাইলেন, আমি তাহা হইতে নিম্নলিখিত কবিতাটি বাঙ্গলায় প্রস্তুত করিলাম।—

উত্তর পূরব হ'তে দক্ষিণে গমন।
দশের অৰ্দ্ধেক যাবে হ'য়ে একমন॥
পশ্চিম দক্ষিণে গতি দ্বিগুণ দুয়ের।
লবে বার নিম্ন হ'তে ছয় উপরের॥
উজ্জ্বল তারকা তবে পাইবে দর্শন।
রাখহ সে ধন তুমি করিয়া যতন॥

"আমি রামচন্দ্রকে ঐ বাঙ্গলা কবিতাটী শুনাইয়া তাঁহাকে কহিলাম, "সংস্কৃত কবিতাটীর সহিত এখন মিলাইয়া দেখুন, ঠিক হইয়াছে কি না?"

রামচন্দ্রও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—অনুমান ঠিক হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। কখনও যে পারিব, এমন বোধ হয় না।"

আমি বলিলাম,—"এ বড় বিষম সমস্যা। কথাগুলির নিশ্চয়ই যে কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা কি, তাহা সহজে বোধগম্য হইতেছে না।"

রামচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। বলিলেন,—"যখন কাগজখানি এত গোপনে রক্ষিত হইয়াছিল, এবং ইহা পাছে প্রকাশ হয়, সেই জন্য এত শপথ ছিল, তখন ইহার যে কোন গূঢ় মর্ম্ম আছে, তাহা আমিও বুঝিয়াছি। কিন্তু যখন আপনিও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, তখন উপায় কি? আমাকেও কি ঐ প্রকার অপঘাতে মরিতে হইবে?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম,—"সে কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। তবে আমি যে আপনাকে রক্ষা করিবার

জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। যে কথার মর্ম্মবোধ করিবার জন্য আপনি সমস্ত রাত্রি চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি যে অতি সহজে বুঝিতে পারিব, এমন আশা করা যায় না। যাহা হউক, আপনি কি সত্য সত্যই কিছুই বুঝিতে পারেন নাই?"

রামচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"আপনার নিকট আমি কখনও মিথ্যা বলিব না। বিশেষতঃ মায়ের সেবকগণ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। বাস্তবিকই আমি উহার বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "ভাল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমাকে কিছুক্ষণ ভাবিতে দিন। যদি অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে কিছু বুঝাতে পারি ভালই, নতুবা কাগজখানি আমার কাছে রাখিয়া যাইতে হইবে। অবশ্য আমি ইহাকে অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দিব। আমি ভিন্ন এখানকার আর কোন লোক এ বিষয় জানিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম, মন্দিরটী না দেখিলে ঐ কবিতার অর্থবোধ করা অসম্ভব। সুতরাং একবার আমাকে সেখানে যাইতে হইবে। আর কার্ত্তিক মাসের ৭ই তারিখে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যদি সেই সতী পাথরের নিকট অপেক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু সতী পাথরটা কি? মন্দির হইতে কতদূরেই বা স্থাপিত?

এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সতী পাথর কোথায়?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"মন্দির হইতে প্রায় চল্লিশত গজ দূরে একখানি প্রকাণ্ড শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তর বহুকাল হইতে পড়িয়া

আছে। কথিত আছে, মহামায়া মানবী-বেশে ঐ প্রস্তরের উপর বসিয়া থাকিতেন।

আ। সেখান হইতে কি মন্দির দেখা যায়?

ব্রা। বেশ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভাবিলাম, তিনি এ পর্য্যন্ত যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে সেদিন রাত্রে একা ঐ কাগজ লইয়া সেই স্থানে যাইতে সাহস করিবেন, তাহাও বোধ হয় না।

এইরূপ নানা চিন্তার পর আমি পরদিনই সেইস্থানে যাইতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু পাছে পুলিসের বেশে যাইলে সেখানকার লোকের মনে সন্দেহ হয়, এই জন্য ছদ্মবেশে যাওয়াই স্থির করিলাম।

এই স্থির করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলাম, "পূর্ব্বে আমি কখনও আপনাদের মন্দির দেখি নাই। একবার উহা না দেখিলে ঐ কাগজে লিখিত কবিতার কোন মর্ম্ম ভেদ করিতে পারিব না। সেইজন্য মনে করিয়াছি, কালই একবার মহামায়ার চরণ দর্শন করিয়া আসিব। কিন্তু আমার এ বেশে যাওয়া চলিবে না। আমি ছদ্মবেশেই যাইব। আপনিও কোন কৌশলে আমার সহিত দেখা করিবেন। কিন্তু সাবধান, আপনি যে আমার পরিচিত, কিম্বা আমি যে আপনারই কার্য্যে সেখানে গিয়াছি, এমন ভাব দেখাইবেন না। অপর লোকে যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের পরিচিত। আর এক কথা, যে লোক ঐ পত্র লিখিয়াছে, সে বড় সাধারণ লোক নহে। যখন পুরুষানুক্রমে তাহারা ঐ প্রকার পত্র লিখিয়া পুরোহিতগণকে হত্যা করিয়া

আসিতেছে, তখন তাহারা যে ভয়ানক দুর্দ্দান্ত লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যই বলিতেছি যে, আপনাকে যথা সময়ে সেই নির্দ্দিষ্ট প্রস্তরের নিকট যাইতে হইবে। আপনি তাহাতে কি সম্মত আছেন?”

পুরোহিত আমার কথায় কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, “সর্ব্বনাশ! আমাকেই যাইতে হইবে? কাগজখানিও কি লইয়া যাইতে হইবে?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “সে কথা পরে বলিতেছি। অগ্রে বলুন; আপনি যাইতে সম্মত আছেন কি না?”

ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উত্তর করিলেন, “যদি একান্তই যাইতে হয়, তাহা হইলে কি করিব? যাইতেই হইবে। কিন্তু যদি কোন উপায় থাকে বলুন?”

আ। একটী উপায় আছে।

ব্রা। কি?

আ। আপনার পরিবর্ত্তে আর কোন লোককে পাঠাইতে পারি।

ব্রা। কাহাকে পাঠাইবেন? আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, এ সকল কথা আর কোন লোক জানিতে পারে।

আ। না, আর কোন লোক নহে—মনে করিয়াছি, আমি স্বয়ংই সে রাত্রে সেখানে উপস্থিত হইব।

ব্রাহ্মণ আন্তরিক আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, “জগদীশ্বরী মহামায়া আপনার মঙ্গল করিবেন। যদি আপনি [illegible] করেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগই নাই। [illegible] কি

আ। কাগজখানিও লইয়া যাইব।

ব্রা। যদি সে কোনরূপে উহা হস্তগত করিয়া পলায়ন করে?

আ। আসল কাগজখানি লইয়া যাইব না। উহার একখানি নকল প্রস্তুত করিয়া লইব।

ব্রা। এ অতি উত্তম পরামর্শ। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া লোকটা ভয়ে যদি সেখানে না আইসে।

আ। আমি আপনার মত ছদ্মবেশ পরিধান করিব।

ব্রা। বেশ কথা। কিন্তু আমার পোষাক পাইবেন কোথায়? আমি ত তাহা এখানে আনিতে পারিব না।

আ। কাল যে স্থানে আমার লাঠী দেখিবেন, সেইখানে আপনার সন্ন্যাসীর একটা পোষাক গোপনে সন্ধ্যার পর রাখিয়া দিবেন। মন্দিরে সদা সর্ব্বদা আপনি যে পোষাক পরিধান করেন, সেইরূপ একটী পোষাক রাখিবেন, আমি সেখান হইতে উহা গ্রহণ করিব।

আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং আমাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া আমার নিকট বিদায় লইলেন।

ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর আমি আরও কিছুক্ষণ ঐ বিষয় চিন্তা করিলাম কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঐ কালীমন্দিরের প্রায় একক্রোশ দূরে আমার একজন পরিচিত লোক বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বেই একটা প্রকাণ্ড উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানের ভিতর একটি পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য ছিল।

যদিও তখন কার্ত্তিক মাস, অল্প অল্প শীতের বাতাস বহিতেছিল, তত্রাপি আমি মাছ ধরিবার আশায় উপযুক্ত সরঞ্জাম লইয়া এবং চারিজন কনষ্টেবলকে ছদ্মবেশ পরিধান করাইয়া বেলা দশটার মধ্যেই সেই স্থানে যাত্রা করিলাম।

বেলা দ্বিপ্রহরের পর আমি বন্ধুর গৃহে উপনীত হইলাম। সেদিন রবিবার—বন্ধুবরের তখনও আহার হয় নাই। তিনি আমাকে অসময়ে দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়ার কি এই শীতকালে মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল? মাছ ধরিবার উপযুক্ত সময় বটে!"

আমি তাঁহার কথায় হাসিয়া উঠিলাম এবং তাঁহার নিকটে গিয়া চুপি চুপি বলিলাম, "ভাই, এ কেবল রথ দেখা নহে, সঙ্গে সঙ্গে কলাও বেচিতে হইবে।"

সুধাংশু বাবুও হাসিলেন। বলিলেন, "সে কথা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি।"

আ। কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলেন?

সু। কেন? অসময়ে আপনাদিগকে মাছ ধরিবার নিমিত্ত আসিতে দেখিয়াই ঐরূপ সন্দেহ করিয়াছি। সে যাহাই হউক, অগ্রে আহারাদি শেষ করুন, তাহার পর যাহা ইচ্ছা করিবেন।

আমি বলিলাম, "আহার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বলিলেন, "আপনার মত লোক বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি করিয়া বাহির হইতে পারেন না। আর যদিও আহার হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুই ঘণ্টা পথশ্রমের পর তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হয় ত আবার আপনার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। ইত্যবসরে আমি আপনার মাছ ধরিবার যোগাড় করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং আমাদের মৎস্য ধরিবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। আমরা মাছ ধরিতে বসিলাম।

পুষ্করিণীতে যথেষ্ট মৎস্য ছিল। যখনই যিনি ঐ পুকুরে মাছ ধরিতে আসিয়াছেন, তখনই তিনি সফল হইয়াছেন, একবারও নিষ্ফল হন নাই। এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে আমি একটী প্রায় আটসের ও আমার একজন লোক একটী প্রায় পাঁচসের মাছ ধরিল।

মাছ ধরা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যে কার্য্যে গিয়াছি, সন্ধ্যা না হইলে সে কার্য্য হইতে পারে না জানিয়া আমি আরও কিছুক্ষণ মাছ ধরিলাম। পরে বন্ধুবরের নিতান্ত অনুরোধে সকলে আহারাদি সমাপন করতঃ তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া নানা কথায় দিনপাত করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে দুইজন মাত্র লোক লইয়া আমি কালীমন্দিরের দিকে যাত্রা করিলাম। অবশিষ্ট দুইজনকে সেই পরিচিতের বাড়ীতেই রাখিয়া যাইলাম। বলিলাম, প্রত্যাগমন করিবার সময় তাহাদিগকে লইয়া যাইব।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা সেই মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, আমরা পদব্রজেই গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া প্রথমে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলাম না।

আমার সঙ্গে ভৃত্য দুইজনকে দেখিয়া অন্যান্য পুরোহিতগণ আমাকে ধনবান বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং যতক্ষণ আমি মন্দিরের ভিতর রহিলাম, ততক্ষণ তাঁহারা আমায় সঙ্গে লইয়া নানা স্থান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

মহামায়ার শ্রীচরণ দর্শন করিবার পর নাটমন্দিরে আসিলাম। মায়ের মন্দির হইতে প্রায় দশ গজ দূরে নাটমন্দির, অনেকগুলি স্তম্ভের উপর প্রকাণ্ড প্রস্তরের ছাদ। মন্দির অপেক্ষা নাটমন্দিরের শোভা আরও চমৎকার। থামগুলি শ্রেণীবদ্ধ। এক এক শ্রেণীতে ছয়টী করিয়া স্তম্ভ, এমন দশ শ্রেণী স্তম্ভের উপর ছাদ ছিল। নাটমন্দিরের ভিতর ও বাহির লাল রং করা। মায়ের মন্দিরের রং গেরুয়া মাটীর মত।

সর্ব্বশুদ্ধ ষাইটটী স্তম্ভ ছিল। উহাদের উপরিভাগ এরূপ সূক্ষ্ম কারু-কর্ম্মযুক্ত যে, সেরূপ কার্য্য আজ কাল দৃষ্টিগোচর হয় না। এক একটী থাম প্রস্তুত করিতে কত অর্থ যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায় না, কত লোককে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহারও ইয়ত্বা করা যায় না।

এই স্তম্ভগুলি দেখিয়া আমার সেই কবিতা মনে পড়িল। ভাবিলাম, "দশের অর্দ্ধেক আর দুইয়ের দ্বিগুণ" এ সকল কথা এই থামগুলিকেই বুঝাইতেছে। কবিতাটীর সহিত যে এই স্তম্ভ সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা আমি বুঝিতে পরিলাম।

কবিতাটীর মর্ম্মভেদ করিবার আশায় আমি দেবীমন্দির ও

নাটমন্দির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, মায়ের মুখ ঠিক দক্ষিণ দিকে ছিল। তখনই আবার সেই কবিতার অপর অংশ মনে পড়িল।

এইরূপ কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর আমরা মন্দির হইতে বাহির হইলাম এবং সেই প্রস্তরের অন্বেষণে নিযুক্ত হইলাম। ব্রাহ্মণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই মত কার্য্য করিয়া অতি সহজেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। মন্দির হইতে চারিদিকে প্রায় দুইশত গজ পরিমাণ ভূমি নানা জাতীয় ফল ও পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই উদ্যানের চারিদিকে বাঁশের বেড়া। এই বেড়া পার হইলে সরকারী পথ। সেই পথের অপর পার্শ্বে প্রকাণ্ড মাঠ। এই মাঠের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ঝোপ ছিল। পথের অপর পার্শ্ব হইতে অতি সামান্য দূর গমন করিয়া সেই প্রকাণ্ড শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তর অবলোকন করিলাম। পাথরখানি গোলাকার, এত বড়, মসৃণ ও উজ্জ্বল শ্বেতমার্ব্বল আর কখনও নয়নগোচর করি নাই।

সরকারী পথ ও এই প্রস্তরের মধ্যে দুইটী ঝোপ ছিল। এতদ্ব্যতীত মাঠে এত বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছিল যে, সেখান দিয়া যাইবার সময় কোমর পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে। একটী ঝোপের নিকট অতি সামান্য একটু স্থানে ঘাস ছিল না। সেই স্থান উপযুক্ত মনে করিয়া আমার হস্তস্থিত লাঠী সেখানে রাখিতে মনস্থ করিলাম। ভাবিলাম, বৃদ্ধ পুরোহিত যদি সেদিন ঐ স্থানে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি রাখিয়া দেন, তাহা হইলে আমি অনায়াসে পাইতে পারি, অথচ কেহই জানিতে পারিবে না। এই মনে করিয়া আমি সেই ঝোপের নিকট গমন করিলাম।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া একবার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। কারণ মন্দির হইতে বাহির হইবার সময় কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল এবং তখনও পথের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের নিকট হইতে প্রায় দশহস্ত দূরে আমার পরিচিত পুরোহিত রামচন্দ্র আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। চারি চক্ষু মিলিত হইবা মাত্র তিনি ইঙ্গিত করিয়া মস্তক অবনত করি-লেন। তাঁহার ইঙ্গিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং কেন যে আমি সেইস্থানে দাঁড়া-ইয়া আছি, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন।

সকলকে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আমি সেই-স্থানে বসিয়া পড়িলাম। তখনও সকলে আমার দিকে চাহিয়াছিল। আমি লাঠীগাছটী একবার সেইস্থানে রাখিয়া রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলাম। দেখিলাম, তিনিও আমার কার্য্য লক্ষ্য করিতে-ছেন; এবং আমাকে সেইস্থানে লাঠীগাছটী রাখিতে দেখিয়া এরূপভাবে মাথা নাড়িলেন যে, আমি ভিন্ন আর কেহ সেই মস্তক সঞ্চালন দেখিতে পাইল না।

রামচন্দ্র এরূপে মস্তক সঞ্চালন করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তিনি যে আমার সঙ্কেত বুঝিয়া লইয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে সেই স্থানেই যে তাঁহার কাপড় থাকিবে, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া আমি সেখান হইতে পথে আসিয়া সকলের সহিত মিলিত হইলাম। অনেকেই সেই সতী প্রস্তরের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিলাম।

সতী প্রস্তর নাম হইল কেন? উহার মাহাত্ম্যই বা কি, এ বিষয়ে অনেক জনশ্রুতি শুনিতে পাইলাম।

পুনরায় মন্দিরে গমন করিয়া আর একবার মায়ের চরণ-দর্শন করতঃ আমরা বন্ধুর আলয়ে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে অপর দুইজন কনষ্টেবল ও আমার শীকার দ্রব্য লইয়া শীঘ্রই থানায় ফিরিয়া আসিলাম; এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শীঘ্রই বিশ্রামলাভ করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চারিদিন সময়ের মধ্যে দুইদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। আর দুইদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। দ্বিতীয় দিনের রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমাকে একখানি নকল পার্চমেণ্ট লইয়া সতী প্রস্তরের নিকট গিয়া সম্ভবতঃ এক অপরিচিত ভয়ানক দস্যুর অপেক্ষা করিতে হইবে। যাহারা পুরুষানুক্রমে নরহত্যা করিয়া আসিতেছে, তাহারা যে কি প্রকার ভয়ানক লোক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একে কার্ত্তিক মাসের রাত্রি স্বভাবতই অন্ধকার, তাহার উপর কৃষ্ণপক্ষ। এই দ্বিগুণ অন্ধকারে সেই ভয়ানক লোকের অপেক্ষা করা কিরূপ বিপজ্জনক তাহাও সহজে জানিতে পারা যায়। সে দিন সপ্তমী, চৌদ্দ দণ্ড পরে চন্দ্রের উদয় হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে চৌদ্দ দণ্ড প্রায় মধ্যরাত্রি। সেই সময়েই সাক্ষাতের কথা আছে। একে

সপ্তমীর চন্দ্র—অর্দ্ধেক, তাহার উপর নবোদিত। আলোক অতি সামান্য হওয়াই সম্ভব। তাহার উপর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই। এই সকল বিপদ স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, রামচন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। পরের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া বড় সামান্য কথা নহে। যদিও আমি একাকী যাইব না, যদিও অনেকের চক্ষু আমার উপর থাকিবে, তথাপি সেই নরঘাতক দুর্বৃত্ত যদি হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পরাস্ত হইতে হইবে।

এই সকল চিন্তার পর ভাবিলাম, হিন্দুগণ অত্যন্ত অদৃষ্ট-বাদী। জগতের আর কোন জাতি বোধ হয়, অদৃষ্টের উপর এত নির্ভর করে না, অদৃষ্টের এত দোহাই দেয় না। তাই মনে করিলাম, যদি অদৃষ্টে তাহাই লেখা থাকে, তাহা হইলে আমি যথেষ্ট সাবধান হইলেও উহা ঘটিবে, কিছুতেই অন্যথা হইবে না। বিশেষতঃ যখন এ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তখন প্রাণের মায়া করিলে চলিবে না, চোর ডাকাত দস্যুদিগকে নিপীড়িত করাই আমাদের কার্য্য। এ কার্য্যে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু যখন জানিয়া শুনিয়া এ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তখন ভয় করিলে চলিবে কেন?

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি একবার সেই কবিতাটী দেখিবার ইচ্ছা করিলাম, ও সেই কাগজখানি পকেট হইতে বাহির করিলাম।

দুই তিনবার কবিতাটী মনে মনে পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, অন্ততঃ প্রথম পংক্তিটী নাটমন্দিরের থামগুলির উদ্দেশেই লিখিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া একখানি কাগজে থামগুলি যেমন সাজান দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সেইরূপ অঙ্কন করিলাম।

পূজারি বামুন বা পুরোহিত

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি শ্রেণীতে ছয়টী করিয়া থাম ছিল এবং ঐ প্রকার দশটী শ্রেণী ছিল। নিম্নে তাহার অনুরূপ একটী প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। প্রত্যেক অঙ্ক এক একটী স্তম্ভের নিদর্শন মাত্র

উত্তর

	১	২	৩	৪	৫	৬	
	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	
	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	
পশ্চিম	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	পূর্ব্ব
	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	
	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	
	৫৫	৫৬	৫৭	৫৯	৫৯	৬০	

দক্ষিণ

কাগজখানি সম্মুখে রাখিয়া কবিতাটী আবার পড়িতে লাগিলাম ;—

"উত্তর পূরব হইতে দক্ষিণে গমন" উত্তরপূর্ব্ব কোণ ৬ চিহ্নিত স্তম্ভ, ঐ স্থান হইতে দক্ষিণে গমন করিতে হইবে। কতদূর গমন আবশ্যক ? "দশের অর্দ্ধেক যাবে হয়ে একমন" দশের অর্দ্ধেক পাঁচ, ইহাতে আমার মনে হইল, ৬ চিহ্নিত স্তম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ স্তম্ভ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে, তাহা হইলে ৩০ চিহ্নিত স্তম্ভে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। তাহার পর "পশ্চিম

দক্ষিণে গতি দ্বিগুণ দুয়ের। দুইয়ের দ্বিগুণ চারি। ঐ স্তম্ভ হইতে চারি স্তম্ভ দক্ষিণ পশ্চিমে গমন করিলে ৪৫ চিহ্নিত স্তম্ভে আসিয়া উপনীত হওয়া যায়। "লবে বার নিম্ন হতে ছয় উপরের।" নিম্ন হইতে স্তম্ভের উপরি ছয় গ্রহণ করিলে বার হইবে, অর্থাৎ আমি এই মাত্র বুঝিলাম যে, সমতল স্থান হইতে ছয় হস্ত নিম্নে ঐ স্তম্ভের সন্নিকটে "উজ্জ্বল তারকা" অর্থাৎ উজ্জ্বল ধনের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এই ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে, আমি সেদিন আর কোন কার্য্যে মনোযোগ করিতে পারিলাম না; সমস্ত দিনই কেবল ঐ চিন্তায় অতিবাহিত করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে আমার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলাম, "সেদিন যে চারিজন কনেষ্টবলকে লইয়া আমার সহিত মাছ ধরিতে গিয়াছিলে, আজও তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা এখান হইতে রওনা হইব। সেদিন তোমরা যে প্রকার ছদ্মবেশ পরিধান করিয়াছিলে আজও সেইরূপ বেশ করিবে। প্রত্যেকেই যথোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র লইবে।"

কর্ম্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কি আপনার সঙ্গেই যাইব?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিলাম, "না, তোমরা আমার কিছু পূর্ব্বেই এখান হইতে যাত্রা করিবে। হয় ত আমি পথেই তোমাদিগকে ধরিতে পারিব। যদি দেখা হয়, তাহা হইলে তোমরা কোন সঙ্কেত করিবে। তোমাদের সঙ্কেত জানিতে পারিলে আমিও গাড়ী হইতে অবতরণ করিব এবং অবশিষ্ট পথ তোমাদের সঙ্গে পদব্রজেই যাইব।"

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় চারিজন কনষ্টেবলের সঙ্গে সেই কর্ম্মচারী কালীমন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিল। আমার হাতে কার্য্য ছিল, তাহা শেষ না করিয়া যাইতে পারিলাম না।

এক ঘণ্টার পর একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী করিয়া আমিও থানা হইতে বহির্গত হইলাম। গাড়ী দ্রুতবেগে সেই কালীবাড়ী অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে আমি আমার সঙ্গিগণকে দেখিতে পাইলাম। আমি তখনই গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। পরে কোচমানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করতঃ উহাদিগকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিলাম। বলিলাম, সতী প্রস্তরের চারিদিকে প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে তাহারা পাঁচজনে অপেক্ষা করিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সেখানকার ঘাসগুলি এত বড় যে, তাহারা অনায়াসেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারিবে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাহারা সেই প্রস্তরের নিকট আমাকে ছদ্মবেশে ও অপর কাহাকেও দেখিতে পাইলে তখনই চারিদিক হইতে আমার সাহায্যে আগমন করিবে।

আমার অনুচরগণ মনোযোগ সহকারে আমার পরামর্শ শ্রবণ করিল এবং আমার কথামত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

যখন আমরা মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। আমরা কেহই মন্দিরের ভিতর গমন করিলাম না। সৌভাগ্য বশতঃ সে সময় কেহ সেখানে না থাকায় আমার অনুচরগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিল। আমিও সেই ঝোপের নিকট খোলা জায়গায় প্রস্থান করিলাম। দেখিলাম, রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিয়াছে।

আমি তখন রামচন্দ্রের পোষাক পরিধান করিলাম এবং নিজের কাপড় প্রভৃতি সেই ঝোপের ভিতর রাখিয়া দিলাম। পরে সেই প্রস্তরের নিকট গিয়া এক স্থানে উপবেশন করিলাম।

সময় আর যায় না। এক মিনিট এক ঘণ্টা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একা সেই ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে এক নিবিড় অরণ্যের ভিতর বিশেষতঃ বিপদের আশঙ্কায় বসিয়া থাকা যে কতদূর কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল অন্ধকারের মাত্রা চৌগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। শন্ শন্ শব্দে বাতাস বহিতেছিল, অল্প অল্প শীত অনুভব করিতে লাগিলাম।

নিকটে ঘড়ী ছিল। দেখিলাম, রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে ঘড়ীর কাঁটাগুলি দেখিবার জন্য পূর্ব্বে উহাদের গাত্রে ফস্‌ফরাস্ ঘর্ষণ করিয়াছিলাম।

হঠাৎ মনে হইল, কোন লোক যদি আমার পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমাকে সহজেই পরাস্ত হইতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি যেমন পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনই কোন লোককে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম।

নিমেষ মধ্যে আমি লম্ফ দিয়া কিছুদূরে গমন করিলাম। পরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "তুমি কে?"

আগন্তুক বোধ হয় রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর চিনিত। সে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথা বলিতে শুনিয়া যেন হতবুদ্ধি হইল।

ঠিক এই সময়ে চারিদিক হইতে আমার সঙ্গীগণ প্রজ্বলিত লণ্ঠন লইয়া বেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইল; এবং উপস্থিত দুই-জনের মধ্যে আমাকে দেখিয়া কেবল সেই আগন্তুককে গ্রেপ্তার করিল।

লোকটীকে দেখিবামাত্রই আমি চিনিতে পারিলাম ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি বাপু! আজকাল কলিকাতায় রাজমিস্ত্রীর রোজ কত?"

লোকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। আমি আবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। এবার সে উত্তর দিল। বলিল, "আট আনা।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গঙ্গার ওপারের দর কত?"

সে আবার আমার মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "সাত আনা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"কেন বাপু মিথ্যা কথা বলিতেছ? ওপারের একটা মিস্ত্রির রোজ ছয় আনা। প্রতিদিন দুই আনা করিয়া লাভ, এ লোভ সহজে সম্বরণ করা যায় না। আর তা ছাড়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পুরোহিতেরও সন্ধান লইয়াছ।"

লোকটা স্তম্ভিত হইল। কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলিল না। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে? কেমন করিয়াই বা আমাকে রাজমিস্ত্রি বলিয়া জানিতে পারিলেন?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "যাহারা পুরুষাহুক্রমে ঐ প্রকার পত্র দিয়া মায়ের প্রধান সেবককে হত্যা করিয়া আসিতেছে, যাহারা এই মন্দিরের কোন্ স্থানে গুপ্তধন আছে তাহা অবগত আছে, বিশেষতঃ সেই পার্চমেণ্ট কাগজের বিষয় জ্ঞাত আছে, তাহারা সে রাজমিস্ত্রি হইবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। পরে তোমাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, আমার ধারণা মিথ্যা হয় নাই।

লোকটা উত্তর করিল,—"আপনি কে? আমিতো আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না!"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"সামান্য মানুষ! তোমরা যে কার্য্য পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছ, তাহাতে তোমাকে এখনই হত্যা করা উচিত।"

শেষ কথা শুনিয়া সে অতি কষ্টে হাত জোড় করিল ও কহিল, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি কোন দোষ করি নাই। যদি করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মারা পড়িতাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দোষ কর নাই? প্রধান পুরোহিতকে কে পত্র দিল?"

লোকটা উত্তর করিল,—"আমি দিয়াছি। কিন্তু তাহাকে এমন কোন অন্যায় কথা লিখা হয় নাই, যাহাতে আমি প্রাণে মারা পড়িতে পারি।"

আ। কেমন করিয়া তুমি ঐ পার্চমেণ্ট কাগজের কথা জানিতে পারিলে? নিশ্চয়ই তোমার পিতা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে তোমায় ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

লো। আজ্ঞে হাঁ।

আ। তোমার বাপ আবার তাহার পিতার নিকট হইতে শুনিয়াছিল। কেমন ?

লো। আজ্ঞে হাঁ। যখন এই মন্দির গঠিত হয়, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, সেই সময় মুসলমানদিগের উৎপাতে লোকে ধন-সম্পত্তি অতি গোপনে রাখিত। এই মন্দিরের দেবীর অনেক সম্পত্তি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি বহুমূল্য সামগ্রী সেই সময়ে কোথাও পোঁতা হইয়াছিল। সেইস্থান নির্দ্দেশ করিয়া পার্চমেণ্ট কাগজে একটী কবিতা লিখিত হয় এবং কাগজখানি কোন নিভৃত স্থানে রক্ষিত হয়। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কেবল সেই কাগজের কথা অবগত আছেন। কাজেই পত্রখানি তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল।

এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি ?"

সে উত্তর করিল,—"রমণ"

আ। রমণ কর্ম্মকার ?

লো। আজ্ঞে না, রমণ দাস।

আ। আর তোমার পিতার নাম ?

লো। বাসব দাস। বাবার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি আমায় ডাকিয়া ঐ কাগজের কথা বলেন। তিনি বলেন, যদি কালীর সম্পত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, যদি মায়ের বিরক্তির পাত্র হইতে সাহস করি, তাহা হইলে কালীর মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে একখানি পার্চমেণ্ট কাগজ দিবার জন্য গোপনে এক পত্র লিখিতে হইবে। কাগজখানি আদায় করিবার জন্য আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কাগজখানি যদি সহজেই আদায় হয় ভালই,

নতুবা পুরোহিতকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কাগজখানি পাইলে কোন পণ্ডিতকে ডাকাইয়া অর্থ বুঝিয়া লইবে। পরে সেই সঙ্কেত মত কার্য্য করিলে অনেক অর্থ পাইবে। আমি ঐ উদ্দেশ্যেই পত্র লিখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, যদি সহজে কাগজখানি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে এই নির্জ্জন স্থানে হত্যা করিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালন করিব। কিন্তু আমার মনের সাধ মনেই রহিল। ইচ্ছা থাকিলে কি হয়? অদৃষ্টই মূলাধার। হয় ত এই অপরাধে আমাকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি সেই কাগজের কথা কোথা হইতে জানিতে পারিলেন? আপনার আকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি মন্দিরের কোন লোক নন্। পুরোহিতগণের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মন্দিরের কোন লোক না হইলে কি সেই পার্চমেণ্ট কাগজের কথা জানিতে নাই?"

রমণ বলিল,—"আমিত সেই প্রকারই শুনিয়াছি। মন্দিরের লোকের কথা কি বলিতেছেন, বাবার মুখে শুনিয়াছি, একা প্রধান পুরোহিত ভিন্ন আর কোন লোক ঐ কাগজের কথা জানিতে পারে না। শুনিয়াছি, দুইজন ব্যতীত আর কাহারও সে কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই।"

আ। যখন তিনজন পুরোহিত ঐ প্রকার পত্র পাইবার এক মাসের মধ্যেই সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তখন বর্ত্তমান পুরোহিত যে তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, সে কথা বেশ বুঝিয়াছ। পাছে তাঁহাকেও এক মাসের মধ্যে এ জগত

ত্যাগ করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি আমার নিকট গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করেন।

র। আপনি তবে কে?

আ। এখনও কি বুঝিতে পার নাই? আমি একজন পুলিসের লোক। আর এই চারিজন আমারই কনষ্টেবল।

আমার কথা শুনিয়া রমণের মুখ মলিন হইয়া গেল। সে ভাবিল, তাহার মৃত্যুকাল সন্নিকট। কিন্তু যতদূর আমি বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে লুক্কাইত অর্থ অপহরণ করিবার চেষ্টা ভিন্ন তাহার আর কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। যে পত্র সে প্রধান পুরোহিতকে লিখিয়াছিল, তাহাতেও কোন ভয়ের কথা ছিল না। সে পত্র লিখিবার জন্য তাহার এমন কোন দোষ হয় নাই, যাহাতে তাহার উপর কোন মোকর্দ্দমা দায়ের করা যাইতে পারে।

এই ভাবিয়া তাহাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য আমার সঙ্গীগণকে আদেশ করিলাম। তাহারা তখনই তাহাকে মায়ের মন্দিরে লইয়া গেল। আমিও তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রমণকে বন্দী করিয়া যখন আমরা সেই মন্দিরের ভিতর গমন করিলাম, তখন সকলেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। আমাদের কথা-বার্ত্তায় দুই একজনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা মন্দিরে ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহাদের বিকট চীৎকারে সকলেই জাগ্রত হইল। রামচন্দ্র জাগ্রত ছিলেন, তিনিও অপর সকলের সহিত চীৎকারে যোগ দিলেন।

রামচন্দ্র নিশ্চয়ই আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে চীৎকার না করিলে অপর পুরোহিতগণ তাঁহার উপর কোন সন্দেহ করেন, এই ভয়েই তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেও অপর সকলের সহিত চীৎকার করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, তাঁহাদের চীৎকার শেষ হইলে, আমি বলিলাম, "আপনারা বৃথা চীৎকার করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন কেন? আমরা চোর বা ডাকাত নহি, বরং এক দুর্দ্দান্ত দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছি দেখুন।"

দস্যুকে গ্রেপ্তার করিবার কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা তখনই বড় বড় মশাল জ্বালিয়া ফেলিলেন। নিমেষ মধ্যে সমস্ত মন্দির আলোকিত হইল। তখন আমি সকলকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "এখানকার প্রধান পুরোহিত কে?"

রামচন্দ্র আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই লোককে আপনি চেনেন?"

রামচন্দ্র একবার রমণের দিকে চাহিলেন, তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। বলিলেন, "না মহাশয়, ইহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

আমি তখন তাঁহাকে এক নিভৃত স্থানে লইয়া যাইলাম। উভয়ে সেইস্থানে যাইলে পর আমি বলিলাম, "আপনার জন্য আজ আমায় যে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা মুখে প্রকাশ করা কেবল আত্ম-গরিমা মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, যদি আমি [illegible] সতর্ক না থাকিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ আমি মারা পড়িতাম।"

এই বলিয়া সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিলাম। রামচন্দ্র যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "আপনি ছিলেন বলিয়াই আমি এ যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম; নতুবা আমারও যে ঐ দশা ঘটিত, তাহা আমি পূর্ব্বেই আশঙ্কা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি আমার পোষাক পরিধান করেন নাই কেন? আমি ত যথাস্থানে উহা রাখিয়া আসিয়াছিলাম।"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম, "এই মন্দিরে আসবার সময় পাছে অপর কোন লোক সন্দেহ করে, এই ভয়ে আমি যে বেশে আসিয়াছিলাম, সেই বেশ পরিধান করিয়া আসিয়াছি। আপনার পোষাক যেখানে রাখিয়াছিলেন, সেইখানেই রাখিয়া আসিয়াছি। যদি আমি এ বেশ না করিতাম, তাহা হইলে এই লোক সহসা আমার নিকট আসিতে সাহস করিত না। সে যাহাই হউক, এখন ইহার সাহায্যে যদি সেই কাগজে লিখিত কবিতার কোন প্রকার মর্ম্মভেদ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আপনি অপর সমস্ত লোককে অন্যত্র যাইতে আদেশ করুন।"

আমার কথায় রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখনই আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন এবং মন্দিরের অপর লোকগুলিকে মন্দির হইতে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় দিলেন।

রামচন্দ্র পুনরায় আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমিও সেই নিভৃত স্থান হইতে বাহির হইয়া যেখানে আমার কনষ্টেবলগণ সেই বন্দীকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে যাইলাম।

ক্রমে উষার আলোক চারিদিকে প্রকটিত হইল। কৃষ্ণপক্ষ, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রের বিমল কিরণে সমস্ত পৃথিবী প্রতিভাত

ছিল। ক্রমে সেই আলোক মলিন হইতে লাগিল এবং তাহার স্থানে উষার অস্পষ্ট আলোক চারিদিকে উদ্ভাসিত হইল।

আমি দেখিলাম, আমাদিগের কার্য্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং আমরা রমণকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। যাইবার সময় প্রধান পুরোহিতকে গোপনে ডাকিয়া, ঐ পার্চমেণ্ট লিখিত কবিতার অর্থ আমি যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে কহিলাম ও আমার বিবেচনা মত স্থানটী অর্থাৎ সেই স্তম্ভটী তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম ও সময়মত ঐ স্থানটী কোন উপায়ে খনন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে বলিলাম।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও কহিলেন, তিনি ঐ স্থান খনন করিয়া একটী স্বর্ণকুম্ভের ভিতর অনেকগুলি মূল্যবান জহরত প্রাপ্ত হইয়াছেন ও সেই অর্থ যাহাতে ঐ দেবতার কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, তাঁহার কাগজ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলাম। তিনিও আমায় পুরস্কৃত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রমণের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় সে অব্যাহতি লাভ করিল।

সমাপ্ত।

মাঘ মাসের সংখ্যা
"সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত"
যন্ত্রস্থ

DETECTIVE STORIES, NO 190. দারোগার দপ্তর, ১৯০ সংখ্যা

সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত।

প্রথম অংশ।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [মাঘ।

ভূমিকা।

ঠগিবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল ডবলু, এইচ্, শ্লিম্যান্ (Colonel W. H. Sleeman General Superintendent of operations for the Suppression of Thuggee) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বরে লিখিত যে রিপোর্ট ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, ইলিয়ট (H. M. Elliot Esq. Secy. to the Government of India.) সাহেবকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েকজন ডাকাত সর্দ্দারের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকটী ডাকাতির বিবরণ আছে মাত্র।

প্রকাশক।
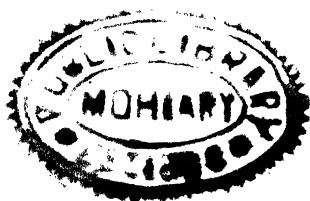
সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর সার চার্লস মেট্‌কাফ (Sir Charles Metcalfe) ডাকাইতি দমনের একটী বিভাগ সৃষ্টি করেন। বঙ্গীয় সিভিলিয়ান মিষ্টার হিউ ফ্রেজার (Mr. Hugh Fraser) সেই নব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তাঁহাকে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার বিস্তৃত উপদেশ ঐ মাসের ২২শে তারিখের সেক্রেটারী সাহেবের লিখিত পত্রে প্রদত্ত হয়।

ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত হয় যে, এই দেশে যে সকল ব্যক্তি একত্রে দলবদ্ধ হইয়া রাত্রিযোগে ভয়ানক ভয়ানক ডাকাইতি ও আবশ্যক হইলে হত্যা ও রক্তপাত করিতেছে, যাহারা ঘটনাস্থল হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করা স্বত্বেও অনায়াসে দূরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, যাহারা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে আপন কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক, সরকারি কর্ম্মচারীগণের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্ধান হইতেছে, পুলিসকর্ম্মচারী ও বিচারকগণ যাহাদিগের

হঠাৎ আক্রমণ রোধ করিতে অসমর্থ ও যাহাদিগকে বিচারাধীনে আনিতে এখনও সম্পূর্ণরূপে অপারগ, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে ও তাহাদিগকে ধৃত করিয়া বিচারাধীনে আনিয়া যাহাতে এই সকল ডাকাতি বন্ধ হয়, তাহার নিমিত্তই এই বিভাগের সৃষ্টি।

এই সময়ে প্রায় নিত্যই ডাকাইতি হইত, কিন্তু কাহারা যে ডাকাইত, কোথা হইতে তাহারা আসিয়া ডাকাইতি করিত ও অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া কোথায় গমন করিত, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন পুলিসকর্ম্মচারী জানিতে পারে নাই। তবে কেবল এই মাত্র অবগত হইতে পারা গিয়াছিল যে, উহাদিগের অধিকাংশই অযোধ্যা রাজার অধিকারভুক্ত চম্বল নদীর ধারে গোয়ালিয়ার, রাজপুতানা আমোয়ার রোহিলখণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্গত স্থান সকলে এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিতি করে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট গোরকপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আর, এম, বার্ডকে (Mr. R. M. Bird.) ভৎ'সনা করিয়া এক মন্তব্য প্রকাশ করেন ও কহেন যে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন সময়ে অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শাসনাধীনে ডাকাইতি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি নিজের স্কন্ধ হইতে সমস্ত দোষ অযোধ্যা রাজের উপর অর্পণ করেন ও লেখেন, তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশে ঐ সকল ডাকাইত বাস করে না, উহারা অযোধ্যা রাজার রাজ্যে বাস করে ও সেই স্থান হইতে এই প্রদেশে আসিয়া ডাকাইতি করিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং

ইংরাজ অধিকারভুক্ত স্থানের পুলিসকর্ম্মচারীগণ তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। ঐ দেশে ইংরাজ রাজের কর্ম্মচারীর সংখ্যা এত অল্প যে, তাহারা একত্রে দলবদ্ধ একশত, দেড় শত অস্ত্রধারী ডাকাইতের সম্মুখীন হইতে কোন প্রকারেই পারেন না। তিনি আরও লিখেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট বা স্থানীয় পুলিসের দ্বারা এই সকল ডাকাইতি কোনরূপেই দমন হইবে না। ইহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

১০ই ডিসেম্বর বার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টে আবার রিপোর্ট করেন, যে ৫ই ডিসেম্বরে এই ডাকাইত সম্বন্ধে তিনি গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন, সেই ৫ই ডিসেম্বরে ১জন করপোরেল (Corporal) ৪জন সিপাহী ও ৪জন অশ্বারোহী সৈনিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, সরকারের ১২,০০০ বার হাজার মুদ্রা, বদরূণা কলেক্টারের নিকট হইতে গোরকপুরে লইয়া যাইতেছিল। সেই দিবস সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একদল ডাকাইত বন্দুক ও বর্শা লইয়া উহাদিগকে রাস্তার মধ্যে আক্রমণ করে, ও প্রধান কর্ম্মচারীকে গুলি দ্বারা হত করিয়া ও তাহার অনুচরবর্গকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব পূর্ব্বক ঐ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। কাপ্তেন মার্টিন (Captain Martin) যিনি সেই সময় আপন সৈন্য সামন্তের সহিত সেই প্রদেশ রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র, তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত, স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে ঐ ডাকাইত দলের অনুসরণ করেন। বার্ড সাহেব যতদূর সম্ভব পুলিস সংগ্রহ করিতে পারেন তাহাদিগকে লইয়া বটুলের ভূতপূর্ব্ব রাজার সহিত ঐ ডাকাইত দলের অনু-

সরণের চেষ্টা করেন। যেখানে যেখানে পথ আছে, যেখানে যেখানে বন প্রবেশের পথ আছে, সেই সকল স্থানে সিপাহী ও পুলিস কর্ম্মচারীগণকে স্থাপিত করেন; কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, একজন ডাকাইতও ধৃত হয় নাই, বা একটী-মাত্র মুদ্রাও পাওয়া যায় নাই।

এই ডাকাইতি উপলক্ষ করিয়া বার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টকে এই ডাকাইতি নিবারণের নিমিত্ত একটী বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিবার উপদেশ প্রদান করেন, ও কিরূপ উপায়ে বা কিরূপ বন্দোবস্ত করিলে এই সকল ডাকাইতি নিবারণ হইতে পারে, তাহাও বলিয়া দেন; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেই সময় তাঁহার প্রস্তাবের পোষকতা করেন নাই, বা বিশেষ কোনরূপ বন্দোবস্তও করেন নাই।

পূর্ব্বে যে ডাকাইতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, পরে জানিতে পারা যায়, ঐ ডাকাইতি অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্গত জঙ্গলবাসী বুদকজাতীয় ডাকাইতের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সেই সময় ঐ ডাকাইত দলের দুইজন সর্দ্দারের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ ডাকাইতি সম্পন্ন হয়। ঐ দলের সর্দ্দারের নাম "গরিবা" ও "লুল্লি"। গরিবা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ধৃত হইয়া শ্লিমেন (Sleeman) সাহেবকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেই এই কথা প্রকাশিত হয়।

গরিবা বলিয়াছিল:—"প্রায় আঠার বৎসর অতীত হইল, লুটী জমাদার তাহার একজন বিশ্বাসী লোক দ্বারা আমায় এই সংবাদ পাঠাইয়া দেয় যে, আমি তাহার সহিত একটী অভিযানে যোগ প্রদান করি। এই সংবাদ পাইয়া আমি জগদেও ও টোকাকে সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত গমন করি। আমরা সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, প্রথম দিবস আহারাদি ও আমোদ-প্রমোদে

অতিবাহিত হয়। সেই দিবস যে উদ্দেশ্যে আমরা সেইস্থানে গিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নাই। পরদিবস তিনি আমাকে বলেন যে, পিপরোল হইতে গোরকপুরে গভর্ণমেণ্টের টাকা প্রতি মাসেই প্রেরিত হয়, এইরূপ অবস্থায় একটু চেষ্টা করিলেই ঐ টাকার কিয়দংশ আমরা অনায়াসেই উপভোগ করিতে সমর্থ হই। আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, চারিজন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী সৈন্য ও ১০।১২ জন অস্ত্রধারী সিপাহীর পাহারায় ঐ অর্থ প্রেরিত হয়। ঐ টাকা লইয়া যাইবার সময় যদি আমরা আক্রমণ করি, তাহা হইলে ঐ অর্থের কিয়দংশ যে আমাদিগের হস্তগত হইতে পারে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ আক্রমণে আমাদিগের দলস্থিত কোন কোন ব্যক্তিকে যে শমন-সদনে গমন করিতে হইবে ও কেহ কেহ যে ধৃত হইবে, তাহাও নিশ্চিত। কারণ অশ্বারোহী সৈন্যগণের যদি আমরা গতিরোধ করিতে না পারি, তাহা হইলে তাহারা দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিতে পারে; সুতরাং উহাদিগের গতিরোধ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ কার্য্য করিতে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, যে রাস্তা দিয়া ঐ অর্থ আনীত হয়, তাহার একস্থান দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। ঐ স্থানের ঐ রাস্তার উত্তর পার্শ্বের জঙ্গল এত ঘন যে, তাহার মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে গমন করিতে পারে না।

পরিশেষে আমরা ইহাই সাব্যস্ত করিলাম যে, ঐ স্থানেই আমরা ধনবাহীগণকে আক্রমণ করিব। আরও স্থির হইল, অশ্বারোহী সৈন্যগণের গতিরোধ করিবার জন্য সম্মুখে রাস্তার একস্থানে উভয়

পার্শ্বের বৃক্ষের সহিত দৃঢ় রজ্জু সকল এরূপ ভাবে বাঁধিতে হইবে যেন, কোন অশ্বারোহী বা শকট-চালক সহজে ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে না পারে। আরও স্থির হইল যে, যেমন উহারা জঙ্গলের রাস্তায় প্রবেশ করিবে, অমনি তাহাদিগের পশ্চাতে রাস্তার দুই পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের সহিত এরূপ ভাবে দৃঢ় রজ্জু সকল বাঁধিয়া ঐ রাস্তা বন্ধ করিতে হইবে যে, অশ্বারোহীগণ হঠাৎ ঐ পথে পশ্চাৎপদ হইতে না পারে। কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, রাস্তার যেদিক দিয়া উহারা জঙ্গলময় স্থানে প্রবেশ করিবে, সেইস্থানে রাস্তার এক পার্শ্বের বৃক্ষে রজ্জু সকলের এক প্রান্ত পূর্ব্ব হইতেই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। যেমন উহারা ঐ স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে, অমনি ঐ সকল রজ্জুর অপর প্রান্ত রাস্তার অপর পার্শ্বের বৃক্ষের সহিত শীঘ্র বাঁধিয়া ঐ রাস্তা অবরোধ পূর্ব্বক উহা-দিগকে আক্রমণ করিতে হইবে।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আমরা কেবলমাত্র ৪০ জন শিক্ষিত লোক সমভিব্যাহারে সেইস্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আমাদিগের সহিত ১০টী বন্দুক, ১০ খানি তরবারি, এবং ২৫ খানি বর্শা ছিল। দুই তিন ক্রোশ গমন করিয়া দুইজন লোককে পেপরোলে পাঠাইয়া দিলাম; তাহা-দিগের উপর এই আদেশ রহিল যে, সেইস্থান হইতে যেমন টাকা লইয়া সিপাহীগণ বাহির হইবে, অমনি তাহারা সংবাদ প্রদান করিবে। আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে ক্রমাগত চলিয়া যে রাস্তা দিয়া ঐ অর্থ লইয়া যাইবে, সেই রাস্তায় আসিয়া উপনীত হইলাম। আমরা সেইস্থানে এক দিবস অতিবাহিত করিলাম কিন্তু অর্থবাহী-গণের কোন রকম সংবাদ পাইলাম না। পরদিবস আমরা আর

একজন লোককে যেদিক হইতে অর্থবাহীগণের আসিবার সম্ভাবনা, সেই দিকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহার উপর এই আদেশ রহিল যে, যেমন সে অর্থবাহীদিগকে দেখিতে পাইবে, অমনি সে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ প্রদান করিবে। সে কিছুদূর গমন করিয়াই উহাদিগকে আসিতে দেখিল, ও ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সেই সংবাদ প্রদান করিল। সন্ধ্যার পর আমরা আমাদিগের পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঐ রাস্তা রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া, রাস্তার দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে, জঙ্গলের ভিতর বসিয়া ঐ ধনবাহীগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। ভোর পাঁচটার সময় একজন "আল্লার" নাম করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, আমাদিগের শীকার সন্নিকটবর্ত্তী। কিছুক্ষণ পরে আর একজন কহিল, "ঐ আসিতেছে।" তখন আমরা প্রস্তুত হইলাম। পাঁচজনকে সম্মুখের দিকে পাঠাইয়া দিলাম। উহাদিগের হস্তে বন্দুক ছিল, ঐ সকল বন্দুকে গুলি না পুরিয়া, "ছর্‌রা" পোরা হইল। কারণ আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, যতদূর সম্ভব মনুষ্য হত্যা না করিয়া, তাহাদিগকে জখম পূর্ব্বক আপনার কার্য্য উদ্ধার করিব। যেমন অশ্বারোহীগণ, পদাতিকগণ, এবং অন্য সকলে আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি তাহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী রাস্তা পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া গেল, ও চতুর্দ্দিক হইতে আমরা তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলাম। পদাতিকগণ অর্থ সকল সেইস্থানে ফেলিয়া রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। রাস্তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ অবলম্বন করিয়া অশ্বারোহীগণ পলাইবার ইচ্ছায় রজ্জু সকল উন্মোচনের চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

উহাদিগের নিকট বার সহস্র মুদ্রা ছিল। ঐ সমস্ত অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়া দ্রুতগতি সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আমাদিগের প্রস্তুত ফাঁদে যাহারা পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ হত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত অর্থ আমাদিগের হস্তগত না হয়, সেই পর্য্যন্ত আমরা তাহাদিগের উপর বন্দুক ছুড়িতে ত্রুটী করি নাই।"

গরিবা যাহা বলিয়াছিল, সত্য কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক পত্র লেখা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ পত্রের উত্তরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে লেখেন যে, বার হাজার পাঁচশত সরকারি টাকা বিদরনা হইতে গোরোকপুর পাঠান হয়। পাঁচজন অশ্বারোহী সৈন্য ও ২৩ নম্বরের রেজিমেণ্টের অবতি সিং নামক একজন করপোরাল ও একদল সৈন্য, ঐ টাকার রক্ষকরূপে গমন করে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে উহারা বরওইচ নামক স্থানে বিশ্রাম করতঃ রাত্রি ১২টার সময় সেই-স্থান হইতে প্রস্থান করে। তাহারা ঐ রাস্তার জঙ্গলময় স্থানে উপস্থিত হইলে, দুইজন অশ্বারোহী কিছু অগ্রে অগ্রে ও তিনজন তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে। অবতি সিং ও তাহার সৈন্যগণ ঐ অর্থবাহীগণকে বেষ্টন করিয়া যাইতে থাকে। জঙ্গলময় রাস্তার কিছুদূর গমন করিয়াই তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহারা ফাঁদে পড়িয়াছে। তখন চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদিগের উপর গুলি বৃষ্টি হয় ও ভীষণ চিৎকারের সহিত একদল ডাকাইত তাহা-দিগের উপর পতিত হয়। অবতি সিং হত, দুইজন অশ্বারোহী আহত ও একজন অশ্বারোহীর অশ্ব সেইস্থানে চিরশয্যায় শয়ন করে। ডাকাইতগণ সমস্ত অর্থ লইয়া প্রস্থান করে। থানার

কর্ম্মচারীগণ ও সৈন্যের প্রধান কর্ত্তা ঐ ডাকাইত দলের অনেক অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কোন ফলই ফলে নাই।

এই সময় ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানে এইরূপ ডাকাইতি হইত। ব্রহ্মপুত্র ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সকল সটলেজ নদী ও হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত স্থান সকল ডাকাইতদিগের অত্যাচার হইতে বহির্ভূত ছিল না। ধনী ও জমিদারগণ উহাদিগের ভয়ে একরাত্রির নিমিত্তও সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না। সরকারি অর্থের উপরই উহাদিগের লোভ অধিক ছিল, একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরকারি খাজানা যাইবার সময় উহারা প্রায়ই উহা লুট করিয়া লইত। যাহাতে ঐ সকল খাজানা লুট না হয়, তাহার নিমিত্ত সরকার হইতে বিশেষরূপে বন্দোবস্ত হয়; অধিক পরিমিত সৈন্যের পাহারায় ও অশ্বারোহী পুলিসের সাহায্যে পরিশেষে খাজনা সকল প্রেরিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহার মধ্য হইতেও অনেকবার ঐ সকল খাজানা লুণ্ঠিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে কেহই ধৃত হয় না, বা ঐ অর্থ লইয়া তাহারা যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহারও কিছুমাত্র ঠিকানা হয় না।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে লেফটেনেণ্ট কর্ণেল ডব্লিউ, এইচ, স্লিমান সাহেব যখন নর্ম্মদা বিভাগের নরসিংহপুর জেলার কর্ত্তা ছিলেন, সেই সময় একটা শোচনীয় ডাকাতি সংঘটিত হয়। এক দিবস সন্ধ্যার সময় কেবল মাত্র ৩০জন লোককে এক একগাছি ছড়ি হস্তে সৈন্যদিগের ছাউনির নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সিপাহিগণ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, উহারা কাহারা? উত্তরে তাহারা এইমাত্র বলে যে, তাহারা গরুর সওদাগর, তাহাদিগের গরু সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। এই বলিয়া তাহারা অগ্রবর্ত্তী হয়।

অতি অল্পদূর মাত্র গমন করিয়াই কয়েক জন ধনশালী মহাজনের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হয়। দেখিতে দেখিতে তাহারা কতকগুলি মশাল জ্বালিয়া ফেলে, এবং যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে বা গোলযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগকেই অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করে। দেখিতে দেখিতে মহাজনদিগের বাড়ী উহারা লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, ও দশ মিনিটের মধ্যে উহারা কার্য্য উদ্ধার করিয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে দেখিতে পাওয়া গেল যে, ১০জন স্থানীয় লোক হত ও আহত হইয়া সেইস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। যে স্থানে ডাকাইতি হইল, ঐ স্থান হইতে একদিকে বিংশতি হস্ত ব্যবধানে অনেকগুলি পুলিস ও অপর দিকে প্রায় শত হস্ত ব্যবধানে অধিক সংখ্যক সিপাহির ছাউনি ছিল। উভয় দলই ডাকাইত-দিগকে ডাকাইতি করিতে দেখিল, কিন্তু কেহই অগ্রবর্ত্তী হইল না। ডাকাইতগণ ডাকাইতি করিয়া প্রস্থান করিবার পর, তাহারা উহা-দিগের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ধৃত করিতে পারে নাই বা তাহারা যে কোন্ দিকে প্রস্থান করিল, তাহারও কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। এই ঘটনার ২০ বৎসর পর যখন কোন কোন সর্দ্দার ধৃত হয়, সেই সময় তাহাদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইতে পারা যায়, এই ডাকাইতি কাহাদিগের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রায় ৮০ জন ডাকাইত দলবদ্ধ হইয়া অযোধ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী বলরামপুর পরগণার জঙ্গল হইতে বহির্গত হয়। ঐ দলের সঙ্গে তাহাদিগের দুইজন প্রধান নায়ক ছিল, একজনের নাম নেকা। ইনি বিখ্যাত সর্দ্দার কনন্দরের পুত্র। অপর নায়কের নাম মেদিয়া। বরোচের নিকটবর্ত্তী আসিয়া তাহারা জানিতে পারে যে, ঐস্থান হইতে দুইখানি শকট বোঝাই করিয়া ছাব্বিশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা ও চারিশত স্বর্ণ মোহর সরযূ নদী পার করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে ৫০ জন সৈনিক পুরুষের পাহারায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত অর্থ সরকার বাহাদুরের।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সরযূ নদীর যে ঘাটে ঐ সকল অর্থ পার হইয়াছিল, সেই ঘাটে উহারাও পার হইয়া ঐ শকটদ্বয়ের অনুসরণ করিল, ও পরিশেষে উহারা জানিতে পারিল যে, ধন বোঝাই শকট ঐস্থান হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ পথ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে; ও রাজা সুরত সিংহের রামনগর ধুমরির বিখ্যাত গড়ে উপস্থিত হইয়া সেই গড়ের ফটকের সম্মুখে বিশ্রাম করিতেছে।

নেকা তাহার পিতার ন্যায় সাহসী ও কৌশলী দলপতি; সে ঐ গড়ের ফটকের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত ছিল, আরও জানিত যে, ঐ গড়ের ফটকের বাহিরে দুইটী কামান রক্ষিত আছে। ঐ কামানের সাহসে সৈনিক পুরুষগণ সেইস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র দলপতিদ্বয় আপন দলবল সহ

দ্রুতপদে সেই দিকে চলিতে লাগিল। যাইবার সময় পথি-মধ্যস্থ কোন লৌহকারের নিকট হইতে ঐ গড়ের দরজার মাপ অনুযায়ী একটী শিকল ও দুইটী বৃহৎ পেরেক সংগ্রহ করিয়া লইল। ক্রমে তাহারা সেইস্থানে উপনীত হইয়া কেল্লার উত্তর পশ্চিম অংশে কিছুদূরে আপনাপন পরিধেয় বসন ও অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া কেল্লার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। উহাদিগের মধ্যে ২০ জন লোক ঐ শিকল সেই কেল্লার ফটকের বাহিরে পেরেকের দ্বারা এরূপে বদ্ধ করিয়া দিল যে, ঐ কেল্লা হইতে ফটক খুলিয়া কোন সৈন্য হঠাৎ বহির্গত হইতে না পারে। এইরূপে ফটক বন্ধ করিয়া তাহারা সশস্ত্রে ঐ ফটকের পাহারায় নিযুক্ত রহিল। ফটকের বাহিরে যে দুইটী কামান রক্ষিত ছিল, তাহা ঐ ধনরক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই তোপ ভরিয়া রাখা হইয়াছিল। ২০জন সশস্ত্র দস্যু ঐ কামানদ্বয় অধিকার করিয়া বসিল। তাহাদিগের কার্য্য—কেহ আসিয়া ঐ কামান চালাইতে না পারে। অবশিষ্ট সেই ৪০ জন সেই ধন-রক্ষক ৩০ জন সৈনিক-পুরুষকে সবেগে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ঐ সমস্ত অর্থ হস্তগত পূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। ইহাতে চারিজন সৈনিক-পুরুষ হত ও আহত হয়। উহাদিগেরও দুইজন মাত্র আঘাতিত হইয়াছিল। তাহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পুনরায় সরযূ নদী পার হয়, ঐ নদীর অপর পার্শ্বে একটী স্থানে বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু রাত্রিযোগে সেই প্রদেশীয় দুইজন দোর্দ্দণ্ডশালী জমিদার ভাবনী বক্স ও ইন্দ্রজিত একত্রিত হইয়া প্রবল বাহিনীর সহিত উহাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ আক্রমণে সর্দ্দারদ্বয় তাহাদিগের দলের সহিত পরাভূত হয়, ও সমস্ত অর্থ ঐ

জমিদারদ্বয়ের হস্তগত হয়। ডাকাইতের দল নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে।

ঐ সময়ে ঐ জেলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন মেহদি আলি খাঁ। তিনিই ঐ অর্থ লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উপরি কথিত সংবাদ পাইয়া তিনি উভয় জমিদারকে ধৃত করেন, ও একদল সিপাহি ঐ ডাকাইত দলের অনুসরণ করিতে পাঠাইয়া দেন। উহারা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেক কষ্টে প্রায় ৬০ জনকে ধৃত করিতে সমর্থ হয় ও প্রধান সর্দ্দার নেকাও সেই সঙ্গে ধৃত হয়। জমিদারদ্বয়, সর্দ্দার নেকা ও তাহার ৬০ জন অনুচর ছয় বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উহারা সকলেই সীতাপুরের জেলে আবদ্ধ থাকে।

জমিদার দুইজনকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত সরকারের বিশেষ আগ্রহ জানিতে পারিয়া, সেই প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা কিছু দিবস পরে উহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করেন। উহাদিগকে বিনা স্বার্থে যে একবারে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহা নহে। যে ২৬০০০ হাজার মুদ্রা ও ৪০০ শত সুবর্ণ তাহারা ডাকাইতদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা, ও তদ্ব্যতীত আরও ১০০০০ সহস্র মুদ্রা তাহাদিগকে প্রদান করিতে হয়। দলপতি নেকাও এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই, সেও তাহার বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট হইতে দশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ পূর্ব্বক সরকারকে অর্পণ করিয়া অনুচরবর্গের সহিত আপনিও বাহির হইয়া আসেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে অপর দুইদল একত্রিত হইয়া একটী ডাকাইতি হয়। অযোধ্যাখণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বের একদল। এ দলের অধিপতি দেরা জগদীশপুরের তারা, অপর দল পূর্ব্ব-

নিকের। উহার দলপতি গোরা বলরামপুরের রতিরামের পুত্র বক্সি। এই দুই দল একত্রিত হইয়া সেই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী একজন প্রধান ধনী লক্ষ্ণৌ সহরের বিহারিলাল সাহার বাটীতেডাকাইতি করে।

ডাকাইতি করিবার সময় উভয় দলপতি একত্রিত হইয়া কিরূপ অংশে অপহৃত দ্রব্য সকল বিভাগিত হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হয়, ও যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, সেইমত কার্য্য করিবার নিমিত্ত পরস্পর প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হয়। এই ডাকাইতিতে কেহই হত, আহত বা ধৃত হয় নাই, কিন্তু ৪২০০০ সহস্র মুদ্রা অনায়াসে হস্তগত করিয়া তাহারা প্রস্থান করে। বনগর জেলার অন্তর্গত খয়রাবাদ নামক স্থানের জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, ও ঐ অর্থের অংশ লইয়া উভয় দলপতির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়।

উভয় সর্দ্দারের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার কারণ এই যে, যে সময়ে তাহাদিগের মধ্যে উপরি কথিত কর্ম্মের বন্দোবস্ত হইতেছিল, সেই সময় বক্সির ধর্ম্মভাই ভূষণ তারার ভগ্নীকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। পূর্ব্ববর্ণিত ধন সকল বণ্টনকালে তারা এই কথা জানিতে পারে, সেই সময় উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, ও সেই বিবাদের ফল পরিশেষে এই হয় যে, বক্সি তাহাকে তাহার ন্যায্য অংশ প্রদানে অসম্মত হয়।

বক্সির ধর্ম্মভাই—ভূষণের কার্য্যে তারা একে বিশেষরূপে অবমানিত হয়, তাহার উপর অঙ্গীকার স্বত্বেও আপনাদের ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত না হইয়া সে একেবারে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়। এই অবমানের প্রতিশোধ লইবার মানসে সে একেবারে লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া

আগা মিরকে এই সমস্ত কথা বলিয়া দেয়। তিনি ঐ জেলার শাসনকর্ত্তা মেহুদি আলি খাঁর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি উহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের একটী প্রবল বাহিনী প্রেরণ করেন। যখন ঐ প্রবল বাহিনী গিয়া উহাদিগের বাসস্থানে উপস্থিত হয়, তখন পর্য্যন্ত উহাদিগের মধ্যে তারার ভগ্নীকে বাহির করা ও অপহৃত অর্থের বণ্টন লইয়া গোলযোগ চলিতে ছিল। ঐ প্রবল বাহিনী হঠাৎ উপস্থিত হইয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত মোট দুইশত লোককে ধৃত করে। তাহাদিগের মধ্যে বক্সির পিতা রতিরাম, বৃদ্ধ মাতা ও পাঁচটী ভ্রাতাও ধৃত হয়। বক্সি ও তাহার ষষ্ঠ ভ্রাতা ও অপরাপর ব্যক্তি ধৃত হয় নাই। যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলকেই লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাওয়া হয়। কাপ্তেন পেটন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ রতিরাম ও তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেন। সেই সময় রতিরামের বয়ঃক্রম একশত বৎসর। এই একশত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহার স্মরণশক্তি এত প্রবল ছিল যে, ৬।৭০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার কিছু-মাত্রও তখন পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই।

এই দলের যে সকল ব্যক্তি জেলে আবদ্ধ ছিল,তাহাদিগের মধ্যে ২০জন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জেলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করে ও তিন জনকে হত ও দুই জনকে সাংঘাতিক রকমে আহত করিয়া ঐ জেল ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করে। অবশিষ্ট যাহারা জেলের ভিতর আবদ্ধ ছিল, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রতিরামের সহিত তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মেহেরবান, তাহার ভাই ছেটী ও তাহার পিতৃব্য পাসি ৫০ জন অনুচরের সহিত অযোধ্যার অন্তর্গত

সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ হইলে, দশটী ছাগ মারিয়া উহাদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করা হয়। সর্দ্দারগণ ও দলের অপরাপর ব্যক্তিগণ ঐ ছাগ-রক্তে আপন আপন হস্ত রঞ্জিত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, কেহ কোনরূপে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিবে না, ও আপনাপন ক্ষমতা অনুযায়ী তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সকলে একত্র মদ্য পান ও মাংস ভোজন করিয়া, পরদিবস পর্য্যন্ত সেই-স্থানে অবস্থিতি করে। পরিশেষে মেহেরবান আর ৪০ জনের সহিত নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে আপনাদিগের সঙ্কল্পিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, কালীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। উপাসনা শেষ হইলে তাঁহার নিকট সকলে যোড়হস্তে এইরূপ প্রার্থনা করে যে, "মা কালি! যদি আপনার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে যাহাতে আমাদিগের কার্য্য উদ্ধার হয়, তাহা করুন। যে সকল অন্ধ, খঞ্জ, বিধবা ও অনাথ বালক বালিকা, আপনার প্রদত্ত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগের মঙ্গলার্থে আমাদিগের কার্য্য সুসিদ্ধ করুন, কারণ তুমিই তাহাদিগের অন্নদাত্রী, আমরা উপলক্ষ মাত্র। এই কথা যদি আপনার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে শৃগালীর ডাক শুনিতে পাইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই কার্য্যে আপনার সম্পূর্ণ অভিমত আছে।"

এইরূপ প্রার্থনা করিবার পর সকলে জানু পাতিয়া স্থিরভাবে শৃগালীর ডাকের অপেক্ষায় নীরবে সেইস্থানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বামপার্শ্ব হইতে তিনবার শৃগালীর ডাক শুনা গেল। তখন সকলে বুঝিতে পারিল যে, মহামায়া তাহাদিগে

উপর সদয় হইয়াছেন, সুতরাং তাহারা আপন কার্য্যে গমন করিতে প্রস্তুত হইল।

মেহেরবানের সাতটী স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রীর নাম মণিয়া। সে কখন দলের সহিত এই সকল কার্য্যে গমন করিত না। তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী সুজুনিয়া। সে মেহেরবানের সহিত সকল কার্য্যেই গমন করিত। মহামায়ার আদেশে সকলেই অতিশয় পুলকিত হইয়াছিল। মেহেরবান ৫ জনকে একখানি উৎকৃষ্ট পালকি খরিদ করিয়া আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল। কারণ তাহার স্ত্রী সুজুনিয়াকে এরূপ ভাবে লইয়া যাইতে হইবে যে, সকলেই যাহাতে জানিতে পায় যে, কোন বড় লোকের স্ত্রী গমন করিতেছে। লোক ভুলাইবার ইহা তাহাদিগের একটী উপায়।

উহারা সকলে ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন তিন স্থানে অবস্থিতি করিয়া ঐ সহরের নানাস্থানে ভ্রমণ ও নানা দেবতার পূজা দিয়া সরকারি বা বড় বড় মহাজনের টাকা কোন স্থানে প্রেরিত হইবে তাহারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে থাকে। পরিশেষে তাহারা জানিতে পারে যে, একখানি গাড়ী করিয়া সরকারি খাজনা সেপাহিদিগের পাহারায় পশ্চিমে প্রেরিত হইতেছে। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ৪ জনকে গোয়েন্দা স্বরূপ উহাদিগের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট দলবল অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে।

এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত "যোশী" নামক স্থানে উপনীত হইয়া খাজনাবাহীগণ একটী সরাইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। মেহেরবানের দলবল যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিল,

তাহারা চারি মাইল ব্যবধানে একটী জঙ্গলের মধ্যে লুক্কাইত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের রাত্রে তাহাদিগের অব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল এবং পালকি সেই জঙ্গলের ভিতর রাখিয়া উহারা সেই সরাই অভিমুখে যাত্রা করে। রাত্রি ১২টার সময় তাহারা সেইস্থানে উপস্থিত হয়। সরাইয়ের দরজা খোলা ছিল। উহাদিগের মধ্যে কয়েক জন সেই দরজা রক্ষার ভার লইল, কয়েক জন পুলিস প্রহরীদিগের উপর নজর রাখিল, অবশিষ্ট সকলে ঐ ধনরক্ষকগণকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের সহিত যে ২০ সহস্র স্পেনদেশীয় ডলার ছিল, তাহা অধিকার করিল। ঐ রাত্রে কায়েম খাঁ নামক একজন সাহসী বলিষ্ঠ মহাজন সেই সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তরবারি হস্তে ঐ দলের সম্মুখীন হইলেন ও বিশেষ পারদর্শিতার সহিত অসি চালনা করিয়া উহাদিগকে একরূপ পশ্চাৎপদ করিলেন। উহারাও ঐ অপহৃত অর্থ সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু বলবান কায়েম খাঁ তরবারি আঘাতে দুইজন আহত ও সাত আটটী সড়কি কর্ত্তন করিয়া সেইস্থানে পাতিত করিলেন, কিন্তু অপর কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে সাহসী হইল না। এই সাবকাশে মেহেরবানের একজন পারিষদ লুকাইত ভাবে কায়েম খাঁর পশ্চাৎভাগে গমন করিয়া তাহাকে এমন এক আঘাত করিল যে, তাহাতেই তিনি আহত হইয়া পরলোকগমন করিলেন। অন্যান্য আরও কয়েকজন আহত হইল। আক্রমণকারীগণ ২০ তোড়া ডলার লইয়া প্রস্থান করিল। অবশিষ্ট ৫৭৮৭ ডলারের তোড়া সেইস্থানে পড়িয়া রহিল। পর দিবস

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সকল অর্থ প্রেরিত হয়, তিনি উহা বেণারসে পুনঃ প্রেরণ করেন। কায়েম খাঁর বীরত্বে সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন, ও তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। দস্যুগণ ঐ সকল অস্ত্র লইয়া ও আহত দ্বয়কে স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে। পরিশেষে উহাদিগকে পালকি করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ক্রমে উহারা অযোধ্যার জঙ্গলের মধ্যে মেহের-বানের দুর্গের ভিতর গিয়া উপনীত হয়। সেইস্থানে ঐ সকল অর্থ পূর্ব্বের নিয়মানুযায়ী বিভাগিত হয়। কেবল যে দুইজন আহত হইয়াছিল তাহারা একশত টাকা করিয়া তাহাদিগের অংশ অপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হয়।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে মেহেরবানের ভ্রাতা ছেদী আর একটী দলের অধিপতি হইয়া আর একটী কার্য্য সম্পন্ন করেন। বেণারসের গঙ্গাপ্রসাদ ও হরজীবন দাস নামক দুই-জন বণিক একখানি শকট বোঝাই করিয়া কিছু অর্থ বেণারস হইতে পশ্চিমে প্রেরণ করেন। শকট যখন মৃজাপুর জেলার অন্তর্গত গোপীগঞ্জ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময় ছেদী ঐ ধনবাহী শকট আক্রমণ করে ও নয় সহস্র মুদ্রা আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়। এই আক্রমণে ঐ ধনরক্ষাকারীদিগের মধ্যে পাঁচজন হত ও চারিজন আহত হয়। মেহেরবান সেই সময় তাহার নিজের বাড়ীতে ছিল। মেহেরবানের দলভুক্ত সকলে, তাহার ভাই ছেদীর এই কার্য্যে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হয়। কারণ ঐ কার্য্যে তাহারা কেহই অংশীদার হইতে পারে না। মেহেরবানের বন্ধু গরিবা আর একটী দলের অধিপতি হইয়া

ঐ জঙ্গলের অপর স্থানে বাস করিত, সে পরে মেহেরবান সম্বন্ধে ঐ সময়ের ঘটনা যাহা বলিয়াছিল, তাহা এইরূপ —"মেহেরবান একজন বিশেষ প্রশংসনীয় ব্যক্তি ও একজন অদ্বিতীয় সর্দ্দার কিন্তু তাহার কার্য্যের বারবার কৃতকার্য্যতা হেতু তাহাকে পরিশেষে একটু অলস হইতে হইয়াছিল। তিনি যখন আপন বাড়ীতে বসিয়া কেবল আমোদ আহ্লাদে নিরত থাকিতেন ও কেবল মাত্র ক্রীড়াদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন, সেই সময় তাহার বহুসংখ্যক স্ত্রী ও তাহার অনুচরগণ অসন্তুষ্ট হইত, কারণ সেই সময় একে তাহাদিগের অর্থের বিশেষরূপ অনাটন হইত, তাহার উপর তাহাদিগের স্বাভাবিক উৎসাহ ক্রমে অনুৎসাহে পরিণত হইত। এক দিবস মেহেরবান যখন তাহার দুইটী স্ত্রী মুনিয়া ও সুজানিয়াকে লইয়া আমোদ প্রমোদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় তাহারা তাহাকে কহে যে, তুমি এত দীর্ঘকাল আপন কার্য্য ভুলিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছ, কিন্তু তোমার ভাই তাহার অনুচরবর্গকে ও পরিবারদিগকে নানারূপ অর্থ দান করিতেছে। সুজানিয়া তাহাকে আরও বলিয়াছিল, "গত দশ মাস পর্য্যন্ত তুমি তোমার গৌরবের উপযুক্ত সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমোদে রত আছ। ইহাতে যে তুমি সুখী হইতেছ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে আমার কি সম্মান ও অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে? আর তোমার অনুচরবর্গ, যাহারা [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারা তাহাদিগের পরিজনের অন্ন বস্ত্রের চিন্তায় ক্রমে ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে ও তাহাদিগের অকুতো সাহস ও অসাধারণ বীর্য্য ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে।

তোমার অনুচরবর্গের নিকট ইহাও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কলিকাতা হইতে এক নৌকা সোনার ডলার আসিতেছে, যদি তুমি নিজে গমন করিয়া উহা আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তোমার নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, তোমার শানিত তরবারী আমাদিগকে প্রদান কর, আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখি যে, তোমার অনুচরবর্গের দুঃখ আমরা কোনরূপে দূর করিতে পারি কি না ?" তাহার স্ত্রীর এইরূপ ভর্ৎসনায় তিনি আরও মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু কোনরূপ উত্তর না করিয়া পুনরায় তিনি তাহার অনুচরবর্গকে সমবেত করিলেন ও তাহার প্রধানা স্ত্রী মুনিয়াকে গৃহে রাখিয়া মেহেরবান পুনরায় বাহির হইলেন। সুজানিয়া তাহার সঙ্গে রহিল। তিনি কোন প্রধান রাজার ন্যায় সাজ-সজ্জা ও অনুচরগণ লইয়া তীর্থ পর্যটন করিবার ভানে গমন করিতে লাগিলেন। চারি মাস পরে তাহারা প্রায় চল্লিশ সহস্র সোনার ডলার লইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।" কতকগুলি লোককে মেহেরবান প্রায়ই নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন, তাহাদিগের প্রধান কার্য্য এই ছিল যে, বর্ষাকালে তাহারা নগরের প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইত। কোনস্থান হইতে কত টাকা, কিরূপ উপায়ে কোথায় প্রেরিত হইতেছে, কিরূপ ও কি পরিমিত প্রহরী ঐ সকল ধন লইয়া গমন করিতেছে, কোন পথ অবলম্বন করিয়া উহারা গমন করিবে, এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব মেহেরবানের নিকট প্রেরণ করিত। বর্ত্তমান ঘটনার বিষয়, তাহার ঐরূপ প্রেরিত কোন ব্যক্তি কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মেহেরবানকে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে অনেক পরিমিত স্পেন-

দেশীয় ডলার বেণারসে শীঘ্র প্রেরিত হইবে। এই সংবাদ পাইয়া ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রায় দুই শত অনুচর সমভিব্যাহারে মেহেরবান তাহার বাসস্থান পরিত্যাগ করিলেন। তাহার সহিত কতকগুলি স্ত্রীলোকও ছিল। তিনি একজন হিন্দু রাজপুত্র, অনুচরগণের সহিত তীর্থযাত্রায় গমন করিতেছেন, সর্ব্ব সাধারণকে এই পরিচয় দিয়া তিনি গমন করিতে লাগিলেন। বেণারস হইতে বহির্গত হইয়া, সাসেরাম, হাজারিবাগ এবং বাঁকুড়া অতিক্রম করিয়া শ্রীরামপুরের সন্নিকটে বৈদ্যবাটীনামক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই স্থান হইতে কালী, টোরী ও অন্যান্য কয়েকজন অনুচরকে সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগের উপর এই আদেশ রহিল যে, তাহারা কলিকাতায় গিয়া ব্রজবাসী দরোয়ানদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিবে যে, কি লাগাইত নৌকাযোগে সোনার মুদ্রা প্রেরিত হইবে। ব্রজবাসীগণ প্রায়ই মথুরাবাসী, এবং কলিকাতার লোকগণ প্রায় উহাদিগকে দরোয়ানি কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ও প্রায়ই উহাদিগের পাহারায় ধনাদি অপর স্থানে প্রেরিত হয়। এই সকল ব্রজবাসী দরোয়ানদিগের মধ্যে অনেকেই দস্যুদলের অধিপতির সহিত সদ্ভাব রাখিত, এবং সময় সময় তাহাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্যও করিত। বলা বাহুল্য যে, অপহৃত অর্থের অংশ লইতেও তাহারা পরাঙ্মুখ হইত না।

মেহেরবানের প্রেরিত লোক সকল শীঘ্রই কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদ দিল যে, ধন বোঝাই নৌকা কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া গিয়াছে ও এতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া মেহেরবান সেই স্থান হইতে

গঙ্গার নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া স্বদলবলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কালনা ও মুরসিদাবাদ অতিবাহিত করিয়া ক্রমে মুঙ্গেরে গিয়া উপনীত হইলেন। সেই স্থান হইতে সোজা রাস্তা দিয়া ঐ নৌকা ধরিবার মানসে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মুকুরে নামক স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন ও নিকটবর্ত্তী একটী আম্র কাননের মধ্যে দিবাভাগে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে দ্রব্যাদি সকল ও স্ত্রীলোকদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া অনুচরবর্গের সহিত গমন করিয়া ঐ নৌকা আক্রমণ করিলেন। ঐ আক্রমণে একজন সিপাহী হত ও দশজনকে আহত করিয়া মেহেরবান ২৫০০০ পাঁচশ হাজার স্পেনীয় ডলার ও ২৬০০ দুই সহস্র ছয় শত সরকারী মুদ্রা আত্মসাৎ করেন। যাহারা ঐ সকল অর্থ বহন করিয়া লইয়া চলিল, তাহারা সেইস্থান হইতে সোজা দরিয়াবাদের রাস্তা ধরিল। মেহেরবান ও অপরাপর অনুচরবর্গ সেই আম্রকাননে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেইস্থানে ২৭শে ফেব্রুয়ারির রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দ্রব্যাদি ও স্ত্রীলোকগণকে লইয়া ২৮শে তারিখের প্রত্যূষে দ্বীপনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেইস্থানে উপনীত হইয়া দুই দিবস কাল সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া সেইস্থানেই রাজার ন্যায় হোলী পূজা সমাপন করিলেন। সেইস্থান হইতে তাহারা গয়ার নিকট-বর্ত্তী রামপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন ও সেইস্থানে দুই তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। এইস্থানে বাহকদিগকে বিদায় দিয়া, রাণী ও অপরাপর স্ত্রীলোকদিগকে বহন করিয়া সাসারামে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত অপর বাহকগণকে নিযুক্ত করিলেন। সাসারামে উপনীত হইয়া, রামপুরের বেহারাদিগকে বিদায় দিয়া সেইস্থান হইতে আজিমগড়ে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত অপর বেহারা লইলেন।

সাসারাম হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে শিউসাগর নামক স্থানে এক-জন মালিকে কিছু অধিক পরিমিত অর্থ প্রদান করিয়া তাহাকে কহিলেন, এই পুষ্করিণীর ধারে এমন বৃক্ষ নাই, যাহার ছায়ায় উপবেশন করিয়া সৈনিকগণ ক্লান্তি দূর করিতে পারে। সুতরাং ইহার চারিধারে আম্রবৃক্ষ রোপন করা আবশ্যক। ঐ অর্থ দ্বারা মালী, অযোধ্যার অন্তর্গত গৌর নামক স্থানের রাজা মেহেরবান সিংহের নামে ঐ বৃক্ষ সকল রোপন করিবে। পুনরায় তাহার আগমনকালে, মালির কার্য্য দেখিয়া যদি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাহাকে আরও অধিক অর্থ প্রদান করিবেন। আজিমগড়ে তিনি তাহার সাসারামের বেহারাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সেইস্থান হইতে আর একদল বেহারা গ্রহণ করিলেন, তাহারা উহাদিগকে আপন স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। সেইস্থানে ঐ সকল অর্থ বিভাগিত হইল। আমোদ আহ্লাদ ও নৃত্য গীত করিয়া তাহারা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ডাকাইতির সংবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছিবার পরই গবর্ণমেণ্ট হইতে মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট মেকফারলেন (Mr. Macfarlan) সাহেবের উপর এই আদেশ হইল যে, তিনি মুকুরে গমন করিয়া তাঁহার সাধ্যমত ঐ ডাকাইত দলকে ধৃত করিবার

বিশেষ চেষ্টা করেন। আদেশ পাইবার পর তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, অযোধ্যা প্রদেশীয় জনৈক রাজা প্রায় দুই শত অনুচর সমভিব্যাহারে তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনকালীন ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী আম্র বাগানে ডাকাইতির এক দিবস পূর্ব্বে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন ও পর দিবস প্রত্যূষে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। সেই দিবস প্রত্যূষে কয়েকটী বালক গোচারণ অভিলাষে গমন করিবার কালীন মুক্রে গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ দূরে বড় রাস্তার উপর এক তোড়া ডলার প্রাপ্ত হয়, ঐ তোড়ার উপর বৈগুনাথ নামক এক ব্যক্তির মোহর ছিল। এই বৈগুনাথই কলিকাতা হইতে ঐ সকল ডলার পাঠাইয়াছিলেন। বারের থানাদার ঐ রাস্তার উপর একটী ডলার ও একখানি বল্লমের অংশ প্রাপ্ত হন, তিনি উহা ম্যাকফরলেন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সকল অবস্থা জানিতে পারিয়া ম্যাকফরলেন সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঐ রাজাই ডাকাতের সর্দ্দার ও তাহার অনুচরগণই ডাকাইত। আরও স্থির করেন যে, যে পথে ঐ সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহারা ঐ পথ দিয়াই গমন করিয়াছে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি দরিয়াপুর পর্য্যন্ত গমন করেন, ও জানিতে পারেন যে, ঐ স্থানে তাহারা এক রাত্রি যাপন করিয়াছিল। তাহার পর তিনি রামপুরে গিয়া অবগত হন যে, এই স্থানে তাহার এক দল বেয়ারা ভাড়া করিয়া সাসারামে গমন করিয়াছে। রামপুর ও সাসারামের মধ্যবর্ত্তী দাউদনগর পর্য্যন্ত তিনি গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু আর অধিক অগ্রবর্ত্তী না হইয়া সেইস্থান হইতে তিনি মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মুঙ্গেরে শুভাগমন করিয়া সেইস্থানের থানাদার শ্যামলাল ঘোষকে তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারেন যে, ঐ দল সাসারামে বিশ্রাম করিয়াছিল। আর যে স্থানে মেহেরবান আম্রবৃক্ষ রোপণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন। ক্রমে তিনি আজিমগড়ে আসিয়া উপস্থিত হন ও যে সকল বেহারা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদিগের অযোধ্যা জঙ্গলের বাড়ীতে পৌঁছিয়া আসে, তাহাদিগকে প্রাপ্ত হন।

এই সমস্ত সংবাদ শ্যামলাল ঘোষ জোনপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রাক্রফ্‌ট (Mr Cracroft) সাহেবকে প্রদান করেন। তিনি ঐ সকল বেহারাদিগকে আনাইয়া তাহাদিগের এজাহার গ্রহণ করেন। ঐ সকল বেহারাদিগের মধ্যে সোদানি নামক একজন মেহেরবানের অতিশয় পুরাতন বেহারা ছিল, সে মুকরের কার্য্যের সময় ঐ দলের সঙ্গে ছিল, সুতরাং তাহার নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্তই অবগত হইতে পারিলেন। তিনি এই দল উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন, তিনি আরও লিখিলেন, সিক্রোরা নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে সৈন্যের ছাউনি আছে, তাহার অধিনায়ককে আদেশ প্রদান করা হয় যেন, তিনি স্বসৈন্যে সেইস্থানে গমন করিয়া ঐ দলের উচ্ছেদ করেন।

তিনি যেরূপ লিখিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট সেইরূপই করিলেন। মেহেরবানকে স্বদলবলে ধরিবার নিমিত্ত কাপ্তেন আকুইটিলের (Captain Anquetil) কর্ত্তৃত্বাধীনে ৪ চারি দল সৈন্য প্রেরিত হয়। মুঙ্গেরের থানাদার শ্যামলাল ঘোষ জোনপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মুনসি এবং সুদানী বেহারা তাহাদিগের পথ-প্রদর্শক হইয়া গমন

করিতে থাকেন। ঐ জঙ্গলের সীমা গণ্ডায় গিয়া তাহারা উপনীত হন। সেইস্থানে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে তাম্বু সংস্থাপিত করিয়া মেহেরবানকে আক্রমণ করিবার বন্দোবস্তে লিপ্ত হন। বিসওয়ে নদীর তুনতলি নামক পারঘাটায়, সৈন্য পার করিবার সময় পাছে মেহেরবান উৎপাত ঘটায়, এই ভয়ে একজন কাপ্তেনের অধীনে একদল সৈন্য গিয়া ঐ পারঘাটা অধিকার করিয়া বসেন। কাপ্তেন সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি হঠাৎ গিয়া মেহেরবানের দলকে আক্রমণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন সৈন্য সকল ঐ নদী পার হইতেছিল, সেই সময় উহার কিয়দংশ পার হইয়াই অগ্রগামী হইয়া পড়ে। উহাদিগের সহিত শ্যামলাল ও মুনসি ছিলেন। তাঁহারা হঠাৎ গিয়া মেহেরবানের ভ্রাতা ছেদীর এলাকাধীনে উপস্থিত হন। এই ছেদী পাঁচ শত ব্যক্তির নেতা হইয়া, মেহেরবান হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিত। সৈন্যগণ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াই তাহাদিগের উপর আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। উহারা সৈন্য আগমনের সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই পাইয়াছিল, সুতরাং তাহারাও উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা কয়েকজনমাত্র অস্ত্রের প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিল। অবশিষ্ট সকলে জঙ্গল আশ্রয় করিয়া উত্তর দিক হইতে কাপ্তেন সাহেবের প্রধান বাহিনীর উপর গুলি বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই অবস্থায় কাপ্তেন সাহেব মহা বিব্রত হইয়া দ্রুতপদে ছেদীর সীমানা অতিক্রম করিয়া মেহের-বানের দুর্গের দিকে অগ্রগামী হইলেন। মেহেরবানের এই ক্ষুদ্র দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে খাদ, ঐ খাদের মৃত্তিকা দিয়া, উহার চতুষ্পার্শ্বে মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র দুর্গটী দৈর্ঘ্যে ১২০ ফুট,

প্রস্থে ৮০ হস্ত। ইহার ভিতর মেহেরবান বন্দুকধারীগণকে লইয়া বাস করিতেন। এই দুর্গের চতুর্দ্দিক তাঁহার অধিকারভুক্ত। সৈন্যগণ যেমন আসিয়া ঐ দুর্গ আক্রমণ করিল, অমনি মেহেরবান তাহাদিগের উপর প্রথমতঃ অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করিয়া পরিশেষে ঐ দুর্গস্থিত সমস্ত ঘরে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া দুর্গের অপর দিকের প্রাচীর উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

ইহার পর ছেদীর ও মেহেরবানের দুই দল একত্রিত হইয়া নিবিড় জঙ্গলের মধ্য হইতে ইংরাজ সৈন্যের উপর চতুর্দ্দিক হইতে অকুতোভয়ে গুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

কাপ্তেন সাহেব দেখিলেন, এরূপ অবস্থায় ঐ দুর্গ অধিকক্ষণ অধিকারভুক্ত রাখিয়া কোন লাভ নাই। ইহাতে সকলকেই সেই স্থানে নিপাতিত হইতে হইবে, অথচ যে জঙ্গল হইতে গুলি আসিয়া পড়িতেছে, সেই জঙ্গলের ভিতর সৈন্যগণের প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, কাপ্তেন সাহেব দুই প্রহরের সময় ঐ দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বসৈন্যে ঐ নদী পার হইয়া একেবারে ৭ ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। নদী পার হইবার সময় বিপক্ষ গুলিতে একজন সৈন্যকে হারাইতে হইয়াছিল।

মেহেরবান ও সেই প্রদেশীয় অপরাপর সর্দ্দারগণ সকলে মিলিত হইয়া কাপ্তেন সাহেবকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। কাপ্তেন সাহেব আর কোন উপায় না দেখিয়া, স্বদলবলে সেই-স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া আপন জীবন রক্ষা করিলেন।

কাপ্তেন সাহেব প্রাণ লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টে এইরূপ ভাবে একটী রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন;—"মেহেরবানের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। কলিকাতা, বেণারস, পুণা, আগ্রা,

দিল্লী ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে তাহার অনেক লোক আছে। ঐ সকল স্থান হইতে অধিক পরিমিত অর্থ কোন স্থানে প্রেরিত হইলে সেই সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হন ও কোন দেশীয় রাজার ভাণে স্বদলবলে সেই দিকে গমন করিয়া সেই সকল অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লন। উহারা গভীর সাল বনে বাস করে সুতরাং সেই স্থানে সৈন্য লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরা যায় না। অধিকন্তু ঐ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলে অধিক সংখ্যক সৈন্য সামান্য কয়েকজন মাত্রের নিকট পরাভূত হইয়া জীবন হারায়।”

কাপ্তেন সাহেবের এই সংবাদ বেণারস ও বেহারের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয় ও তীর্থ ভ্রমণকারী রাজাদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ প্রদান করা হয়।

এবার মেহেরবান যখন স্বদলবলে বহির্গত হইবেন, সেই সময় আরও বিশেষরূপ আড়ম্বরের সহিত যাহাতে গমন করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সিপাহী সুরত সিংকে আপনার অধীনে রাখিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে ইংরাজিধরণে উত্তমরূপে ড্রিল শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

মেহেরবানের একজন অনুচর হিরা সিংহ। তাহার স্ত্রী অতিশয় সুশ্রী ছিল। সুরত সিংহের নিকট ড্রিল শিক্ষা করিবার সময় সে হিরার স্ত্রীর রূপে মোহিত হয় ও কোনরূপ উপায়ে তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। হিরা ইহা জানিতে পারিয়া তাহার স্ত্রীর অনুসন্ধান করে, কিন্তু কোনরূপে তাহার সন্ধান না পাইয়া তাহার দলপতি মেহেরবানের নিকট সুরত সিংহের নামে নালিস করে, কিন্তু মেহেরবান তাহার কথায় কর্ণপাত করেন

না। হিরা ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হয়, পরিশেষে সেই প্রদেশীয় প্রত্যেক দলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া, সুরত সিংহের বিরুদ্ধে নালিস করে, কিন্তু কেহই তাহার স্ত্রীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কোনরূপ উপায় করেন না। তখন সে প্রতিশোধ লইবার মানসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু স্পষ্ট কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্থিরভাবে মেহেরবানের অধীনে কার্য্য করিতে থাকে।

মেহেরবান হিন্দু রাজার ন্যায় তাঁহার শিক্ষিত সিপাহিগণকে সঙ্গে লইয়া, বেণারস হইতে সেরঘাটী অভিমুখে যাত্রা করেন। হিরা সিং ঐ সিপাহিগণের মধ্যে একজন। এইবার সে তাহার প্রতিহিংসা পূর্ণ করিতে যত্নবান হইল।

বিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেব (Mr. C. W. Smith) পূর্ব্বকথিত আদেশ প্রাপ্তে সতর্ক ছিলেন। জানিতে পারিলেন, একজন হিন্দুরাজা অনেকগুলি সিপাহী সমভিব্যাহারে সেরঘাটীতে গমন করিতেছেন ও গাজিপুরের অপর পারে মোহনীয়া নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। স্মিথ সাহেব বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই দস্যু সর্দ্দার।

উহাদিগকে বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক ধৃত করিতে তিনি সাহসী না হইয়া কয়েকজন লোককে প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদিগের দলের সহিত মিশাইয়া দিলেন। তাহাদিগের উপর এই আদেশ রহিল যে, তাহারা যেন কোন গতিকে ঐ দলকে সেরঘাটী হইতে তীর্থ ভ্রমণের ভাণে গয়ায় আনিবার চেষ্টা করে। তিনি আরও সেরঘাটীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন, যদি ঐ দল গয়া অভিমুখে না আইসে, তাহা হইলে যেরূপে হউক তিনি যেন উহাদিগকে ধৃত করেন। মেহেরবান বুঝিতে পারিলেন, সর-

কার বাহাদুর তাহাদিগের উপর সন্দেহ করিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি সেরঘাটীর সাত ক্রোশ দূর হইতে তাঁহার অনুচর-বর্গের ভার মনসা নামক আর একজন সর্দ্দারের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি কয়েকজন মাত্র অনুচরের সহিত সিপাহির বেশ ধরিয়া বড় রাস্তা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি যখন সেরঘাটীতে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় দুইজন সরকারি চাপ-রাসী আসিয়া তাহাদিগের সঙ্গে মিশিল ও তাঁহাকে কহিল যে, তাহারা সরকার হইতে তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করিতে নিয়ো-জিত হইয়াছে, তাহারা তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া দেখিবে যে, তাঁহারা যে যে স্থানে গমন করিবে, সেই সেই স্থানের সরকারি ডিউটী বা টেক্স তাঁহারা সরকারি নিয়ম মত প্রদান করে কিনা? মেহেরবান এই কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সর্দ্দার মুসাকেও এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। মনে আর কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া সকলেই গয়ায় উপনীত হইলেন ও একটী আম্র-বাগানে নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুলিস আসিয়া সকলকে এই বলিয়া স্মিথ সাহেবের নিকট লইয়া গেল যে, কষ্টম ডিউটীর নিয়ম অনুসারে সাহেব নিজে তাহাদিগের সকলের দ্রব্যাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। এই কথা উহারা বিশ্বাস করিল, কারণ এরূপ ঘটনা তাহাদিগের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। তাহারা অধিক আর কিছু সন্দেহ না করিয়া, স্মিথ সাহেবের নিকট গিয়া যেমন উপস্থিত হইল, অমনি তাহারা সেইস্থানে ধৃত হইল।

হিরা তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত সর্দ্দারদিগের উপর প্রতিশোধ লইবার যে সঙ্কল্প করিয়া মেহেরবানের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল,

এখন সে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া যাহা যাহা জানিত সমস্ত বলিয়া দিল। ইতিপূর্ব্বে মুকরে নামক স্থানে উহারা যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহাও সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিল। আরও বলিল, এবার কলিকাতার ব্রজবাসী দ্বারবানদিগের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, পুনরায় আর এক নৌকা ধন বেণারসে প্রেরিত হইবে। ইহার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন লোক পূর্ব্বেই কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে ও এই দলও সেই কার্য্য উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছে।

এই সংবাদ প্রাপ্তে ঐ দলের সমস্ত লোকের উপর মুকরে নামক স্থানের ডাকাইতি ও হত্যার মোকর্দ্দমা রুজু হইল। অপ-রাপর সাক্ষীগণের মধ্যে প্রধান সাক্ষী হিরা সিং, মেহেরবানের ড্রিল শিক্ষক সুরত সিং। এই মোকর্দ্দমায় মেহেরবানের ফাঁসির হুকুম হইল, অবশিষ্ট ১৬০ একশত ষাট জনের মধ্যে কেহ কেহ চির নির্ব্বাসিত হইল ও কেহ কেহ কারাগারে প্রেরিত হইল।

এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে নিজামত আদালত হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহাতে সংসৃষ্ট ইংরাজ কর্ম্মচারীর ভূয়সী প্রশংসা বাহির হয়, কিন্তু বাঙ্গালি থানাদার শ্যামলাল ঘোষের নাম গন্ধও ইহাতে নাই।

ফাল্গুন মাসের সংখ্যা
"সেকেলে পশ্চিমে ডাকাত"
(দ্বিতীয় অংশ)
যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES, No 191. দারোগার দপ্তর, ১৯১ সংখ্যা।

সেকেলে
পশ্চিমে ডাকাত।

দ্বিতীয় অংশ।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।]   সন ১৩১৫ সাল।   [ফাল্গুন।

সেকেলে
পশ্চিমে ডাকাত।

(দ্বিতীয় অংশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর মেহেরবানের স্ত্রী মুনিয়া আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া নিজেই দলপতির পদ গ্রহণ করিল।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুনিয়া একটী অভিযানে গমন করিলেন। নেপালের সহিত ইংরাজ রাজের ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয় ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কিয়ৎপরিমাণ অর্থ ইংরাজ-রাজ কর্ত্তৃক নেপাল রাজের নিকট কাটামুণ্ডে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত হয়। ঐ অর্থ আত্মসাৎ করিবার মানসে মুনিয়া তাঁহার বাসস্থান হইতে কয়েকশত মাইল পূর্ব্বে জনকপুর নামক স্থানে গমন করেন। মেহেরবানের স্ত্রী মুনিয়া, জহুরি, লাচী, গরিবা ও প্রসিদ্ধ কুলন্দরের পুত্র পালোয়ান; এই পাঁচজন দলপতি পাঁচটী দলের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হন। কুলন্দর অযোধ্যার অন্তর্গত হাইদার গড় নামক স্থানের ডাকাইতিতে হত হইয়াছিলেন।

নিয়মিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া বাছা বাছা ৮০ জন লোক

ও ৭ জন স্ত্রীলোক এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ও আপনাপন দলপতির অধীনে পৃথক পৃথক ভাবে জনকপুর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। জনকপুর হইতে চারি ক্রোশ ব্যবধানে জংপুর নামক স্থানে জহুরির দল উপনীত হইলে দেখিতে পাইল যে, ৮০ জন গুরখা সৈন্যের পাহারায় ১৫টী বলদে ধন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। উহারাও ছদ্মবেশে ঐ দলের সহিত মিলিয়া গমন করিতে লাগিল ও জানিতে পারিল যে, কালেক্টরি হইতে ৬৪ হাজার টাকা তাহারা নেপালের রাজধানীতে লইয়া যাইতেছে। জহুরি ঐ দলের সহিত নিজের কেবল দুইজন মাত্র অনুচর রাখিয়া, নিজে ও অপরাপর সকলে অন্যান্য দলপতি-গণের সহিত পরামর্শ করিবার মানসে জংপুরে প্রত্যাগমন করিল, কারণ ঐ স্থানে সকলে আসিয়া একত্রিত হইবার কথা ছিল। সেইস্থানে গিয়া সকল দলপতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে কিরূপ উপায়ে ঐ ধনভাণ্ডার হস্তগত হইতে পারিবে, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল।

জহুরি কহিল, যতগুলি অনুচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহাদিগকে লইয়াই ঐ ধনবাহীগণকে আক্রমণ করা যাউক। অপরাপর সর্দ্দারগণ কহিল, যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোক আসিয়া সমাগত না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ধনভাণ্ডার আক্রমণ করিতে গেলেই সিপাহিগণের নিকট হইতে তাহারা প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইবে, ও খুন জখম যে না হইবে তাহাও নহে। এইরূপ অবস্থায় অধিক লোক ভিন্ন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। কেহ কেহ আরও কহিল, এবার যদি আমরা ঐ অর্থ হস্তগত করিবার

সুবিধা বিবেচনা না করি, তাহা হইলে পরবর্ত্তী মাসে যে অর্থ নেপালে প্রেরিত হইবে তাহাই আক্রমণ করিব।

এ প্রস্তাবে জহুরি সম্মত হইল না। সে কহিল, যে পক্ষী আপনা হইতে উড়িয়া আসিয়া আমাদিগের হাতে পড়িয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া অনিশ্চিত পক্ষী ধরিবার উদ্দেশে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান কর্ত্তব্য নহে।

এইরূপ অনেক তর্ক বিতর্কের পর পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, যতগুলি লোক উপস্থিত হইতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়াই ঐ ধনভাণ্ডার আক্রমণ করিতে হইবে। এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে জহুরি ৩০ জন লোকের সহিত ও গরিবা ২০ জনের সহিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল ও দূরে থাকিয়া ঐ অর্থবাহীদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। যে দুইজন ঐ দলের সহিত গমন করিতেছিল, তাহারা তীর্থযাত্রী পরিচয়ে তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। ঐ দুই ব্যক্তি যখন দেখিল, ঐ অর্থবাহীগণ পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটী গিরিপথের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন একজন তাহাদিগের সহিত থাকিল আর একজন আসিয়া জহুরিকে এই সংবাদ প্রদান করিল। ঐ স্থান জংপুর হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ ব্যবধানে। এই সংবাদ পাইয়া উহারা সকলে ভুগালি নামক একটী গ্রামে সন্ধ্যার সময় উপনীত হইল। কিরূপ অবস্থায় ধনরক্ষকগণ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার মানসে জহুরি, চারিজন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে সেইস্থানে গমন করিয়া দেখিল যে, অর্থ সকল যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার চারিদিকে প্রাচীর, ঐ প্রাচীরের বাহিরে একটী খাদ। প্রায় চারি

শত ব্যবসায়ী কেহ বা পাহাড় হইতে নামিয়া, কেহ বা পাহাড়ে উঠিবার নিমিত্ত ঐ খাদের চতুর্দ্দিকে বিশ্রাম করিতেছে।

এই সকল অবস্থা উত্তমরূপে দেখিয়া জহুরি আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিল ও জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দুখানি লম্বা সিঁড়ি প্রস্তুত করতঃ উহার সহিত সকলে সেই রাত্রেই সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল, ও দেওয়ালের উপর সিঁড়ি লাগাইয়া তাহার সাহায্যে যে স্থানে ঐ অর্থ রক্ষিত হইয়াছিল, সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হই'। সেই সময় রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। আকাশ পরিষ্কার, চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত। তথাপি উহার ভিতর প্রবেশ করিয়াই উহারা মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঐ ধনরক্ষকগণকে আক্রমণ করিল। উহারা সাধ্যমত বাধা দিল সত্য, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। আক্রমণ-কারীগণ ঐ ৬৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহাদিগের মধ্যে একজনও হত বা আহত হইল না।

অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে উহারা দুই তিন মাইল পথ গমন করিল, কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে ভার অধিক বোধ হওয়ায়, একটী জঙ্গলের মধ্যে ১৭ হাজার টাকা প্রোথিত করিয়া অবশিষ্ট ৪৭ সহস্র মুদ্রা সঙ্গে লইয়া, জঙ্গলে জঙ্গলে দ্রুত-পদে আপন স্থানাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এই সংবাদ নেপালের কেণ্টনমেণ্ট জলেশ্বর নামক স্থানে পৌঁছিলে সেইস্থান হইতে আদেশ হইল যে, অপরিচিত লোক দেখিলেই যেন ধৃত করা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী মুনিয়া ও পলওয়ানের কতকগুলি অনুচর ধৃত হইল। তাহাদিগের উপর

বিশেষ উৎপীড়ন হওয়ায় তাহারা উহা সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বস্ব পরিচয় প্রদান করিল। কহিল যে, জহুরি ও গরিবার দলস্থিত লোকদিগের দ্বারা নিশ্চয়ই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকিবে, কারণ, তাহারাও ঐরূপ উদ্দেশ্যে দলবল লইয়া উহাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছে।

এই সংবাদ পাইয়া দুই দল সৈন্য যাহারা সেই সময় বালেশ্বরে উপস্থিত ছিল, তাহারা জহুরি ও গরিবার দলের অনুসন্ধানে পশ্চিমদিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রেরিত হইল। কারণ উহারা ঐদিক দিয়া প্রস্থান করিয়াছে, এই কথা ধৃত ব্যক্তিগণ প্রহারের যন্ত্রণায় প্রকাশ করিয়াছিল।

ঐ দুই দল সৈন্য ঐরূপে গমন করিতে করিতে, একস্থানে ৩১ জনকে দেখিতে পাইল ও উহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া উহাদিগের ২৯ জনকে ধৃত করিল। অবশিষ্ট ২ জন ঐ আক্রমণে সেই স্থানে হত হইল। উহাদিগের নিকট হইতে ৩৫ হাজার টাকা পাওয়া গেল। সৈন্যগণ সেই জঙ্গলের ভিতর রাস্তা হারাইয়া ফেলে, সুতরাং অপর ব্যক্তিগণের আর অনুসরণ করিতে পারিল না।

যাহারা ধৃত হইল তাহাদিগের উপরও পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার চলিতে লাগিল, তাহারা সে অসহ্য যন্ত্রণা কোনরূপে সহ্য করিতে না পারিয়া, যে জঙ্গলে ১৭ হাজার টাকা পোঁতা ছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। সিপাহিগণ ঐ ২৯ জনকে ৫২ হাজার টাকার সহিত কেণ্টনমেণ্টে উপস্থিত করিল। এদিকে জহুরি ও গরিবা তাহাদিগের অবশিষ্ট দল ও ১২ হাজার মুদ্রার সহিত আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিম্নলিখিত ডাকাইতিতে সংমিলিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল।

কুলন্দর সরদার—

১। লোধী সর্দ্দারের দলে মিলিত হইয়া রামনগর নামক স্থানে সরকারি ৩২০০০৲ টাকা লুটিয়া লইয়াছিল।

২। মুটিয়াবাদে এক মহাজনের বাড়ী লুটিয়া ৩০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়।

৩। অযোধ্যার অন্তর্গত বিসোয়া নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ীতে লুট করিবার সময় দুইজন অনুচর হত হয় ও কিছু লইতে না পারিয়া প্রত্যাগমন করে।

৪। অযোধ্যার অন্তর্গত জারুল নামক স্থানে নায়েক সর্দ্দারের অধীনে একজন মহাজনের বাড়ী লুঠ করে।

৫। ঐ নায়েক সর্দ্দারের অধীনে বরোচ নামক স্থানে একজন কুঠারির বাড়ী লুটিয়াছিল, নগদ টাকা কিছুই পায় নাই, কেবল ১০ বাণ্ডিল কাপড় লইয়া প্রস্থান করে।

৬। অযোধ্যার অন্তর্গত হায়দারগড় নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করে, ইহাতে তাহার পিতা প্রসিদ্ধ কুলন্দর সর্দ্দার হত হয়।

মাদারি—

১। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে কানপুরে জনৈক মহাজনের বাড়ী লুটিয়া ২৪০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়।

২। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে মৌ জেলার অন্তর্গত গোলাম হোসেন নামক একজন মহাজনের বাড়ী লুঠন করিয়া এক শত টাকা প্রাপ্ত হয়। অপর চারি ব্যক্তি ও মাদারী ধৃত হইয়াছিল,

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কারাগার হইতে মাদারী পলায়ন করে।

৩। কুলন্দর সর্দ্দারের অধীনে গোয়ালিয়র নগরীতে সরকারি দুই লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা হস্তগত করে।

৪। কুলন্দর সর্দ্দারের অধীনে মারহাট্টা দেশে হাঁসিসহর নামক স্থানে এক মহাজনের বাড়ী লুঠ করিয়া ৫০০০৲ প্রাপ্ত হয়।

৫। নায়েক সর্দ্দারের অধীনের আমাচাবাদ সহরে একজন তেলীর বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া ৬০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়।

৬। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে আতরৌলি সহরে বুলন্দ সিংহের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া ১০০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়।

৭। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে বংগওয়া নামক গ্রামে ধনিয়া সিং রাজপুতের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া ২৪০০০৲ টাকা হস্তগত হয়।

জংলি—

১। মনসুর সর্দ্দারের অধীনে ফতেপুরের অন্তর্গত গোয়ানগড় নামক স্থানে একজন ভাটের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া কেবল দুই বাণ্ডিল কাপড় ও নগদ তিন শত টাকা পাওয়া যায়।

২। ছেদী সর্দ্দারের অধীনে আমাচাবাদ সহরে সরকারি খাজনা ১০০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লয়।

৩। ছেদী সর্দ্দারের অধীনে ত্রিহুত জেলার মধ্যে একটী বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া ১০০০০৲ টাকার পয়সা ও ২০০৲ টাকার সিকি পাওয়া যায়।

৪। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে ডুমুরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে ডাকাইতি করিয়া কেবল চারি বাণ্ডিল কাপড় পাওয়া যায়।

৫। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে পাটন নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ীতে কেবল দুইখানি বড় বাসন পাওয়া যায়।

৬। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে লংগড়া নামক গ্রামে একজন তুলা-ব্যবসায়ীর বাড়ী লুঠিয়া ৬০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

৭। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে নিবুয়া নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ী লুঠিয়া কেবলমাত্র তিন বাণ্ডিল কাপড় পাওয়া যায়।

বুধুয়া—

১। মোনসা সর্দ্দারের অধীনে বদলপুর নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ী লুঠিয়া ৩২০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

২। সাবিত সর্দ্দারের অধীনে তৌসা নামক স্থানে এক মহাজনের বাড়ীতে ডাকাইতি করা হয় সত্য, কিন্তু কিছুই হস্তগত হয় নাই, বাধা পাইয়া দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে হয়।

৩। লোধী সর্দ্দারের অধীনে গোরামা নামক স্থানে, সরকারি অর্থ আক্রমণ করে, কিন্তু কিছুই লইতে সমর্থ হয় নাই। লোধী ধৃত হয়, অপর সকলে প্রস্থান করে।

৪। নায়েক সর্দ্দারের অধীনে গরৌরি নামক স্থানে সরকারি অর্থের মধ্যে কেবল ১০০০৲ টাকা হস্তগত হয়।

৫। বানেলী সর্দ্দারের অধীনে বেটুরে এক মহাজনের বাড়ীতে কেবল পাঁচখানি কাপড় পাওয়া যায়।

৬। ইসরাইল সর্দ্দারের অধীনে পিণ্ডারিন নামক স্থানে এক ডাকাইতিতে কেবল ৮০০৲ টাকা নগদ ও ৬০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার পাওয়া যায়।

তুলা—

১। ছেদী সর্দ্দারের অধীনে রসুলি নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া কেবলমাত্র ৫০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়। এই ডাকাইতিতে ৬ জন ডাকাইত হত হইয়াছিল।

২। সিউয়া সর্দ্দারের পুত্রের অধীনে বঙ্কা সহর নামক স্থানে একজন ব্যবসায়ীর গৃহে ডাকাইতি করিয়া কেবলমাত্র ৪০০৲ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়।

৩। লুটি সর্দ্দারের অধীনে লালগঞ্জ নামক স্থানে এক মহাজনের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া ৮০০৲ প্রাপ্ত হয়। ঐ ডাকাইতিতে মহাজনের চারিজন লোক ও একজন ডাকাইত হত হয়।

৪। মেহেরবান সর্দ্দারের অধীনে ঝাঁসি সহরে জনৈক মহাজনের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া দুই সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হয়।

৫। লুটি সর্দ্দারের অধীনে ভোকাপুর নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া কেবলমাত্র এক শত মুদ্রা নগদ ও কিছু কাপড় প্রাপ্ত হয়। ইহাতে মহাজনের দুইজন লোক হত হইয়াছিল।

রাম সিং—

১। নিউয়াগি সর্দ্দারের অধীনে জয়পুর নামক স্থানে একটী ডাকাইতিতে সহস্র মুদ্রা পাওয়া যায়, কিন্তু যে মহাজনের বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছিল, তাঁহার ৩ জন লোক হত হয়।

২। নোয়াজি সর্দ্দারের অধীনে হাতাবাস সহরে এক মহাজনের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া কেবলমাত্র ৫০০৲ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু মহাজনের তিনজন লোক ও দুইজন ডাকাইত ঐ ডাকাইতিতে হত হইয়াছিল।

৩। লাহর নামক স্থানে নোয়াজি সর্দ্দারের অধীনে একটী মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করা হয়, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নাই।

৪। লছমন সর্দ্দারের অধীনে কানপুরে একজন মহাজনের বাড়ী লুঠ করিয়া কেবলমাত্র দুই শত টাকা পাওয়া যায়।

ছিরুয়া—

১। এটোয়া নামক স্থানে মেহেরবান সর্দ্দারের অধীনে এক-জন মহাজনের বাড়ী লুঠিয়া ৫০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

২। রুন্দন সর্দ্দারের অধীনে লালগঞ্জ নামক স্থানে একজন ব্যবসায়ীর বাড়ীতে কেবলমাত্র পাঁচ শত টাকা পাওয়া যায়।

ভবানী দীন—

১। লুটি সর্দ্দারের অধীনে লালগঞ্জ নামক স্থানে একটী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া কেবলমাত্র চারি শত মুদ্রা পাওয়া যায়। উহাতে দলের ৪ জন হত হইয়াছিল।

২। ঐ সর্দ্দারের অধীনে অযোধ্যার একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিনজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া কেবলমাত্র দুই শত মুদ্রা হস্ত-গত হয়।

৩। ঐ সর্দ্দারের অধীনে গোরক্ষপুর নামক স্থানে দুইজন সিপাহীকে হত্যা করিয়া ইংরাজ রাজের ১২০০০৲ মুদ্রা হস্তগত হয়

তারণ ইতিপূর্ব্বে কেবল দুইটী ডাকাইতি করিয়াছিল। একটী লুটী সর্দ্দারের অধীনে বেণারসের পশ্চিম ফুলপুর নামক স্থানে কোন মহাজনের চারিজন লোককে হত্যা করিয়া ৬০০০৲ সহস্র টাকা হস্তগত করে। আর একটী ঐ সর্দ্দারের অধীনে অযোধ্যায় একজন হালয়াইকের বাড়ী আক্রমণ করে, কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই, লাভের মধ্যে পাঁচজন ডাকাইত হত হয়।

নন্দরাম কেবল একটী ডাকাইতি করিয়াছিল। ঐ লুটি সর্দ্দারের অধীনে মহারাজগঞ্জ নামক স্থানে একজন ব্যবসায়ীর বাড়ীতে কেবলমাত্র ২০০ শত টাকা মূল্যের অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়।

ডুগাও ইতিপূর্ব্বে কেবল একটী ডাকাইতিতে গমন করিয়াছিল। ঐ ডাকাইতিতে সর্দ্দার ছিল লুটি ও জোয়াহর, তাহারা পাঁচজন সিপাহীকে হত্যা করিয়া ইংরাজ রাজের ১২০০০৲ সহস্র মুদ্রা হস্তগত করে।

বালগবিন—ইতিপূর্ব্বে ছেদী সর্দ্দারের অধীনে আজিমগড় নামক স্থানে কোন মহাজনের তিনজন লোককে হত্যা করিয়া ৭০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়।

জগদেওয়ান—চাঁন্দা সর্দ্দারের অধীনে গোনগড় নামক স্থানে এক মহাজনের বাড়ী হইতে কেবলমাত্র ৩০০৲ তিন শত টাকা আত্মসাৎ করে।

সাবিত—মেহেরবান সর্দ্দারের অধীনে আলমচাঁদ নামক স্থানে একজন মহাজনের বাড়ী লুঠ করিয়া ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র মুদ্রা একবারে হস্তগত করিয়াছিল।

ভোলা—তুইটী ডাকাইতি করিয়াছিল। একটী কুলন্দর সর্দ্দারের অধীনে নবাবগঞ্জ নামক স্থানে এক মহাজনের বাড়ীতে। উহাতে ১০০০৲ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। অপরটী জোয়াহর সর্দ্দারের অধীনে আলিগঞ্জ নামক স্থানের কোন মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করে, কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই।

এই সমস্ত লোক ধৃত হইবার পর যখন অবশিষ্ট সকলে জানিতে পারিল যে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের বাসস্থান পরিত্যাগ

করিয়া, অযোধ্যার পূর্ব্ব সীমানায় সাজাহানপুর জেলার অন্তর্গত কোটায়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই এলাকার মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিল। মেহেরবান সিংহের দলের লোক যাহারা গয়ায় ধরা পড়িয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগের অনেককেই কোটারের রাজা জামিন হইয়া খালাস করিয়া লন।

সেই সময় সরকারি টাকাই অধিকাংশ লুঠ হইত। সুযোগ পাইলেই সরকারি ধনরক্ষকগণকে আক্রমণ করিয়া ধন সকল লুঠ করিতে কিছুমাত্র ক্রুটী করিত না। এই সময় যে সকল সরকারি অর্থ অপহৃত হইয়াছিল, তাহার যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জোনপুর জেলার অন্তর্গত বাদশাপুর নামক স্থানে ৩২০০০৲ হাজার সরকারি টাকা অপহৃত হয়।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে গোরকপুর জেলার অন্তর্গত ভদরিক নামক স্থানে সরকারি অর্থ আক্রমিত হয়। ঐ আক্রমণে একজন হত ও দশজন সিপাহী আহত হয়, কিন্তু কি পরিমিত অর্থ যে অপহৃত হয়, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই।

ঐ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জোনপুর জেলার অন্তর্গত বাদসাপুর নামক স্থানে পাঁচজন ধনরক্ষককে হত্যা করিয়া ২২০০০৲ হাজার টাকা লইয়া যায়।

ঐ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সরকারি টাকা আক্রমণ করিয়া কয়েক জনকে হত ও আহত পূর্ব্বক ১০০০৲ সহস্র মুদ্রা অপহরণ করে।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জোনপুর জেলার অন্তর্গত মছলি সহরে সিপাহী-দিগকে পরাস্ত করিয়া ৫০০০৲ সহস্র টাকা লইয়া যায়।

ঐ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গোরকপুর জেলার অন্তর্গত নাগর নামক স্থানে কালেক্টরি হইতে প্রেরিত অর্থ আক্রমণ পূর্ব্বক পাঁচজন ধনরক্ষককে হত্যা করিয়া ১৩০০০, তের সহস্র টাকা অপহরণ করে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে ফতেপুর নামক স্থানে সরকারি খাজনা আক্রমণ করিয়া, একজনকে হত, ৮ জনকে আহত পূর্ব্বক ৩২৩১, টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ফরক্কাবাদের অন্তর্গত পাতিয়ালি নামক স্থানে সব-কালেক্টারের প্রেরিত অর্থ আক্রমণ করে, ঐ আক্রমণে একজন হত ও ৭ জন আহত হয় ও ১১০০০, এগার সহস্র টাকা লইয়া যায়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে এলাহাবাদের অন্তর্গত ফুলহর নামক স্থানে, দুইজনকে হত ও ১৫ জনকে আহত করিয়া সরকারি অর্থ লইবার চেষ্টা হয়, কিন্তু কেবলমাত্র ১৪টী টাকা ভিন্ন আর কিছুই লইতে সমর্থ হয় নাই।

বোধ হয়, ইহার বিশ গুণ ডাকাইতি ঐ সময়ে ধনবান ও মহাজনের বাটীতে হইয়াছিল, ও সেই পরিমিত লোকহত্যা ও অর্থ অপহৃত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই সকল ডাকাইতের দল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা রাজার সহায়তায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দলে দলে সৈন্য-সামন্ত প্রেরিত হইয়া ইহাদিগের বাসস্থান আক্রমণ ও উহাদিগের অনেককে ধৃত করিলেও ঐ সকল দল একেবারে উচ্ছেদিত হয় নাই।

ঐ সকল দলের দ্বারা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে যতগুলি ডাকাইতি হইয়াছিল, ও যত টাকা মুল্যের অর্থ অপহৃত হইয়াছিল, তাহার একটী তালিকা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিলেই পাঠকগণ সেই সময়ের অবস্থা কতক পরিমাণে অবগত হইতে পারিবেন।

সমস্ত ঘটনা যে এই তালিকাভুক্ত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। দলপতিগণের মুখ হইতে যে সকল কথা জানিতে পারা গিয়াছিল, ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া যে সকল ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলিই এই তালিকায় সন্নিবিষ্ট হইল।

পাঠকগণ বলিতে পারেন, তত অর্থ হস্তগত করিয়া উহারা ঐ সকল অর্থ কি করিল ? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হইবে না, কারণ সকলই অবগত আছেন যে, অর্থ যেরূপে উপার্জ্জিত হয়, তাহার ব্যয়ও সেইরূপ কার্য্যেই হইয়া থাকে।

ডাকাইতির তালিকা

বৎসর।	ডাকাতির সংখ্যা।	হত।	আহত।	অপহৃত অর্থ।	ধৃত।	দণ্ডপ্রাপ্ত।
১৮১৯	৫	১৪	৮১	৬০০৭০	১	১
১৮২০	৯	১০	৪৩	১৬৪০৬২	১৯৭	১৩৪
১৮২১	৬	৪	৮	১৬৬৬০	৩	৩
১৮২২	১৭	১৩	৪৭	৬০৩১৬	৩	৩
১৮২৩	১২	১১	৪৮	১১১৮৬৭।০	১	১
১৮২৪	৬	৩	৩৮	২৬৮৫৪	০	০
১৮২৫	১১	১৩	২১	৭২৪০৪	৬	৬
১৮২৬	১৩	২০	৭৭	৯১৭৮২	৪৬	২০
১৮২৭	১১	১৬	৫৫	২৩৬৪২	১৫	০
১৮২৮	৬	৭	৫০	৭৮৭২	২৫	৫
১৮২৯	৭	৩৫	৪৭	৩৮৮৫১	৪৩	৮
১৮৩০	৫	৫	৪৫	৫৬০৫৪	১৯	০
১৮৩১	৩	৫	২৮	১২৯১২	১৪	০
১৮৩২	৫	১১	২৬	১১৯৭৪৪	১৬	২
১৮৩৩	৬	৫	৬৮	২৭৯৭৮১	৬৮	৩
	১১৮	১৭২	৬৮২	১১৪২৮৯১।০	৪৫৭	১৮৬

সরকার হইতে এত যত্ন করিয়া যে ডাকাইতি একেবারে বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। নিম্নের বিবরণগুলি দেখিলেই পাঠকগণ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বক্সি নামক একজন দলপতি তাহার কয়েকজন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে গঙ্গাজল-ভারবাহী-রূপে অযোধ্যার জঙ্গল প্রদেশ হইতে বহির্গত হয়। তাহারা তাহাদিগের গন্তব্য পথ দিয়া আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধন করিবার মানসে ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকে। রাত্রিকালে নিকটবর্ত্তী জঙ্গল আশ্রয় করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে চলিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের মধ্যে ৩ জন গঙ্গা পার হইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিবার মানসে প্রস্থান করে, আর একজন কোন ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে একখানি ভাল নৌকা খরিদ করিবার নিমিত্ত গঙ্গার বামদিক অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে গমন করিতে করিতে যখন তাহারা কানপুর জেলার অন্তর্গত সুরসোল পুলিস থানার অপর পারে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময় উহাদিগের একজন আসিয়া সংবাদ দেয় যে, জনৈক মহাজন মৃজাপুর হইতে ফরক্কাবাদে এক গাড়ী অর্থ পাঠাইয়াছে, ঐ গাড়ী সেই দিবস সুরসোলে পৌঁছিলে সকলে থানার নিকট বিশ্রাম করিতেছে।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই উহারা সেই রাত্রেই ঐ ধন আক্রমণের ইচ্ছা করিল। তাহারা যে নৌকা খরিদ করিয়াছিল, তাহা দ্বারা গঙ্গা পার হইল ও ১০।১২ মাইল চলিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়াই ধনবাহীগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক সাত জনকে আহত করিয়া ধনপূর্ণ বাক্স সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও উহার মধ্যে হাজার টাকা করিয়া ২৫টী তোড়া লইয়া, দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

যখন তাহারা গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইল, তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল, সুতরাং ঐ অবস্থায় আর অধিক দূর গমন করা নিরাপদ নহে বিবেচনা পূর্ব্বক গঙ্গার ধারে বালুকা মধ্যে ঐ সকল অর্থ প্রোথিত করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়া কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। রাত্রিকালে সকলে পুনরায় সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রোথিত অর্থ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল ও ক্রমে আপনাপন স্থানে উপনীত হইয়া ঐ অর্থ খরচ করিয়া হোলীর আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল।

পর বৎসর নভেম্বর মাসে বক্সি তাহার দল লইয়া পুনরায় বহির্গত হইল। তাহার একজন বন্ধু বুধন সিং বক্সীর আহ্বানু-মতে দলসহ মজফর নগর হইতে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। ইহাদিগের দলের ৪০ জন মাত্র লোক এই কার্য্যে সমবেত হইল।

চাঁদা নামক একজন সর্দ্দার আপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বেরেলির ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গুপ্ত গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত হইয়া-ছিল। কিন্তু সেই কার্য্য তাহার আর ভাল লাগিল না, সে পুনরায় আপন দল সৃষ্টি করিয়া ৩২ জনের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক বক্সির সহিত আসিয়া মিলিত হইল।

এই তিনজন দলপতি একত্রে কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইবার মানসে পৃথক পৃথকরূপে গঙ্গাজলবাহীর বেশে বহির্গত হইল। উহাদিগের দল হইতে নিয়মিতরূপে কেহ কেহ সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বক্সীর আদেশমত তাহাদিগের সেই নৌকা

এলাহাবাদে নীত হইল। এই স্থানে ঐ সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গম প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিয়া সেই স্থানের প্রয়াগী ব্রাহ্মণদিগকে দানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করতঃ তাহাদিগের নিকট হইতে অভীষ্ট কার্য্যের কৃতকার্য্যের নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ জানিতে পারিল না যে, তাহাদিগের অভীষ্ট কার্য্য কি?

উহারা এলাহাবাদে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া সেইস্থান হইতে ব্যবসায়ের প্রধান স্থান মৃজাপুরে আগমন করিল। কিন্তু মৃজাপুরে অপেক্ষা না করিয়া গঙ্গা পার হইয়া বিন্ধ্যাচলের অপর পার্শ্বে একখানি গ্রামে তাহারা বিশ্রাম করিতে লাগিল। সেই সময় সংবাদ আসিল যে, মৃজাপুরের একজন মহাজনের বাড়ীতে অনেক অর্থ আছে। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা সেই বাড়ীতেই ডাকাইতি করা সাব্যস্ত করিল।

নৌকা উহাদিগের সঙ্গেই আসিয়াছিল, ঐ নৌকায় সকলে পার হইয়া, বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইল, ও সেইস্থানে বিন্দুবাসিনী দেবীকে পূজা করিয়া সন্ধ্যার পর সেইস্থান হইতে মৃজাপুর অভিমুখে বহির্গত হইল। এক ক্রোশ রাস্তা অতিবাহিত করিয়া তাহারা তাহাদিগের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কার্য্যের উপযোগী বেশ ধারণ করিয়া যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি আর একজন সংবাদ লইয়া আসিল যে, রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত মৃজাপুরের রাস্তায় যেরূপ জনাকীর্ণ থাকে, তাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে কার্য্যসিদ্ধি করা নিতান্ত সহজ হইবে না। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা এক স্থানে উপবেশন করিয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিল ও

পরিশেষে সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে গমন করিতে লাগিল।

যে বাড়ীতে ডাকাইতি করিবে, সেই স্থানে উপনীত হইয়া উহাদিগের নিয়মানুযায়ী রাস্তা ও বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থান সকল যেরূপে রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ভাবে ঐ কার্য্যে যাহাদিগের উপর ভার দিয়াছিল, তাহারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে নিযুক্ত হইল। সেই সময় মহাজনের বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, ঐ মুক্তপথে অনেকে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি লোককে হত ও আহত করিয়া, বাক্স পেটরা সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ৪০।৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, যে স্থানে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল ও সেই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, তাহাদিগের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া তাহাদিগের আপন স্থানে উপনীত হইল। এই কার্য্যে উহাদিগের একজনও হত বা আহত হয় নাই।

উহারা নির্ব্বিবাদে কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া আসিল সত্য, কিন্তু ঐ অর্থ বণ্টনের সময় এক গোলযোগ উত্থিত হইল; কারণ ঐ মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে বক্সি বলিয়াছিল যে, এই কার্য্যে যে পরিমিত অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহার এক পঞ্চমাংশ তাহার পিতা রতিরাম ও তাহার মাতার উদ্ধারের নিমিত্ত একেলা গ্রহণ করিবে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রতিরাম ও তাহার স্ত্রী ধৃত হয়, উহারা এখনও লক্ষ্ণৌ জেলে আবদ্ধ আছে। প্রার্থিত মত টাকা প্রদান করিতে পারিলে, উহাদিগের অব্যাহতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। অপর দলপতিদ্বয় প্রথমে ঐ অংশ দিতে কোনরূপেই

সম্মত হয় নাই, কিন্তু বক্সি উহাদিগের মধ্যে পরাক্রান্ত দলপতি। সে নিজের বলের উপর নির্ভর করিয়া কহিল, তাহার প্রার্থিত মত অর্থ যদি তাহাকে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত অর্থই নিজে গ্রহণ করিবে, উহাদিগকে এক পয়সাও প্রদান করিবে না। অগত্যা, অপরাপর সর্দ্দারগণ বক্সির প্রস্তাবেই সম্মত হইল।

পিতামাতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবে বলিয়া বক্সি আট সহস্র মুদ্রা আলাহিদা লইল। সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলপতি, সুতরাং তাহার নিজের অংশ আরও সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিল। অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা সকলের মধ্যে নিয়মিতরূপে বিভাগিত হইল।

বক্সির অনেকগুলি স্ত্রী ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই সন্তুষ্ট করিতে, ঐ সমস্ত অর্থই ব্যয়িত হইয়া গেল। বৃদ্ধ পিতামাতাকে আর জেল হইতে খালাস করা হইল না, তাহারা জেলের মধ্যেই পচিতে লাগিল।

বক্সি যখন পূর্ব্ববর্ণিত কার্য্যে গমন করিয়াছিল, সেই সময় হেমরাজ সিং, তাহার ভ্রাতা মঙ্গল সিং ও তাহাদিগের ভাইপো ধরণু, ৪০ জন অনুচর সমভিব্যাহারে আর একদিকে গমন করিয়া ক্রমে কলিকাতার রাস্তায় সেরঘাটীতে আসিয়া উপনীত হয়। উহাদিগের উদ্দেশ্য—কলিকাতা হইতে যে অর্থ বেণারস প্রভৃতি স্থান হইতে প্রেরিত হইবে, তাহার অনুগমন করা ও সুযোগমতে ঐ সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করা।

এই দলের অজানিত আর একটী দল সেই সময় বাহির হইয়াছিল। ঐ দলের দলপতি ছিল বরিয়ার নামক এক ব্যক্তি ও তাহার ভাগিনা গরিবা। বরিয়ার ২৫ জনের ও গরিবা ১৪ জনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বহির্গত হয়। এই গরিবার পিতা নন্দিবা,

বেরেলি জেলার একজন পুলিস-কর্ম্মচারী ছিলেন। রাস্তা হইতে এই সর্দ্দারদ্বয় আপনাপন লোক জন লইয়া দুই দিকে গমন করে। বরিয়ার গয়ার রাস্তা অবলম্বন করে, গরিবা গ্রেট ট্রাঙ্ক রোড, অবলম্বন পূর্ব্বক সেহের ঘাটীতে আসিয়া উপনীত হয় ও সেইস্থানে মঙ্গল সিংহের দলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। বরিয়ারের সেই সময় উহাদিগের দলের সহিত মিলিত হইবার আশা না থাকায়, গরিবা, মঙ্গল সিংহের দলের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রস্তাব করে। কিন্তু মঙ্গল সিং প্রথমতঃ সেই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। তাহাতে গরিবা মঙ্গল সিংহকে ধরাইয়া দিবে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করায়, পরিশেষে মঙ্গল সিং ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু বলে যে, বরিয়ার যে পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে না পারিবে, তাহার ভিতর কোন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে বরিয়ার বা তাহার দলস্থিত কোন ব্যক্তি কোনরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবে না।

গরিবা কহিল যে, বরিয়ার বা তাহার কোন অনুচর কোন কার্য্যের সময় উপস্থিত হইতে না পারিলেও, তাহারা নিয়মিতরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবে; কারণ—আমাদিগের সকলেরই ইচ্ছা যে, কলিকাতা হইতে যে অর্থ আসিতেছে, সেই অর্থ আত্মসাৎ করা ও এই নিমিত্তই তাহারা সকলে সেই দিকে গমন করিতেছে। এই বিষয় লইয়া যখন উহাদিগের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময় মঙ্গল সিংহের একজন অনুচর আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, প্রায় এক শত অস্ত্রধারী পুরুষের রক্ষণাধীনে অর্থ আনীত হইতেছে। এই সংবাদ পাইয়া তাহারা নিয়মিতরূপে শপথ আদি করিয়া ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

সেই দিবস তাহারা সেহেরঘাটী হইতে রওনা হইয়া একটী নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় লইল। পরদিবস আর একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, ধনপূর্ণ শকট সকল আগামী কল্য পাহাড় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ধনগাঁও নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেই স্থানে সকলে বিশ্রাম করিবে। এই সংবাদ পাইয়া মঙ্গল সিং, গরিবা, বধুয়া ও আরও ছয়জন লোক প্রায় ৬০টী বল্লম, ৪টী কুঠারি ও ৩টী মসাল লইয়া গমন করিল। এই সকল দ্রব্য ঐ গ্রামের প্রায় তিন মাইল দূরে প্রোথিত করিয়া সেই রাত্রি সেই স্থানে অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রাতে ঐ ছয়জন লোক ঐ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া হেমরাজ ও ধন্নুকে দলবল সহ সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে মঙ্গল সিং, গরিবা ও বধুয়া ঐ অর্থবাহী দলের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে সেই পাহাড় আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে যেমন দেখিতে পাইল যে, অর্থবাহী দল অগ্রসর হইতেছে, অমনি তাহারা একটু অন্তরালে গিয়া উহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উহারা নিকটে আসিলে উহাদিগের সহিত মিলিত হইল ও কহিল যে, উহারা যেদিক হইতে আসিতেছে, তাহারাও সেইদিক হইতে আসিতেছে। ঐ দলের সহিত অর্থ বোঝাই আটখানি শকট ছিল। উহারাও ঐ দলের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে উহারা রাত্রিতে বিশ্রাম করিবার স্থান স্থির করিয়া বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা ঐ স্থানের অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেস্থানে তাহাদিগের দলবল ছিল, সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিল। ধনবাহীগণ যে স্থানে বিশ্রাম

করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেইস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একজন করপোরাল ও চারিজন সিপাহীর রক্ষাধীনে এক সহস্র মুদ্রা ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহা গবর্ণমেণ্টের টাকা, সেহের-ঘাটী হইতে হাজারিবাগে, রাস্তা মেরামতের খরচের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। যে স্থানে এ আট গাড়ী অর্থ ও তাহার রক্ষিগণ ছিল, তাহার প্রায় বিংশতি হস্ত দূরে এই সরকারী অর্থবাহীগণও বিশ্রাম করিতে লাগল। সর্দ্দারগণ ইহা দেখিয়া আপন দল-বলের নিকট প্রত্যাগমন করিল।

রাত্রি দশটার সময় এই সকল অর্থবাহীগণকে আক্রমণ করিবে, এইরূপ স্থির করিয়া সকলে প্রস্তুত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। গরিবা ও তাহার বাছা বাছা কয়েকজন লোকের উপর ইহার ভার পড়িল। গরিবা ঐ সরকারি সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়া করপোরেল ও চারিজন শাস্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহাদিগের তরবারি বন্দুক প্রভৃতি আত্মসাৎ করিল। ওদিকে অপর সর্দ্দারগণ মশাল জ্বালিয়া সদলবলে একেবারে ঐ একশত ধনরক্ষীগণকে আক্রমণ করিল। তাহারা একজন সিপাহী ও একজন দোকানদারকে হত্যা ও ১৬ জন সিপাহীকে গুরুতররূপে আহত করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত পূর্ব্বক তিনখানি গাড়ী হইতে কেবলমাত্র ২৮ তোড়া মুদ্রা গ্রহণ করিল। উহার প্রত্যেক তোড়ায় দুই হাজার পাঁচ শত করিয়া টাকা ছিল। ইহার অধিক বহন করিয়া নিরাপদে পলায়ন করিবার ক্ষমতা না থাকায়, উহারা অধিক অর্থ গ্রহণ করিল না।

ইহারা যে স্থান হইতে ঐ রাত্রিতে সেইস্থানে গিয়াছিল, সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিল। এই আক্রমণে গরিবা তাহার নিজের

দলের কোন লোকের অসাবধানতায় সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎব্যতীত আর কেহই হত বা আহত হয় নাই।

এই ঘটনা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখের রাত্রে সংঘটিত হয়।

ঐ স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া উহারা দেখিল যে, উহারা ৭০০০০৲ সত্তর হাজার টাকা আনিতে সমর্থ হইয়াছে। মঙ্গল সিং ও হেমরাজ তাহাদিগের নিজের অংশ গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট গরিবাকে লইতে কহিল, ও বলিল, তুমি তোমার অংশ গ্রহণ কর ও বরিয়ার ও তাহার পঁচিশ জন অনুচরের অংশ তুমি বহন করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিও। গরিবা কেবলমাত্র দুই তোড়ায় পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করিল ও কহিল, বরিয়ারের ও তাহার নিজের অবশিষ্ট অংশ তোমরা বহন করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিও।

মঙ্গল সিং এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, উহাদিগের মধ্যে একরূপ মনোবিবাদ বাধিল। পরিশেষে উহাদিগের অংশ ত্রিশ হাজার টাকা মঙ্গল সিং সেই স্থানে প্রোথিত করিয়া আপন অংশ লইয়া প্রস্থান করিল। গরিবাও বরিয়ারের অনুসন্ধানের নিমিত্ত বহির্গত হইল ও গয়ার দক্ষিণ টিকারী নামক স্থানে অনুচরবর্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎ পাইল।

রহিলখণ্ডের মধ্যস্থিত সাজাহানপুর জেলার অন্তর্গত কোটার নামক স্থানের রাজা খুসিয়াল সিং সেই সময় তীর্থ ভ্রমণার্থে গয়ায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাঁকে মেহেরবান সিংহের ন্যায় রাজা জ্ঞান করিয়া গয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার লোকজনের সহিত তাঁহাকে ধৃত করিয়া কিছু দিবস পর্য্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখিলেন ও পরিশেষে যখন জানিতে পারিলেন যে, ইনি ডাকাইতের সর্দার

নহেন, প্রকৃতই কোটার নামক স্থানের রাজা, তখন তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যাহতি দেওয়া হইল।

বরিয়ার আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার অংশ প্রার্থনা করিল। মঙ্গল সিং সেই সময় তাহাকে দুই সহস্র মাত্র অর্থ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট প্রোথিত অর্থ আনিবার নিমিত্ত বরিয়ার ও অপরাপর লোকের সহিত সেই মাসের শেষে বহির্গত হইল। গরিবা সেই সময় পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিল। যে স্থানে ঐ অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিয়া ঐ অর্থ বাহির করিল, কিন্তু দেখিল যে, উহার মধ্য হইতে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা নাই। বরিয়ার মঙ্গল সিংহের উপর দোষারোপ করিয়া কহিল, ঐ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা প্রোথিত করিবার সময় মঙ্গল সিং চুরি করিয়াছে। মঙ্গল সিং, ঐ অর্থের কথা কিছুমাত্র অবগত নহে। সুতরাং যাহা পাওয়া গেল, তাহাই লইয়া সকলে প্রত্যাগমন করিল। ইহাতে উভয়ের মধ্যে যে মিটমাট হইয়া গেল তাহা নহে, উহাদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদের পর তাহা-দিগের সকলের পৃষ্ঠপোষক ডেরা-জগদীশপুরের রাজা গঙ্গা সিং ও তাঁহার মন্ত্রী চন্দন সিংহের নিকট বরিয়ার গিয়া নালিস করিল, ও তাঁহাকে ধর্ম্মতঃ বিচার করিতে কহিল। মঙ্গল সিং পীড়িত বলিয়া তাঁহার নিকট গমন করিল না, কিন্তু তাহার সহিত যাহারা গমন করিয়াছিল, ও যাহারা ঐ অর্থ প্রোথিত করিয়াছিল, তাহা-দিগের অনেককেই বরিয়ার, রাজার নিকট হাজির করিল।

রাজা এই বিচারের ভার দেবতার হস্তে অর্পণ করিলেন; ও এইরূপ সাব্যস্ত হইল যে, যাহারা ঐ অর্থ প্রোথিত করিয়াছিল, তাহারা লৌহনির্ম্মিত জলন্ত গোলক হস্তে লইয়া কিয়দ্দূর গমন

করিবে, ইহাতে যাহার হস্ত পুড়িয়া যাইবে, সাব্যস্ত হইল যে, সেই চোর, তাহাকে ঐ দ্বাদশ সহস্র অপহৃত মুদ্রা ও পাঁচ শত টাকা সরকারি জরিমানা প্রদান করিতে হইবে। মঙ্গল সিংহের যে সাত জন লোক অর্থ সকল প্রোথিত করিয়াছিল, তাহারাও এই প্রস্তাবে সম্মত হইল অর্থাৎ জ্বলন্ত লৌহ গোলক হস্তে লইয়া নির্দ্ধারিত স্থান পর্য্যন্ত যাইতে সম্মত হইল। রাজা কহিলেন, এইরূপ উপায়েই বিচার ঠিক হইবে। কারণ ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কাহার দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন, সুতরাং তিনি তাহারই হাত পুড়াইয়া দিবেন ও নির্দ্দোষীকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

এইরূপ সাব্যস্ত হইবার পর একজন কামার ডাকাইয়া একটী লৌহ গোলক প্রস্তুত করা হইল, ও উহা অগ্নির উপর গরম করিয়া একটী বড় চিমটার দ্বারা উহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে পর পর প্রদান করা হইল। হাতের উপর যেমন একটা একটী বটপত্র রহিল, উহার উপর ঐ উত্তপ্ত লৌহ গোলক ধারণ করিয়া যে কয় পদ গমন করিবার স্থিরতা হইয়াছিল, সেই কয় পদ গমন করিতে লাগিল। ইহাতে কাহারও হস্ত পুড়িল না, কেবল বুধুয়া ও নন্দরাম নামক দুই ব্যক্তির হস্ত পুড়িয়া গেল। সুতরাং ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, উহারাই ঐ অর্থ অপহরণ করিয়াছে, উহাদিগের নিকট হইতে জরিমানা পাঁচ শত টাকা আদায় করা হইবে। বরিয়ারের উপর আদেশ হইল যে, যেরূপে হউক, সে উহাদিগের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে।

বরিয়ার উহাদিগকে আপন স্থানে লইয়া গিয়া ঐ টাকার নিমিত্ত কয়েক মাস কয়েদ করিয়া রাখিল। পরিশেষে টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রদান করিলে উহারা অব্যাহতি পাইল।

এই বুধুয়া পরিশেষে একজন সর্দ্দাররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এই ঘটনার প্রায় ৮ বৎসর পরে যখন সে ধৃত হয়, তখন তাহার হস্তে সেই পোড়ার দাগ বিদ্যমান ছিল। সেই সময় সে শ্লিমেন সাহেবকে আপনার হস্ত দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, সেই সময় দেবতা যে বিচার করিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। তাহারাই উহা উঠাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু অপর দু হাজার টাকা যে কি হইল তাহা তাহারা অবগত নহে।

ঐ ডাকাইতগণ কর্ত্তৃক আর যে কোথাও ডাকাইতি হয় নাই তাহা নহে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে গোরকপুর জেলার অন্তর্গত আমোদা নামক স্থানে সরকারি টাকা আক্রমণ করিয়া চারিজনকে হত ও নয়জনকে আহত পূর্ব্বক ঐ টাকা আত্মসাৎ করে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে মইনপুরী জেলার অন্তর্গত সাকিত নামক স্থানে দুইজনকে হত ও বারজনকে আহত করিয়া ১৭৪১৪৲ টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে হমিরপুর জেলার অন্তর্গত মোদা নামক স্থানে একজন হত ও পাঁচজনকে আহত করিয়া ৩২৬৮৲ সরকারি টাকা অপহরণ করিয়া লয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গোরকপুর জেলার অন্তর্গত সিপারিয়া নামক স্থানে সরকারি টাকা আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহাতে কেবল একজন মাত্র হত হয়।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারিতে উহারা মইনপুরী জেলার অন্তর্গত গারোয়াল নামক স্থানে একজনকে হত ও ১০১ জনকে আহত করিয়া সরকারী ১৪৬১১৲ টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

১৮৩৬ সালে উহারা মৃজাপুর জেলার অন্তর্গত কাচুয়া নামক স্থানে দুইজনকে হত ও আট জনকে আহত করিয়া কালেক্টারের প্রেরিত ৯১০৲ টাকা লইয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

গত অভিযানে কৃতকার্য্য হইয়া বক্সি ও তাহার অনুচরবর্গ এইরূপ মনস্থ করিলেন যে, গঙ্গার দক্ষিণপার্শ্বে কানপুরের পল্টনের ছাওনির সন্নিকটে বিথোর নামক স্থানে ভূতপূর্ব্ব পেষোয়া বাজি রাওয়ের যে সমস্ত সঞ্চিত সুবর্ণ মুদ্রা আছে, তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতঃ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে, একটী প্রকাণ্ড দল লইয়া বহির্গত হইলেন ও ক্রমে গগাও নামক পল্লীর অল্প দূরে লালবাগ নামক স্থানের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মৃজাপুর ডাকাইতিতে বক্সি যেরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, পুনরায় যাহাতে সেইরূপ আচরণ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত ঐ লালবাগ নামক স্থানে পুনরায় সকলে কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় ও সেইস্থানে ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি কি পরিমাণে অংশ প্রাপ্ত হইবে।

এই সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে বক্সির প্রথম পুত্র মহাজিৎ, রামলাল ও চারি পাঁচজন সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া কানপুর ও বিথোরের সংবাদ উত্তমরূপে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করেন। যে কেহ যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, নেউলগঞ্জ

নামক স্থানে সকলে একত্র হইবে, এই কথা রহিল। ক্রমে সকলেই যথাস্থানে একত্রিত হইল।

ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের নিজের একখানি নৌকা ও কিছু হাতিয়ার ভিন্ন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নহে, সুতরাং বক্সি তাহার পুত্রকে একশত টাকা প্রদান করেন, উহার ৫০ টাকা দিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ও অবশিষ্ট ৫০৲ টাকার দ্বারা ছয়টী বন্দুক, একটী পিস্তল এবং বল্লমের হাতোলের নিমিত্ত কয়েকখানি বাঁশ কানপুর হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐ নৌকাযোগে ৩ জন লোক মারফৎ উহা প্রেরণ করা হয়।

এতদূর পর্য্যন্ত বক্সীর স্ত্রী তাহার সঙ্গেই ছিল, কিন্তু কার্য্যের সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তাহাকে বাটীতে ফেরৎ পাঠান হয়।

ক্রমে বক্সি তাহার দলবল লইয়া বিঠোরের তিন মাইল দূরবর্ত্তী একটী স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পুত্র মতাজিৎ, নৌকা ও অস্ত্রাদির সহিত ইতিপূর্ব্বেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের কাপড় ও গঙ্গাজল বহন করিবার ঝুড়ি প্রভৃতি সেই স্থানে দুইজনের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট সকলে সন্ধ্যার পর, ঐ নৌকায় গঙ্গা পার হইল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী রাত্রি ১০টার সময় উহারা ভূতপূর্ব্ব পেসয়ার আবাস স্থলে আসিয়া তাঁহার ২৭৫০০০ টাকা লুট করিল।

এই কার্য্য সমাপন করিয়া তাহারা ঐ নৌকাযোগে পুনরায় গঙ্গা পার হইয়া উহা গভীর জলে ডুবাইয়া দেয়। অনন্তর যে স্থানে তাহারা গঙ্গাজল বহনের দ্রব্যাদি রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপন আপন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া গঙ্গাজলবাহী-

রূপে পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ১৪ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া, তাহারা একটী জঙ্গলে গিয়া উপনীত হয়। সেই স্থানে তাহারা ৩০,০০০ টাকা প্রোথিত করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ সঙ্গে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। ছয় দিবস কাল অনবরত চলিয়া ক্রমে তাহারা রাজা মহম্মদ হোসেনের রাজ্য, মহমদীর অন্তর্গত, জালালপুরের নিকটবর্ত্তী ভোতা নামক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হয়। সেই স্থানে লালা হুলাসি নামক এক ব্যক্তির নিকট ঐ সকল গঙ্গাজল বহনের দ্রব্যাদি রাখিয়া দেয়। ঐ ব্যক্তি বক্সির সমস্ত হিসাবপত্র রাখিত। পরদিবস চিয়ারারতি নামক স্থানে একটী পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া ঐ অপহৃত অর্থের কিয়দংশ সকলের মধ্যে বিভাগিত হয়, অবশিষ্ট পরে বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে এই স্থির হওয়ায় উহা অবিভাগিত অবস্থাতেই থাকে। পর দিবস উহারা আপনাদিগের বাসস্থান জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলে সেই স্থানের সমস্ত স্ত্রীলোকগণ একত্রিত হইয়া বিজয়-গীতি গাহিতে গাহিতে উহাদিগকে অভিনন্দন করিল। তাহারাও ঐ সকল স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে সন্দেশ খাইবার নিমিত্ত ১০টী স্বর্ণ ও ২০টী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিল। এইরূপে সকলে আপনাপন বাড়ীতে উপনীত হইবার পর অবশিষ্ট অর্থ সকলের মধ্যে বিভাগিত করিয়া লইল।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO 192. দারোগার দপ্তর, ১৯২ সংখ্যা

বিষম জাল।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ষোড়শ বর্ষ।] সন ১৩১৫ সাল। [চৈত্র

PRINTED BY M. N. DEY. AT THE
Bani Press,
No 63, *Nimtola Ghat Street, Calcutta*
1909.

বিষম জাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রাতে অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে টেলি-ফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি যন্ত্রের নিকট গমন করিয়া বুঝিলাম, বড় সাহেব ডাকিতেছেন। অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, বাগবাজারের কোন ঘাটে এক ইংরাজের লাস পাওয়া গিয়াছে। তোমাকে এখনই সেখানে গিয়া সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া আমি সত্বর সেখান হইতে বাহির হইলাম এবং একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম।

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু আকাশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকায় তখনও রৌদ্র উঠে নাই। মাঘ মাস—দারুণ শীত। শন্ শন্ করিয়া উত্তরে বাতাস প্রবাহিত হইয়া শীতের মাত্রা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

শকট হইতে অবতরণ করিয়া চালককে ভাড়া দিয়া বিদায় করিলাম। পরে সেই লাসের দিকে গমন করিলাম। দেখিলাম,

ভয়ানক জনতা, কয়েকজন মাত্র কনষ্টেবল তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া অতি কষ্টে সেই জনতার হ্রাস করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত উপস্থিত জনগণকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, লোকটী সত্য সত্যই ইংরাজ—সাধারণ বেশ-পরিহিত। মস্তকে টুপী নাই, গাত্রবস্ত্র সম্পূর্ণ জলসিক্ত, মস্তক ও নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইতেছে।

পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলাম, লোকটী তখনও জীবিত, কেবল সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তখনই তাঁহার উপরের কোট ও কামিজটী খুলিয়া ফেলিলাম। দুই চারিজন লোক তখনও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলাম। সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া আমার বোধ হইল, তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, বেশ বলিষ্ঠ, গাত্রের কোন স্থানেই ক্ষতচিহ্ন নাই, নাসিকা ও মস্তকে রক্ত, তাঁহার মুখ মলিন ও পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অতিরিক্ত রক্তপাতই উহার কারণ বলিয়া বোধ হইল।

নিকটেই একটা মদের দোকান ছিল। একজন কনষ্টেবলকে আমি একটু ভাল ব্রাণ্ডি আনিতে বলিলাম। মদ্য আনিত হইলে আমি অল্প অল্প করিয়া তাঁহার ঠোঁটে মাখাইতে লাগিলাম। দুই এক ফোঁটা মুখের ভিতরও ঢালিয়া দিলাম, কিন্তু প্রথম দুই একবার উহা উদরস্থ হইল না। কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে পর লোকটী হঠাৎ চক্ষু মেলিলেন। পরে একবার আমার দিকে ও নিকটস্থ কনষ্টেবলদিগের দিকে চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমি কোথায়?"

তাঁহাকে সজ্ঞান দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, বলিলাম, অধিক কথা কহিবেন না; আমরা সকলেই আপনার উপকারী বন্ধু। অগ্রে এই ব্রাণ্ডি পান করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন, পরে আপনার কথা শুনিব। আপাততঃ আপনাকে মেয়ো হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি।

এই বলিয়া একজন কনষ্টেবলকে একখানি গাড়ী আনিতে আদেশ করিলাম। উহা আনীত হইলে লোকটীকে তাহাতে শয়ন করাইয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলাম।

এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। তখন আমি একজন কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপ অবস্থায়, কখন এবং কোথাই বা লোকটীকে প্রথমে দেখা গিয়াছিল? কে তোমাকে প্রথমে সংবাদ দেয়?

কনষ্টেবল একজন মাঝিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, এই মাঝি আমাকে প্রথমে সংবাদ দেয়। আপনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিবেন।

এই বলিয়া সে মাঝিকে আমার নিকট আনয়ন করিল এবং সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিতে আদেশ করিল। মাঝি জোড় হাত করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। বোধ হইল, তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, বর্ণ শ্যাম, শরীরের মাংস শিথিল, চক্ষু কোটরগ্রস্ত।

আমার নিকটে আসিয়া মাঝি বলিল, "আজ অতি প্রত্যূষে নৌকায় বসিয়া যখন মুখ ও হস্তপদাদি ধুইতেছিলাম, সেই সময়ে হঠাৎ তীরের দিকে আমার নজর পড়ে। প্রথমে আমার সন্দেহ হয়, বোধ হয়, যেন একটা শবদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক হইল; গতরাত্রে আমরা এই ঘাটেই ছিলাম, রাত্রি বারটার পর নিদ্রা যাই, তখনও কোনপ্রকার গোল-যোগ শুনিতে পাই নাই। আজ ভোরে এই কাণ্ড দেখিয়া স্বভা-বতঃই ভীত হইলাম। একা যাইলে পাছে বিপদে পড়ি, এই ভাবিয়া আমারই দুইজন দাঁড়ীকে লইয়া তিনজনে তীরে নামিলাম। যাহা দেখিয়াছিলাম, আপনিও প্রথমে আসিয়া সেই প্রকারই দেখিয়াছেন।”

মাঝির কথা শুনিয়া, তাহার দুইজন দাঁড়ীকে ডাকিয়া আনাই-লাম। তাহারাও প্রত্যেকে ঐ কথাই বলিল। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কার্য্যের কোন সুবিধা বুঝিলাম না। প্রথম লোকটা কে? কেনই বা তাঁহার ঐ প্রকার অবস্থা হইল? কেই বা তাঁহার ঐ প্রকার দুরবস্থা করিল? এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, লোকটার মুখে কোন কথা না শুনিয়া সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই মনে করিয়া, আমি তখনই মেয়ো হাঁসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাঁসপাতালে আসিয়া অগ্রে ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, রোগী নিদ্রিত; তাহাকে চা ও ডিম খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। পানাহার করিয়া তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। কেবল অতিরিক্ত ক্লান্ত হওয়ায়

অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ কিছুক্ষণ পরেই জাগ্রত হইবেন।

আমি তখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তিনি সত্য সত্যই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। অতি ধীরে ও নিঃশব্দে একখানি চৌকী আনিয়া আমি তাঁহারই শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে রোগী চক্ষু উন্মীলন করিয়া সম্মুখেই আমাকে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন,—"এ আবার কোথায় আসিয়া পড়িলাম? আমি কোথায় আছি? কেমন করিয়াই বা আসিলাম? ঘুস্থড়ীর ঘাট হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম?"

লোকটীর কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঘুস্থড়ীর ঘাট? সে ত গঙ্গার পরপারে। আমি একজন পুলিসের লোক। একজন মাঝি আজ প্রত্যূষে আপনাকে বাগ্‌বাজারের ঘাটে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। সেই লোকই প্রকৃতপক্ষে আপনার জীবনদাতা। কেন না, সেই আপনার দুরবস্থা দেখিয়া আপনাকে মৃত মনে করিয়া একজন কনষ্টেবলকে সংবাদ দেয়, ক্রমে আমাদের কর্ণগোচর হয়।"

আমার কথা শুনিয়া তিনি যেন কিছু বিমর্ষ হইলেন, আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল আবার বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গেল। আমি আর কোন কথা না বলিয়া তখনই ডাক্তারকে সংবাদ দিলাম। তিনি সত্বর তথায় আগমন করিলেন এবং রোগীকে আরও খানিকটা ব্রাণ্ডি ও কিছু খাদ্য আহার করিতে দিলেন। পানাহার করিয়া রোগী অনেকটা সুস্থ হইলে, আমি তাঁহার সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া তিনি বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় তখনও পারিলেন না। আমিও বসিতে নিষেধ করিলাম, বলিলাম,—"এ অবস্থায় বসিতে পারিবেন না, যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন শুইয়াই বলুন।"

তিনি বলিলেন,—"সকল কথা আদ্যোপান্ত বলিবার পূর্ব্বে আপনি বলুন, আমি ঘুসুড়ীর ঘাট হইতে কতদূরে পড়িয়াছিলাম।

আমি বলিলাম,—"ঘুসুড়ীর ঘাট এ পারে নহে, আপনি তাহা-রই পরপারে বাগ্‌বাজারের একটা আঘাটায় পড়িয়াছিলেন।"

তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন,—"সেকি! গত রাত্রে আমি এই পারের ঘাট হইতেই নৌকায় উঠিয়াছিলাম। পরপারে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এ পার অতিক্রম করিয়া নৌকাকে পরপার দিয়া যাইতেও দেখিয়াছিলাম। অথচ আমি এ পারেই পড়িয়াছিলাম, এ বড় অদ্ভুত রহস্য! কেন এমন হইল?"

আমিও আশ্চর্যান্বিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, "বৃথা চিন্তায় কোন ফল হইবে না। আপনি এক কার্য্য করুন, সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করুন। আপনাকে দেখিয়া ও আপনার কথা শুনিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আপনি অতি অল্প-দিনই এ দেশে আসিয়াছেন। কি জন্য—কোন্ সূত্রেই বা আপনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে আসিয়াছেন বলুন? আপনার নাম কি এবং আপনি কি কার্য্য করেন?"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "আমার নাম ভ্যাস্কো ভেল্‌ডার। আমার পিতা একজন পর্টুগীজ, কিন্তু আমার মাতা ইংরাজ। কর্ম্মোপলক্ষে পিতাকে অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডেই থাকিতে হইত। সেই সূত্রেই এক ইংরাজ মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ

হয়। আমার পিতা একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি আমাকেও ঐ কর্ম্ম শিক্ষা দেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে আমিও একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হই। ইংলণ্ড কিম্বা ইউরোপের আর কোন দেশে গিয়া কর্ম্ম করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার প্রধান উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষে আসিয়া কোন স্থানে চাকৃরি করি। পিতা পটুর্গীজ অর্থাৎ পটুর্গালবাসী এবং মাতা ইংরাজমহিলা বলিয়া আমি ঐ দুইটী ভাষায় অর্থাৎ ইংরাজী ও পটুর্গীজ ভাষায় বেশ বুৎপন্ন হইলাম। ঐ দুই ভাষাতেই আমি বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারি।

আ। কতদিন পূর্ব্বে আপনি ভারতে আসিয়াছেন?

ভ্যাস্কো। প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে আমি বম্বে নগরে আসিয়া উপস্থিত হই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দেড়মাসের মধ্যে একটীও কার্য্য না পাওয়ায়, আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে যখন এখানে আসিলাম, দেখিলাম, আমার অর্থ কমিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় বাস করিতে হইলে অল্প পয়সায় হইবে না ভাবিয়া, আমি ঘুসুড়ীর কলের নিকট একটী বাগানবাটী ভাড়া লই, এবং সেইখানেই এই কয়দিন বাস করিয়া আসিতেছিলাম।

আ। এখানে আসিয়া কোন কার্য্য পাইয়াছিলেন?

ভ্যাস্কো। এতদিন পাই নাই। কলিকাতার বিখ্যাত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, বড় বড় প্লাকার্ডে নাম লিখিয়া সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না। ক্রমে আমার সমস্ত অর্থও নিঃশেষিত হইতে লাগিল, আমিও বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। গত রাত্রে আহারাদির পর আমি বারান্দায় একখানি চৌকি পাতিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন

সময়ে আমার ভৃত্য নিকটে আসিয়া একখানি কার্ড দিল। কার্ড-খানি গ্রহণ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে "রামরতন—স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি বিক্রেতা" এই কয়টী কথা লেখা রহিয়াছে।

আ। কার্ডখানি হস্তলিখিত না ছাপা ?

ভ্যাঙ্কো। হস্তলিখিত।

আ। তাহাতে কি কোন ঠিকানা লেখা ছিল ?

ভ্যাঙ্কো। না—ঠিকানা নাই দেখিয়াই আমারও কেমন সন্দেহ হইয়াছিল। আমি তখনই তাঁহাকে আমার নিকট আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলাম। সে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই একজন দেশীয় লোককে লইয়া আমার নিকট পুনরাগমন করিল।

আ। তাহাকে দেখিতে কেমন ?

ভ্যাঙ্কো। সাধারণ লোক অপেক্ষা তিনি দীর্ঘ। তাহার বয়স বোধ হয় চল্লিশ বৎসর।

আ। তার পর ?

ভ্যাঙ্কো। আমার সহিত দেখা হইলে তিনি অতি পরিষ্কার বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় বলিলেন যে. তিনি আমার সহিত কিছুক্ষণ গোপনে কোন বিষয় কথোপকথন করিতে চাহেন। আমি তখন তাঁহাকে লইয়া একটী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলাম। ভৃত্যকে বলিয়া দিলাম যেন, কোন লোক সহসা সে ঘরে প্রবেশ না করে। উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে পর তিনি বলিলেন, তাঁহার একটা প্রকাণ্ড কল আছে। সেই কলের সাহায্যে অস্থি চূর্ণ করা হয়। হঠাৎ উহার এক অংশ এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার কাজ-কর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যত শীঘ্র উহা

মেরামত হইবে ততই মঙ্গল, এই ভাবিয়া তিনি সেই অসময়ে আমার নিকট আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কতদিন হইল তাঁহার কল খারাপ হইয়া গিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করিলেন, প্রায় এক সপ্তাহ। আমার তখনই কেমন সন্দেহ হইল। কলি-কাতায় ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নাই। যদি এক সপ্তাহই তাঁহার কল খারাপ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে ইতিমধ্যে তিনি আর কোন ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লন নাই কেন? আর যদি আমারই সাহায্য লইবার আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দিবাভাগে তিনি আমার নিকট আইসেন নাই কেন? ক্রমে সন্দেহভঞ্জনের জন্য ঐ সকল কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, তাঁহার কল পর্টুগাল হইতে আনীত। এখানে যতগুলি ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তাঁহাদের সকলেই ইংরাজ। আমার নাম শুনিয়া তিনি আমাকে পর্টুগীজ মনে করিয়াছিলেন এবং আমিই ঐ কল শীঘ্র মেরামত করিতে পারিব বুঝিয়া, আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি সত্যসত্যই পর্টুগীজ?"

ভ্যাস্কো। আজ্ঞে হাঁ—আমি পর্টুগীজ। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে কখন সেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন? তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"এখনই।" রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়াছিল সুতরাং সেই রাত্রে একজন অপরিচিত লোকের সহিত অপরিচিত স্থানে যাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যখন তিনি বলিলেন যে, কার্য্য সমাপ্তির পর আমাকে একশত টাকা পারিশ্রমিক দিবেন, তখন আর আমার কোন প্রকার ওজর

আপত্তি করিতে সাহস হইল না। বলিতে কি, একশত টাকার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে তখন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। কলিকাতায় আসিয়া অবধি একটীও কার্য্য পাই নাই, আমার যাহা কিছু সম্বল ছিল, একে একে সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছিল, কাজেই আমি সম্মত হইলাম এবং কতদূরে যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভাবিলাম, যদিও আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইবে, তত্রাপি তিনি এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, বিনা ক্লেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি যথাস্থানে পঁহুছিতে পারিব। একে অর্থলোভ, তাহার উপর অভাব সুতরাং আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইলাম এবং তখনই তাঁহার সহিত তাঁহার গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে চন্দ্র উদিত হয় নাই, পথে অনেক দূর অন্তর এক একটা তৈলের আলোক। কোথায় যাইতেছি, কোন্ পথ দিয়া যাইতেছি, এ সকল কথা জিজ্ঞাসাও করিলাম না, কিম্বা তিনিও কোন কথা বলিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। আমার বোধ হইল, পথ যেন আর ফুরাইবে না। কতক্ষণ পরে আমরা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। কোচমানকে বিদায় দিয়া আমরা উভয়েই তীরে যাইলাম। দেখিলাম, একখানি মাত্র নৌকা রহিয়াছে। রামরতন বলিয়াছিলেন, একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার ঘাটে অপেক্ষা করিবে। তাহার সাহায্যে আমরা পরপারে গমন করিব। কিন্তু আমি ত কোন ষ্টীমার দেখিতে পাইলাম না। রামরতনের মুখের দিকে চাহিবামাত্র তিনি ভয়ানক রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমার হুকুম তালিম হয় নাই? ভয়ানক স্পর্দ্ধা।" পরে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, আমাদিগকে

ঐ নৌকা করিয়া পার হইতে হইবে। আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। উভয়ে মিলিয়া সেই নৌকার ভিতর গিয়া বসিলাম।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাত্রি ভয়ানক তমসাচ্ছন্ন, যখন নৌকায় উঠিলাম, তখন সহসা বাতাস বন্ধ হইল দেখিয়া, আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। একটীও নক্ষত্র দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে, কিছুক্ষণ পরেই ঝড় উঠিল। আমাদের নৌকা তখন নদীর মধ্যস্থলে। যদিও আমি সন্তরণপটু, তত্রাপি সেই ঝড়ে নৌকাখানি যে প্রকার দুলিতেছিল, তাহাতে আমার মনে ভয় হইয়াছিল। প্রায় দেড় ঘন্টার পর আমরা নদী পার হইলাম। ঘাটে উঠিয়াই দেখিলাম, একখানি ঢাকা ব্রুহেম্‌ গাড়ী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রামরতন আমার হাত ধরিয়া দ্রুতপদে সেই গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং এরূপে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন যে, আমি বাহিরের কোন বিষয় দেখিতে না পাই। একবার ইচ্ছা হইল, দরজা কিম্বা একটা জানালা খুলিয়া দিই। কিন্তু রামরতন এমন কৌশল করিলেন যে, আমি আর তাহা বলিতে সাহস করিলাম না। সুযোগও তেমনই ঘটিয়াছিল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনিও সাহস করিয়া গাড়ীখানি আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলেন। কতক্ষণ কত রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে গাড়ীখানি থামিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। ভয়ানক অন্ধকার। আলো নাই বলিয়া রামরতন আবার রাগান্বিত হইলেন এবং ভৃত্যকে সহস্র গালি দিলেন। পরে দরজার সম্মুখে গিয়া সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিলেন। চীৎকার করিয়া ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন, অবশেষে

পকেট হইতে একটী বাঁশী বাহির করিয়া তিন চারিবার বাজাইলেন। কিছুক্ষণ পরেই ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল, আমরা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অতি সামান্য আলোকে দেখিলাম, একস্থানে স্তূপাকার অস্থিরাশি, কোথাও বা বড় বড় শিশিপূর্ণ নানাপ্রকার আরক, কোথাও বা ধাতু গলাইবার জন্য বিভিন্ন পাত্র, আবার কোথাও বা কয়লা। এই সমস্ত দেখিয়া ভাবিলাম, উহা কারখানারই একটী অংশ বিশেষ।

"রামরতন আমাকে একটী গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন। আমরা উভয়েই একটী টেবিলের নিকট এক একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, পথে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় আপনার যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কিছু জলযোগ করেন।

"আমিও হাসিয়া সম্মত হইলাম। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উদারতায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তিনি তখনই সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে একজন ভৃত্যের সহিত পুনরায় আগমন করিলেন। ভৃত্য টেবিলের উপর মদ্য, সোডা, মাংসের দুই তিন প্রকার খাদ্য রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি আহার করিয়া বাহির হইয়াছিলাম, সুতরাং রামরতন-প্রদত্ত আহার্য্যগুলির অধিকাংশই পড়িয়া রহিল। কেবল মদ্য ও সোডা পান করিয়া শ্রান্তিদূর করিলাম।

"কিছুক্ষণ পরে রামরতন আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই যন্ত্রের নিকট লইয়া গেলেন। যাইবার সময় অনেকগুলি ঘর ও দালানের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সকল স্থানেই ব্যবহারোপযোগী

কোন না কোন দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত। যন্ত্রটী অবলোকন করিয়া আমিও স্তম্ভিত হইলাম। বিলাতে এরূপ দুই চারিটী যন্ত্র দেখিয়াছি বটে, কিন্তু আমার বেশ ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষে এখনও এরূপ যন্ত্র হয় নাই। যন্ত্রটী দেখিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইল। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুণপনা দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বৈদ্যুতিক প্রবাহে কলটী গতিশীল হইয়া থাকে। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ সম্প্রতি গতিরোধ হইয়াছিল। তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যেও যন্ত্রের গতি হয় নাই। এইজন্যই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঘরটীতে বেশ আলো ছিল। অন্যান্য ঘরগুলি যেমন মৃদু আলোকে আলোকিত, এ ঘরটী তেমন নহে। চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোকে যেন দিনমান করিয়া রাখিয়াছে।

"রামরতন আমারই নিকট দাঁড়াইয়া আমার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি যন্ত্রের সমুদায় স্ক্রুগুলি খুলিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি পৃথক করিয়া রাখিলাম। এত অগ্রাহ্যভাবে আমি এই কার্য্য করিতে লাগিলাম যে, রামরতন আমার শিক্ষায় মোহিত হইয়া গেলেন। যন্ত্রগুলি খুলিতে খুলিতে দেখিলাম, একখণ্ড ক্ষুদ্র টিন দুইখানি চাকার মধ্যে পড়িয়া যন্ত্রের গতি রোধ করিতেছে। আমি তখনই টিন তুলিয়া ফেলিলাম এবং পুনরায় স্ক্রু আঁটিয়া যন্ত্রটী পূর্ব্বের মত করিয়া দিলাম।

"রামরতন তখন হাসিতে হাসিতে তাড়িতের তার যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই প্রকাণ্ড যন্ত্র শন্ শন্ শব্দে ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে নানা প্রকার চাকাগুলি ঘুরিতে লাগিল। আমার কার্য্যে অত্যন্ত আনন্দিত

হইয়া রামরতন তাড়িতের তার খুলিয়া দিলেন। যন্ত্র পুনরায় স্থির হইল। তিনি আমাকে আর একদিন তাঁহার যন্ত্র দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, একদিন দিবাভাগে সেখানে গিয়া যন্ত্রের কার্য্য—কিরূপে প্রকাণ্ড অস্থিরাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে, কিরূপে নানা প্রকার ধাতু হইতে খাদ বাহির করিতেছে, এই সকল ব্যাপার দেখিবেন, দেখিলে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইবেন।

"আমি সম্মত হইলাম। তখন তিনি আমাকে আবার সেই ঘরে আনিয়া টেবিলের নিকট বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আমাকে একশত টাকা ও পাঁচখানি দশ টাকার নোট দিয়া বলিলেন যে, তিনি আমার কার্য্যে এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, প্রতিশ্রুত এক শত টাকার উপর আরও পঞ্চাশ টাকা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমিও অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া অস্পষ্টভাবে দুই একটা কথা বলিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে কথাগুলি আমি স্বয়ংও বুঝিতে পারি নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আবার মদ্য ও সোডা আনিল। রামরতন পান করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমি বাসায় পৌঁছাইয়া দিব। রামরতনের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। মদ্যপান করিলাম। পরিশ্রমের পর অবশ্য সে মদ্য আমায় ভালই লাগিল। মনে কেমন এক প্রকার স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিল। রামরতন তখন আমাকে লইয়া পুনরায় সেই আবৃত ব্রুহেম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই তিনি দ[illegible]দিলেন। কোচমানও তখনি শকট চালনা করিল।

"শেষবার যে মদ্যপান করিয়াছিলাম, তাহাতে নিশ্চয়ই কোন বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত ছিল। নতুবা সেই মদ্যপান করিয়া অবধি আমার শরীর সেরূপ অবসন্ন হইবে কেন? আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইবে কেন? মদ্যপান আমাদের অভ্যাস, প্রত্যেক আহারের সহিত আমরা মদ্যপান করিয়া থাকি। কই, তাহাতে ত আমাদের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হয় না! সে যাহা হউক, কতক্ষণ পরে গাড়ী থামিল। দরজা খুলিয়া রামরতন আমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছি এবং একখানি নৌকাও সেখানে অপেক্ষা করিতেছে।

"রামরতনের অনুরোধে আমি সেই নৌকায় গিয়া বসিলাম। কিন্তু তখন আমার মন এত চঞ্চল হইয়াছিল যে, আমি বাহিরের কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি নাই। নৌকায় উঠিবামাত্র মাঝি নৌকা চালনা করিল। গঙ্গায় তখনও ভয়ানক তুফান হইতেছিল, কিন্তু সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। কিছুক্ষণ অতিকষ্টে যাইবার পর আমার নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। কেন যে এরূপ হইল, তাহা বলিতে পারি না। তবে আরও কয়েকবার আমার ঐরূপ পীড়া হইয়াছিল। একে মদ্যের উত্তেজনা, তাহার উপর অতিরিক্ত রক্তনির্গমন হওয়ায়, আমি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম এবং অবশেষে হতচেতন হইলাম। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন আমি হাঁসপাতালে।"

ভাস্কো ভেলডার সাহেবের কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য! এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমি পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, এ রহস্য ভেদ করিতে হইবে। ইহাও আশ্চর্য্য যে, আপনাকে

পরপারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যখন নৌকায় তুলিল, আর যখন সেই উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া নৌকা চালনা করা হইল, তখন আপনি আবার এ পারে কেমন করিয়া আসিলেন? গঙ্গা অতি ক্ষুদ্র নদী, উহা পার হইতে বড় জোর অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগে। আপনি প্রায় এক ঘণ্টা নৌকায় থাকিয়াও কেন যে পুনরায় এ পারেই পড়িয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এখন আমার কয়েকটী কথার উত্তর দিন। প্রথমতঃ রামরতন আপনাকেই তাঁহার যন্ত্র মেরামত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন কেন? বিশেষতঃ, এ পারে যখন অনেক সাহেব ইঞ্জিনিয়ার রহিয়াছেন, যখন তাঁহাদের দ্বারা অল্প খরচে তাঁহার যন্ত্র সংস্কার হওয়া সম্ভব, তখন তিনি আপনার সাহায্য লইলেন কেন?"

"ভা। যদিও অর্থলোভে আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তথাপি রামরতন কথায় কথায় সে কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যন্ত্রটী পর্টুগালে প্রস্তুত; সেখান হইতেই উহা আনীত হইয়াছিল। সুতরাং রামরতনের বিশ্বাস এই যে, অন্য-দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা পর্টুগীজ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা উহা সহজেই মেরামত হইবে, এই মনে করিয়া তিনি আমার সন্ধান লইয়াছিলেন।

আ। রামরতন আপনাকে পর্টুগীজ বলিয়া জানিলেন কিরূপে?

ভা। আমি বিজ্ঞাপনে পর্টুগীজ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলাম।

আ। যন্ত্রটী কি বাস্তবিকই পর্টুগাল হইতে আনীত?

ভা। আমার ত সেরূপ বোধ হইল না। রামরতন বলিয়াছিলেন বটে, উহা আমারই স্বদেশ হইতে আনীত; কিন্তু আমার

বিশ্বাস, যন্ত্রটী সম্পূর্ণ বিলাতী—ইংলণ্ডে প্রস্তুত। কিন্তু আমি এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করি নাই।

আ। অবশ্যই ইহার ভিতর কোন ভয়ানক রহস্য নিহিত আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাহেব তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন, সুতরাং আর কোন প্রশ্ন না করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

বাসায় ফিরিয়া কিছুক্ষণ সেই ভয়ানক রহস্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার নিকট হইতে যাহা শোনা গেল, তাহা হইতে কোন সূত্র পাইলাম না। যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, কেন না, রামরতন পূর্ব্বেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গাড়ীর দরজা খোলা থাকিলেও ডাক্তো তাহা মনে করিয়া রাখিতে পারিতেন না। তিনি এদেশে আর কখনও আসেন নাই। তাঁহার নিকট সমস্ত পথগুলিই নূতন।

কিছুক্ষণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, এ ভয়ানক রহস্য ভেদ করা বুঝি আমার অসাধ্য হইল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। তখনই হাঁসপাতালে যাইয়া ডাক্তোর সহিত দেখা করিলাম।

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘাট হইতে সেই বাড়ীতে যাইতে যাইতে পথের কোন ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি ?"

ভাস্কো কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার বোধ হয় কোন গির্জ্জার নিকট দিয়া গিয়াছিলাম। রামরতনের সেই কারখানা পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে আমি যেন কোন গির্জ্জার ঘড়ীতে এগারটা বাজিতে শুনিতে পাইয়া ছিলাম। আবার ফিরিয়া আসিবার সময়ও সেই গির্জ্জায় বারটা বাজিতে শুনিয়াছিলাম। পূর্ব্বে এ কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

ভাস্কোর কথা শুনিয়া আমার মনে আনন্দ হইল। মনে করিলাম, এইবার হয়ত কোন সূত্র পাইব। ভাবিলাম, কলিকাতায় গির্জ্জা অনেক আছে। কোন্ গির্জ্জার নিকট দিয়া ভাস্কো গিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। ভাস্কোকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গা পার হইয়া প্রথমতঃ কোন্‌দিকে গাড়ী দৌড়িয়াছিল ? তিনি বলিলেন, দক্ষিণ দিকে।

কিছুক্ষণ পরে ভাস্কো বলিলেন, "যদিও গত রাত্রে ভয়ানক দুর্য্যোগ গিয়াছিল, তথাপি সেই ভয়ানক অন্ধকার মধ্যে আমি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলাম। নিকটস্থ বাড়ীগুলির অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, আমরা কলিকাতার প্রান্তে উপস্থিত।"

ভাস্কোর শেষোক্ত কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমি আহ্লাদে বলিয়া উঠিলাম, এতক্ষণে একটা সূত্র পাইলাম। যখন কলিকাতার প্রান্তে গিয়াছিলেন অনুমান করিতেছেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই বির্জিতলার গির্জ্জার ঘড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, আমার বেশ বিশ্বাস হইতেছে। একথা আগে বলেন

নাই কেন? কি ভয়ানক রহস্য! কি ভয়ানক ব্যাপার! স্মরণ করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে এক ভয়ানক কাণ্ড আজ আবিষ্কৃত হইবে। আপনার অবস্থা কেমন? আমার সহিত কিছু দূরে বেড়াইতে যাইতে পারিবেন কি?

ভাস্কো আমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে বলিলেন, তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ, আমার সহিত কোথাও যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

ভাস্কোর সম্মতি পাইয়া আমি তখনই হাঁসপাতালের ডাক্তার সাহেবের সহিত দেখা করিলাম এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম। থানায় আসিয়া আমার বিশ্বাসী অনুচরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "চূড়ামন! পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোন ছদ্মবেশ করিতে পার? আজ রাত্রে একটী অতি ভয়ানক কাণ্ড ধরা পড়িবে। কিন্তু সে কাজ একা আমার দ্বারা সম্ভব নহে। তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

চূড়ামন হাসিয়া উত্তর করিল, পাঁচ মিনিটের কথা কি বলিতেছেন? আপনি দুই মিনিট কাল অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আর কোন লোক সঙ্গে লইলে হয় না?

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই আরও অনেক লোকের দরকার। কিন্তু এখান হইতে লইলে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। সেইজন্য স্থানীয় থানা হইতেই প্রয়োজন মত লোক সংগ্রহ করিতে হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে চূড়ামন ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া আমার নিকট আসিল। আমি তখনই তাহাকে লইয়া একেবারে হাঁসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ভাস্কোও আমার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু তখন আমি তাঁহার কোন কথায় উত্তর দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া বলিলাম, আর কিছু পরেই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

ভাস্কো আর কোন কথা কহিলেন না। আমি তখন হাঁসপাতালের সাহেবের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে একখানি গাড়ীতে তুলিলাম। চূড়ামন গাড়ীর উপরেই ছিল, আমাদিগকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া সে কোচম্যানকে শকট চালনা করিতে আদেশ করিল। অতি দ্রুতবেগে শকট চালিত হইল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ীখানি আমার উপরিতন সাহেবের অফিসের দরজায় লাগিল। চূড়ামন গাড়ীর উপরেই রহিল। আমি ভাস্কোকে লইয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

অসময়ে আমাকে দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সাক্ষাতের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ভাস্কোকে দেখাইয়া তাঁহার মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, সেই সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়া, বলিলাম—"আমার ভয়ানক সন্দেহ হইতেছে যে, ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

আপনি এ বিষয়ে আমাকে যেরূপ করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিতে সম্মত আছি।"

সাহেব আমার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ অতি গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মুখার্জি! তোমার অনুমান বুঝিতে পারিয়াছি। আমার এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যন্ত্রটী অন্য কোন কার্য্যের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। যন্ত্রের অধিকারী রামরতন এই সাহেবকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথমতঃ সাহেব বলিতেছেন যে, যন্ত্রটী বিলাতী, ইংলণ্ড হইতে আনীত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যে কোন ইঞ্জিনিয়ার উহা মেরামত করিতে সমর্থ। তবে কেন রামরতন রাত্রি, প্রায় দশটার সময় ঘুসুড়ী গিয়া ভাস্কো সাহেবকে সেই যন্ত্র সংস্কারের জন্য লইয়া গেলেন? ইনি বলিতেছেন যে, অতি সামান্য কারণে যন্ত্রের কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। সুতরাং উহা মেরামত করিবার জন্য কোন বিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ যখন সামান্য ব্যয়ে নিকটস্থ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত, তখন ভাস্কো সাহেবকে একশত টাকা দিয়া ঘুসুড়ী হইতে আনিবার প্রয়োজন কি?"

এই বলিয়া সাহেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "আমার বিবেচনায় রামরতনের এমন ইচ্ছা ছিল না যে, তিনি কোন পরিচিত লোকের দ্বারা যন্ত্রটী মেরামত করিয়া লন। ভাস্কো সাহেব সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এখানকার পথ ঘাট তাঁহার জানা নাই, বিশেষতঃ সংবাদপত্রে তিনি আপনাকে একজন পর্টুগীজ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এইজন্যই রামরতন ইহার সমক্ষে যন্ত্রটী

পর্টুগাল হইতে আনীত হইয়াছে, এরূপ বলিয়াছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যদি ইনি আপনাকে ফরাসি বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন, তাহা হইলে রামরতন নিশ্চয়ই যন্ত্রটী ফ্রান্স হইতে আনীত এরূপ বলিতেন।"

সাহেব আমার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যথার্থ অনুমান করিয়াছ। রামরতনের একজন নূতন লোকের দরকার, সেই জন্য তাঁহাকে অনেকগুলি মিথ্যাকথা বলিতে হইয়াছিল। তাহার পর যখন ইনি সেখানে গিয়া যন্ত্রটী দেখিলেন, তখন সেই যন্ত্রে প্রকৃত কোন কার্য্য সমাধা হয় তাহা রামরতন জানিতে দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে অস্থি চূর্ণ করিয়া ধাতু বিশুদ্ধ করা হয়। ইহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদিও ইনি সেখানে নানাপ্রকার অস্থি ও বোতলপূর্ণ আরক দেখিয়া আসিয়াছেন, তত্রাপি সেগুলি যে রামরতন কোনকালে ব্যবহার করিবেন, এরূপ বিশ্বাস হয় না। সাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই ঐ সকল দ্রব্যের আয়োজন। কেমন, একথা বিশ্বাসযোগ্য কি না ?"

আমি বলিলাম, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

সাহেব বলিলেন, "তাহার পর ডাক্তো সাহেব দ্বারা যন্ত্রটী মেরামত হইলে রামরতন একশত টাকার পরিবর্ত্তে দেড়শত টাকা দিলেন। এমন অযাচিত দান আর কখনও শুনিয়াছেন কি ? ডাক্তো যাহাতে ভুলিয়া যান, যাহাতে যন্ত্রের কথা তাঁহার মনে না থাকে, এই উদ্দেশেই তিনি ঐ প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাহার পর যখন বিদায়ের সময় সাহেব মদ্যপান করিলেন, সে মদ্য বিষাক্ত ছিল। সাহেবকে অচেতন করা না হউক, তাঁহাকে সকল কথা ভুলাইয়া দিবার জন্যই এই উপায়ের উদ্ভাবন।

যখন ভাস্কো নৌকায় উঠিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত শরীরে অসহ্য যাতনা আরম্ভ হইয়াছে; তিনি উন্মত্তের মত নৌকার ভিতর বসিলেন। ঝড়ে নৌকাখানি ভয়ানক দুলিতেছিল। একে সেই বিষমিশ্রিত মদ্যপানে তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল, তাহার উপর নৌকার ভয়ানক গতি, তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ ও নাসিকা দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। নৌকায় দাঁড়ী মাঝির অত্যন্ত ভয় হইল, তাহারা সেই অন্ধকারময় রাত্রিতে সেই প্রচণ্ড ঝড়ের সময় অতি কষ্টে সেই ঘাটায় আসিয়া নৌকা লাগাইল এবং ভাস্কোর অচেতন-দেহ তীরে রাখিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল।

সাহেবের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আমারও ঐ প্রকার অনুমান। কিন্তু ইহার ভিতর বোধ হয় আরও কিছু গূঢ় রহস্য আছে।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

তাহার পর তিনি ভাস্কোর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রামরতন আপনাকে যে টাকা দিয়াছিলেন, সে টাকা কোথায়?"

ভা। আমার নিকটেই আছে। দেড় শত টাকার মধ্যে একখানি একশত টাকায় নোট আর পাঁচখানি দশ টাকার নোট।

সা। নোটগুলি দেখিতে পাইব?

ভা। নিশ্চয়ই।

এই বলিয়া পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া ভাস্কো সাহেব আমার সাহেবের হস্তে দিলেন। আমি নিকটে গিয়া নোটগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, দশ টাকার

নোটগুলি সমস্তই কলিকাতা সার্কেলের অন্তর্গত। চর্ম্মচক্ষে দেখিলে কোন প্রকার ক্রটী দিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। একশত টাকার নোটখানির মধ্যে দুইটীতে এমন দাগ ছিল যে, আসল নোটে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। অদ্য দশ টাকার নোটগুলি অন্যরূপে প্রমাণ করিতে পারিব না কিন্তু একশত টাকার খানি পারিব। এ পর্য্যন্ত যতগুলি জাল নোট ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের নম্বর আমার নিকট আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেগুলি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্ক দ্বারা করেন্সিতে পাঠান হইয়াছিল। কোথা হইতে যে সে সকল নোট ব্যাঙ্কে জমা হইল, তাহার কোন সন্ধান নাই। অবশ্য এখনও অনেক গোয়েন্দা এই কার্য্যে লিপ্ত আছেন, কিন্তু এতদিন হইল, কোন প্রকার সন্ধান করিতে পারে নাই। এইবার বুঝি ঈশ্বর মুখ রক্ষা করিলেন।

এই বলিয়া সাহেব আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ত তোমার রহস্য! কেমন মুখার্জ্জি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, আমার অনুমানও ঠিক ঐ প্রকার। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল। যদি অনুমতি হয়, আজই এই কার্য্যে নিযুক্ত হই।"

সাহেব হাসিয়া সম্মত হইলেন। পরে বলিলেন, "এ কার্য্য অল্প লোকের নহে। স্থানীয় পুলিস হইতে যত পারিবেন, লোক সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ভাস্কো সাহেব বড় দুর্ব্বল, অথচ উনি না চিনিলে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না।"

তাঁহাকে বাধা দিয়া ভাস্কো বলিয়া উঠিলেন, "আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি এখন আর তত দুর্ব্বল নহি, অনায়াসে

এ কার্য্যে যোগদান করিতে পারিব। আপনাদের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়াছি। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, অনেক সুকৃতি বশতঃ আমি সিংহের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কি ভয়ানক, নোটগুলি সমস্তই জাল! একখানিও আসল নহে! আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইল। আমার সকল আশা নির্ম্মূল হইল। আমি কি এই নোটগুলি চালাইতে পারিব না?"

সাহেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "আপনার যাহাতে টাকা মারা না যায়, যাহাতে আপনি আপনার পারিশ্রমিক ফেরৎ পান, তাহার উপায় করা যাইবে। অগ্রে আসামী সকল ধৃত হউক, তাহার পর সে সকল বন্দোবস্ত হইবে।"

এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমি ভাস্কোকে লইয়া একখানি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া রাত্রি দশটার পূর্ব্বেই বির্জিতলার গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে উভয়ে শকট হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে নিকটস্থ থানায় গমন করিলাম। গির্জ্জা ঘর হইতে থানা বড় অধিক দূর নহে। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে দারোগা বাবুর সহিত আমার আলাপ ছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

প্রথম সম্ভাষণের পর আমি তাঁহাকে কাজের কথা বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমরা এত নিকটে থাকিতেও যে সকল লোক এমন কর্ম্ম করিতে সাহস করিয়াছে, তাহারা কি ভয়ানক লোক বলিতে পারি না; যতক্ষণ না তাহারা গ্রেপ্তার হয়, ততক্ষণ

নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। আমার অধীনে অনেক কনষ্টেবল আছে; আমি সকলকেই এ কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি। যদি আরও অধিক লোকের প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ভবানীপুরের থানায় কিম্বা একেবারে লালবাজারের পুলিস হইতে লোকের বন্দোবস্ত করা যায়।"

আমি দেখিলাম, আরও অধিক কনষ্টেবলের আবশ্যক হইলে হেড অফিস হইতে লোক আনিবার তত সুবিধা হইবে না, এই ভাবিয়া বলিলাম, আবশ্যক হইলে ভবানীপুর থানায় সংবাদ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত লোক একত্রিত হইল। আমি তখন দুইজন করিয়া আঠারটী দল করিলাম। এক এক দলকে এক এক দিকে পাঠাইয়া দিলাম। গির্জার চারিদিকে এক ক্রোশের মধ্যে যত বাড়ী আছে সমস্তগুলির বিশেষ করিয়া সন্ধান লইতে আদেশ করিয়া সমস্ত লোককে বিদায় দিলাম। ভবিষ্যৎ উন্নতির লোভ দেখাইয়া, অর্থ পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা করিয়া মিষ্টকথায় বশীভূত, করতঃ যাহাতে শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহার উপায় করিলাম। কনষ্টেবল সকলই পুলিসের ইউনিফরম ত্যাগ করিয়া সাধারণ বেশ পরিধান করতঃ উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে তৎপর হইল।

আমি, ভাস্কো, দারোগা ও দুইজন কনষ্টেবল ভিন্ন আর সকলেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। কনষ্টেবলদ্বয় বাহিরেই ছিল। আমরা তিনজন ভিতরে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলাম।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন?" আমার পরামর্শে রাত্রে বড় সুবিধা হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন সুবিধা হইবে না?"

দা। হয় ত সকল আসামী ধরা পড়িবে না? রাত্রি প্রায় একটা। বাড়ীটার সন্ধান বাহির করিতে আরও দেড় ঘণ্টা লাগিবে সুতরাং আক্রমণ করিতে রাত্রি দুইটা বাজিবে। সে

সময়ে যে কারখানায় সকল আসামী উপস্থিত থাকিবে, এমন বোধ হয় না। যদি ঠিক রাত্রিশেষে, অতি প্রত্যুষে আক্রমণ করেন, তাহা হইলেও কতকটা সম্ভব।"

আমি বলিলাম, "আমি প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই আসামীদিগকে ধরিতে ইচ্ছা করি। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় শীঘ্রই বাড়ীটার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঠিক চারিটার পর আমরা এখান হইতে যাত্রা করিব।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন হাবেলদার দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার মুর্ত্তি দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, সে কোন সন্ধান পাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে? কোন সন্ধান পাইয়াছ?"

কনষ্টেবল করযোড়ে বলিল, "থানা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড গুদাম-বাড়ীর বাহির হইতে যেন কোন যন্ত্র চালনার অতি সামান্য শব্দ শোনা যাইতেছে। পাছে ভুল হয়, এইজন্য সেখানে আমার জুড়ীদারকে রাখিয়া আমি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

কনষ্টেবলের কথা শুনিয়া আমি আন্তরিক আনন্দিত হইলাম এবং তখনই তাহার সহিত সেখানে যাইবার ইচ্ছা করিলাম। ভাস্কোও আমার সহিত গেলেন।

প্রায় এক মাইল পথ গমন করিয়া একজন লোককে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। নিকটে গিয়া দেখিলাম, সে আমাদেরই লোক। সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড গুদামবাড়ী দেখিতে পাইলাম। বাড়ীটা বাহির হইতে দেখিলে কয় তলা তাহা বুঝিবার উপায়

নাই। চারিদিকে অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অট্টালিকার দরজা প্রকাণ্ড, কিন্তু সুদৃঢ়। দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করা সামান্য বলের কর্ম্ম নয়।

রাত্রি প্রায় একটা; জন-মানবের সাড়া শব্দ নাই। রাত্রি তমসাচ্ছন্ন। সরকারী আলোও সেখানে ছিল না। আমি ধীরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড দরজার নিকট গমন করিলাম। ভাস্কো সাহেবও আমার অনুসরণ করিলেন।

দরজার সম্মুখে যাইতে না যাইতে ভাস্কো অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! এই সেই বাড়ী। আর কোন ভুল নাই। এতক্ষণে আমি চিনিতে পারিয়াছি। এই সেই দরজা, এই সেই উচ্চ প্রাচীর।"

আরও কত কি বলিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তাঁহাকে স্থির হইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি তখনই চুপ করিলেন। তখন সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই বাড়ীর ভিতর হইতে পরিষ্কার যন্ত্রের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

একবার মনে করিলাম, এখনই আক্রমণ করা যাউক। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, যাহারা থানার এত নিকটে থাকিয়াও নোট জাল, মেকি টাকা করিতে পারে, তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আক্রমণ করাই যুক্তিসিদ্ধ।

এইরূপ স্থির করিয়া আমরা সকলেই সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, প্রায় সকলেই নিষ্ফল হইয়া থানায় প্রত্যাগমন করিয়াছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার সকলে একত্রিত হইল। আমি তখন তাহাদের সকলকে সেই বাড়ীটী ঘেরাও করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে

আদেশ করিলাম। বলিলাম, আমরা রাত্রে চারিটার সময় এখান হইতে যাত্রা করিব। সেখানে পৌঁছিলে আক্রমণের বন্দোবস্ত করিব।

কনষ্টেবল চলিয়া গেল। রাত্রি তখন দুইটা। ভাস্কোকে একখানি ক্যাম্পখাটে শুইতে বলিলাম। একে দুর্ব্বল শরীর, তাহার উপর এত পরিশ্রম, হয় ত সহ্য হইবে না। তিনিও সম্মত হইলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। আমি ও থানার দারোগা সেই কনষ্টবলগণের সহিত ঐ বাড়ীর নিকটেই রহিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাড়ে চারিটার সময় আমরা কার্য্য আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বদিক তখনও পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয় নাই, পক্ষীকুল তখনও কুলা ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে নিযুক্ত হয় নাই, দুই একটী শ্বাপদ জন্তু তখনও ছুটাছুটী করিতেছিল।

বাড়ীটার চতুস্পার্শ্ব ঘুরিয়া দেখিলাম, কনষ্টেবলগণ উহার চারিদিকে ঘেরাও করিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে। আমি একবার দরজার নিকট গেলাম, তখনও যন্ত্র-চালনার মৃদু শব্দ বাহির হইতে শোনা যাইতেছিল।

আর অপেক্ষা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া, আমি কয়েকজন কনষ্টেবলকে দরজায় ধাক্কা দিতে আদেশ করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা প্রস্তুত ছিল; আমাদের কথাবার্ত্তায় তাঁহারা বুঝিয়াছিল যে, ঐ বাড়ীটীতে জাল নোট ও টাকা প্রস্তুত হয়। সুতরাং সকলেই তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল।

আমার আদেশ পাইতে না পাইতে আটজন কনষ্টেবল সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। কিন্তু দরজাটী এত দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত ছিল যে, তাহাতে তাহার কিছুই ক্ষতি হইল না। এদিকে ভিতর হইতে লোকজনের পদশব্দ শোনা যাইতে লাগিল। তাহাদের পদশব্দে বুঝিলাম, তাহারা আমাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াছে এবং নিশ্চয়ই পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমি সেই বাড়ীকে এরূপে অবরোধ করিয়াছিলাম যে, তাহার ভিতর হইতে জনপ্রাণীরও পলায়নের উপায় ছিল না।

সে যাহা হউক, কয়েকটী ধাক্কা দিয়া যখন কোন ফল হইল না, তখন আমি তাহাদিগকে কোন যন্ত্রের সাহায্যে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। দরজা ভাঙ্গিয়া গেল।

আমরা সকলেই সশস্ত্র ছিলাম। আমার নিকট দুইটী ক্ষুদ্র পিস্তল ছিল, ভাস্কো সাহেবকেও একটী পিস্তল দেওয়া হইয়াছিল, দারোগাবাবুর নিকটও একটী পিস্তল ছিল। আপন আপন পিস্তল বাহির করিয়া কয়েকজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ভাস্কো সাহেব পথ চিনিতেন, তিনি দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ধরিয়া

অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথম কয়েকটী ঘরে কোন লোককে দেখিতে পাওয়া গেল না। ভাবিলাম, যদি উহারা পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে বাহিরের কনষ্টেবলগণ কর্ত্তৃক অতি সহজেই ধৃত হইবে।

এই প্রকার স্থির করিয়া আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে যে গৃহে যন্ত্র ছিল, ভাস্কোসাহেব আমাদিগকে সেই ঘরে লইয়া গেলেন। তিনজন লোক সেই ঘরে কি কার্য্য করিতেছিল, আমাদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, কিন্তু পলায়নের চেষ্টা করিল না। আমি তখনই কনষ্টেবলগণকে ইঙ্গিত করিলাম। তাহারা সেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করিল।

বন্দী তিনজনকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া আমরা অপর গৃহে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেখানে নোট বা টাকা প্রস্তুত হইতেছিল, সে ঘর দেখিতে পাইলাম না। আমার সমভিব্যাহারী কনষ্টেবলগণ চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। বাড়ীটীতে যতগুলি ঘর ছিল, সমস্তগুলিই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু আর কোন লোক দেখিতে পাওয়া গেল না। বন্দীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তাহারা তিনজন ভিন্ন আর কোন লোক তখন সেখানে ছিল না। কিন্তু যেরূপ ভাবে তাহারা ঐ সকল কথা বলিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল না।

আমি তখন আর তাহাদিগকে ব্যস্ত না করিয়া স্বয়ং অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এই বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোন চোরা কুটুরী আছে। কিরূপে উহার সন্ধান পাই, জানিবার জন্য আমি

একগাছি লাঠী লইয়া সমস্ত ঘরগুলির দেওয়ালে আঘাত করিতে লাগিলাম।

প্রায় দশ মিনিট কাল ঐ প্রকার আঘাত করিতে করিতে একস্থানে কেমন এক প্রকার ফাঁপা আওয়াজ হইল। ভাস্কো সাহেবকে সেই স্থান দেখাইলাম। তিনিও সেই প্রকার বিবেচনা করিলেন। তখন সকলে মিলিয়া সেই দেওয়ালটী পরীক্ষা করিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিলাম। তৎক্ষণাৎ দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। একটী গুপ্তদ্বার দেখা গেল। আমি, ভাস্কো ও দারোগাবাবু সেই দরজায় প্রবেশ করিলাম। কিন্তু অধিক দূর যাইতে হইল না। কিছু দূর যাইতে না যাইতে একটী পিস্তলের শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল এবং সেই সঙ্গে একটী গুলি আমার স্কন্ধের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত হইলাম! কিন্তু সে কেবল ক্ষণেকের জন্য। আমিও তখনই পিস্তল ছুড়িলাম। ভয়ানক শব্দে চারিদিক প্রতি-ধ্বনিত হইল। শব্দের শেষ হইতে না হইতে ভিতর হইতে মানবের চীৎকার ধ্বনি কর্ণগোচর হইল। পরক্ষণেই আমরা ভিতরে গিয়া দেখিলাম, এক ভয়ানক আকৃতি দুর্ব্বৃত্ত দস্যু দণ্ডায়মান। তাহার দক্ষিণ হস্তে আমার পিস্তলের গুলি লাগিয়াছিল বলিয়া তাহার হস্তস্থিত পিস্তলটী তাহারই পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে।

তাহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া আমি আর বিলম্ব করিলাম না। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে আমি তাহাকে আক্রমণ করিলাম। দক্ষিণ হস্ত আহত হইলেও লোকটা অসুরের মত লড়াই করিল। সহজে তাহাকে বন্দী করিতে পারিলাম না। অবশেষে দারোগা ও ভাস্কো সাহেবের সাহায্যে তাহাকে ধৃত করিলাম।

তাহাকে দুইজন কনষ্টেবলের জিম্মায় রাখিয়া আমরা আরও ভিতরে গমন করিলাম। ঘরের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, আরও কয়েকজন লোক সেখানে ছিল। কিন্তু অনেক অন্বেষণ করিয়াও আমরা তাহাদের কোন সন্ধান পাইলাম না। ঘরটীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, ভিতর দিক হইতে বাহিরে পলায়ন করিবার আর পথ নাই। তবে লোকগুলি কোথায় গেল, জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। একবার ভাবিলাম, হয় ত কোন গুপ্তদ্বার আছে এবং সেই দ্বার অন্বেষণ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিলাম। সেখানকার চারিদিকের দেওয়াল-গুলিতে লাঠির আঘাত করিতে লাগিলাম। ডাক্তার ও দারোগা বাবু আমার কার্য্যের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন বুঝিলাম, লোকগুলি তখনও ভিতরে আছে। কিন্তু কোথায় আছে জানিবার জন্য চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ঘরের মেঝের উপর রৌপ্য তাম্র, শীশা, দস্তা প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতু পড়িয়াছিল। কতগুলি বড় বড় মুচীও দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, সে ঘরে টাকা, গিনি ইত্যাদি মুদ্রা জাল করা হয়।

আরও ভিতরে গমন করিলাম। একটী সরু ক্ষুদ্র পথ দিয়া ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল। তিনজনে একেবারে তাহার ভিতরে প্রবেশ করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি স্বয়ং অগ্রে গমন করিলাম। এবারে কিন্তু আমিই অগ্রে পিস্তল ছাড়িলাম। শব্দের শেষ হইতে না হইতে একেবারে দুইটি ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইল। সাঁই সাঁই শব্দে বন্দুকের গুলি আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আহত হইলাম না।

দারোগাবাবু আমার ঠিক পশ্চাতে ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি একটী উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া ভিতরের লোকদিগকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, বন্দুকের গুলি তাঁহারই মস্তকের একপার্শ্বে সামান্য জখম করিয়া চলিয়া গেল; তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। ভাস্কো সাহেব মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং তখনই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। আমার অন্য কোন কার্য্যের সময় ছিল না। কনষ্টেবলগণও অনেক পিছনে ছিল। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া একাই তাহাদের দুইজনের সম্মুখীন হইলাম।

লোক দুইজন আমাদের প্রথম বন্দী অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল, বলিয়া বোধ হইল। আমি তাহাদের একজনকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া এমন একটি আছাড় মারিলাম যে, সে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তাহাকে ফেলিতে না ফেলিতে অপর ব্যক্তি অগ্রেই আমায় ধরিয়া ফেলিল এবং যদি সেই সময় ভাস্কো সাহেব আমার সাহায্যের জন্য উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা সাংঘাতিক হইত।

কনষ্টেবলগণের সাহায্যে সেই দুইজনকেও বন্দী করিলাম। তাহার পর আমরা সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করি-লাম। কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। যন্ত্রটি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, নোট টাকা গিনি ইত্যাদি যথেষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। কতকগুলি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, কতক-গুলির অর্দ্ধেক হইয়াছে, আবার কতকগুলির অতি সামান্য কার্য্যই হইয়াছে।

বাহিরে যে সকল কনষ্টেবল ছিল, একে একে তাহাদের

অনেকেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং যে যাহা সম্মুখে পাইল, সমস্তই গ্রহণ করিল।

এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া কতকগুলি কনষ্টেবলকে সেখানে রাখিয়া অবশিষ্ট কনষ্টেবল, তিনজন বন্দী, আহত দারোগাবাবু ও ভাস্কো সাহেবকে লইয়া আমি থানায় পঁহুছিলাম। এতদিন যাহার জন্য পুলিসের লোকে কোন কিনারা করিতে পারে নাই, সেদিন তাহা ধরা পড়িল।

বিচারে তাহারা দোষ স্বীকার করিল। তাহাদিগের সকলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল।

সম্পূর্ণ।